ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান প্রকাশিত

ব্যাঙাচি

তৃতীয় সংখ্যা

জুলাই ২০২০ | আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৭

প্রাচীন পৃথিবী

ডাইনোসর

প্রাগৈতিহাসিক যুগ

বিবর্তন

বাঁচতে হলে, ভাবতে হবে

জুলাই ২০২০, আষাঢ়-শ্রাবন ১৪২৭
প্রথম বর্ষ • সংখ্যা ০৩

সম্পাদক

প্রজেশ দত্ত

সহ-সম্পাদক

টিম ব্যাঙাচি

ডিজাইন এবং লেআউট

তানভীর রানা রাব্বি

প্রচ্ছদ এঁকেছে: মেহরাব সাবিত সিদ্দিকী

('জুরাসিক পার্ক' অবলম্বনে)

প্রকাশক: নাঈম হোসেন ফারুকী, সমুদ্র জিত সাহা
তারিখ: ১৫ই জুলাই, ২০২০
টিম ব্যাঙাচি, ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান কর্তৃক

ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করতে লগইন করুন:
https://bit.ly/bcb_science
ইমেইল: editor@bcbiggan.com
ওয়েব: https://www.bcbiggan.com
ফেসবুক: htttps://www.facebook.con/bcbiggan

শুরুর দিকে প্রাচীন পৃথিবীর প্রানীগুলোর হাড়গোড় পেয়ে মানুষ ধরেই নিয়েছিল এগুলো হয় আকাশের কোনো ড্রাগন বা সি মন্সটার না হয় কোনো দৈত্য বা দানবাকার মানুষের হাড়। স্বভাবতই তারা ভয়ও কম পায়নি, গল্পও কম রটায়নি এসব নিয়ে। বিজ্ঞানের কল্যানে আজ আমরা অনেক দূর এসেছি, নতুন নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবনে, নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাথে অনেক জেনেছি এবং এখনো আরো জানছি এসব প্রানীর ব্যাপারে। যুগ যুগ ধরে গবেষনালব্ধ জ্ঞানে বুঝতে বাকি নেই যে প্রাচীন গ্রিক, চাইনিজ বা ব্রিটিশদের কল্পনার মত চটকদার না হলেও তার চেয়ে বিন্দুমাত্র কম রোমাঞ্চকর নয় এই প্রানীগুলোর ইতিহাস। এই রোমাঞ্চ সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টাতেই এবারের ব্যাঙাচি প্রাচীন পৃথিবী নিয়ে। পড়তে পড়তে হারিয়ে যাবেন কোটি বছর আগের কোনো বনে হেটে চলা দালানসম কোন ডাইনোসরের পাশে , কোন জলাশয়ের গভীরে, অথবা আকাশে উড়ে বেড়ানো বিমান সাইজের কোন টেরোসরের পাশে।

ব্যাঙাচি টিমে কাজ করা সবাইকে এবং পাঠকদের ধন্যবাদ ও শুভ কামনা।

সমুদ্র জিত সাহা
এডমিন, ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান

যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমরা প্রতিমাসে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম বিজ্ঞান ভিত্তিক ফ্রি মাসিক ই-ম্যাগাজিন আপনাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে পারি

সিলেকশন এবং তথ্য যাচাইয়ে সহযোগিতা করেছেন:

সমুদ্র জিত সাহা
মুস্তফা কামাল জাবেদ
সোহম চ্যাটার্জী

বানান সংশোধন:

আবু রায়হান
মোহাম্মদ এ আর মুবিন
রাহুল খান
নাজমুল হোসেন
সব্যসাচী দাশ নির্ঝর
শহীদুল ইসলাম
রাকিন শাহরিয়ার
তানভীর আহমেদ
মোঃ মিলন
নাফিউল ফেরদৌস অরণ্য
জাওয়াদ উল করিম
স্বপ্নীল জয়ধর
আদিন নুর
আফীফাহ্ হক মীম
তাওহীদুল ইসলাম ফাহিম
মাহতাব মাহদী
নাসিম আহমেদ
সাকিব হোসেন
পার্থিব রায়
মারুফ হাসান
ইফতিয়ার আহমেদ রিফান
রওনক শাহরিয়ার
রিমন নাথ
আশরাফুল ইসলাম
জাহিদুর রহমান
রুহিন রুমি

সঠিক এবং মৌলিক বিজ্ঞান জানতে এবং জানাতে

“**ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান**” বদ্ধ পরিকর।

সূচিপত্র

পৃথিবীর ডায়েরিতে

নাঈম হোসেন ফারুকী

কখনো ডায়েরি লিখেছেন? ৫ বছর আগে লেখা ডায়েরি টা একবার নিজে পড়তে বসুন, প্রতিটা পাতায় লেখা নিজের জীবনের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা গুলো আপনার স্মৃতির পাতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আজ আপনাদের এমনই এক ডায়েরি পড়ে শোনাবো। এই ডায়েরি পৃথিবীর ডায়েরি, এখানে লেখা আছে পৃথিবীর ইতিহাস।
আমাদের পৃথিবীর ইতিহাসে রয়েছে বেশ কিছু যুগ, প্রতি যুগেই পৃথিবীর বুকে পদচিহ্ন ফেলেছে বহু প্রাণী। জানান দিয়েছে তাদের নিজস্ব সামর্থ্যের, অস্তিত্বের। চলুন, যুগ অনুসারেই আমাদের পৃথিবীর ইতিহাসের রহস্য উন্মোচনের যাত্রা শুরু করা যাক।

কার্বনিফেরাস

১। তাঁবুতে রাত কাটিয়েছেন কখনো?
আমার সৌভাগ্য হয়েছিল রেমা কালেঙ্গার জঙ্গলে আর পাবলাখালির জঙ্গলে দুটা রাত তাঁবুতে কাটানোর। অসাধারণ অভিজ্ঞতা। তাঁবুতে ঢুকতে হয় লাইট নিভিয়ে, নাহলে রাজ্যের পোকামাকড় তাঁবুর ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে। রাত ১০টা ১১টার পর মানুষের সব কোলাহল বন্ধ হয়ে যায়। জঙ্গল মুখর হয় ঝিঁঝিঁপোকা, মশা-,মাছি আর আর নাম না জানা অসংখ্য পশুপাখির শব্দে। রেমা কালেঙ্গার জঙ্গলে তাঁবুতে শুয়ে শূকরের ঘোঁত-ঘোঁত শুনেছি, একবার কি জানি একটা ছোট প্রাণী তাঁবুর বাইরে আমার পা ছুঁয়ে চলে গেছে। এই এক্সপেরিয়েন্স যে জঙ্গলে রাত কাটায়নি তাকে বোঝানো যাবে না।
রেমা কালেঙ্গা থেকে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি আমাজনের জঙ্গলে। ধরলাম, বেশ বড়সড়, শক্তপোক্ত একটা তাঁবুতে রাত কাটাচ্ছেন। জাগুয়ার ঢুকতে পারে না এমন শক্ত। রাত দুটার দিকে প্রাকৃতিক কাজ করার জন্য বাইরে যাবেন, টর্চ জ্বালালেন। শুরু হলো আতঙ্ক। তাঁবুর দরজার উপর দাঁড়িয়ে, ৮টা চোখ মেলে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে প্রায় ১ ফুট চওড়া, সারা গা লোমে ঢাকা Goliath Bird-Eating Spider.
গুড লাক, রন!

২। গোলিয়াথ বার্ড ইটিং ট্যারান্টুলা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মাকড়সাগুলোর একটা। প্রায় ১১ ইঞ্চি চওড়া, এর লোমশ শরীরটার ওজন ১৭৫ গ্রামের মতো। যদিও পাখি এর নরমাল খাবারের মধ্যে পড়ে না, মাঝে মাঝে শখ করে একটা-দুটা পাখি ধরে খায়, তাই এর নাম হয়েছে বার্ড ইটিং ট্যারান্টুলা। পোকামাকড়দের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো অ্যাটলাস মথ আর কুইন আলেকজান্দ্রিয়ার বার্ড উইং প্রজাপতি। এরা দুজনই প্রায় ১ ফুট চওড়া। খুব বেশি না, তারপরও এক ফুট চওড়া একটা প্রজাপতি ঘরে উড়াউড়ি করলে আমার খুব একটা শান্তি লাগবে না। পিঁপড়ার রেকর্ড ২ ইঞ্চি, বাট বিলিভ মি, ওই ২ ইঞ্চি লম্বা পিঁপড়ার সামনে আপনি পড়তে চাইবেন না। আর মধ্য আমেরিকার ৪ ইঞ্চি লম্বা জায়ান্ট তেলাপোকা আমার বাথরুমে উড়াউড়ি করুক আমি কখনও সেটা কল্পনাও করব না।

আমাদের খুব ভাগ্য ভালো, ৩-৪ ফুট লম্বা একটা মাকড়সা আমাদের দেওয়ালে বসে থাকে না, ৭-৮ ফুটের চ্যারা বাথরুমে কিলবিল করে না, এক ফুট লম্বা তেলাপোকা উড়াউড়ি করে না। কেন পোকামাকড় বড় হয় না? সবসময় কি এরা ছোট ছিল?
মিট কার্বনিফেরাস।

৩। পোকামাকড়,মাকড়সা এরা নিঃশ্বাস নেয় ট্রাকিয়ার সাহায্যে, কোনো ফুসফুস নাই এদের। চামড়ার ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে বাতাস শরীরে ঢুকে, তারপর সেটা বাতাসের চাপে শরীরে ছড়িয়ে যায়। পোকা যত বড় হয়, অক্সিজেনের চাহিদা মেটানোর জন্য তার ট্রাকিয়াগুলো আরও বেশি বেশি করে মোটা হয়। একটা সাইজের পর ট্রাকিয়া এত বেশি মোটা হয়ে যাবে যে ট্রাকিয়াকে জায়গা দিতে হলে হৃদপিণ্ড, পাকস্থলী, ব্রেইন এগুলোকে একটা একটা করে বাইরে ফেলা লাগবে। পোকা তাই ছোটই থাকে, বেশি বড় হয় না।

এখন বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ ২০% এর মতো, থ্যাংকস টু এয়ার পলিউশান, এই অক্সিজেনও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের জন্য জায়গা করে দিচ্ছে। অনেক অনেকদিন আগে, প্রায় ৩০ কোটি বছর আগে এমনটা ছিল না। বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ ছিল ৩৩% এর মত। পোকাদের জন্য রীতিমত স্বর্গরাজ্য।

চলুন ঘুরে আসি কার্বনিফেরাসের দুনিয়া থেকে।

৪। প্রায় ৩৬ থেকে ২৯ কোটি বছর আগের সময়কালকে পৃথিবীর ইতিহাসে কার্বনিফেরাস পিরিয়ড বলা হয়। এটা অনেক অনেকদিন আগের কথা। মাত্র চার হাজার বছর আগে কোনো একটা দ্বীপে পৃথিবীর শেষ ম্যামথটা বেঁচে ছিল। ডাইনোসর টি-রেক্সের শেষ হুঙ্কারটি শোনা যায় সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে। আর হাঁটি হাঁটি, পা পা করে প্রথম, ছোট ছোট আদিম ডাইনোসররা পৃথিবীতে আসে ২২ কোটি বছর আগে। তারও ৭–৮ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে চলছিল কার্বনিফেরাস পিরিয়ড।

সেই সময় পৃথিবীতে একটা গাছেরও ফুল ছিল না, ফল ছিল না। কোথাও কোনো পাখি ছিল না, ম্যামাল ছিল না। মাছেরা প্রথম মাটিতে উঠে এসে উভচর হয়ে তখন পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে যুগে সারা পৃথিবীতে ছিল বিশাল বড় বড় রেইন ফরেস্ট। সোয়াম্প ফরেস্ট বললে আরও ভালো হয়। কার্বনিফেরাসের ফার্ন গাছগুলো মাটির নিচে গিয়ে, ফসিল হয়ে, শেষে কয়লায় পরিণত হয়ে আজকে সারা পৃথিবীর কয়লার চাহিদা মেটাচ্ছে। তাই এই সময়কালকে বলা হয় কার্বনিফেরাস পিরিয়ড।

সেই ঘন, দুর্ভেদ্য, কর্দমাক্ত সোয়াম্প ফরেস্টে রাজত্ব করত পোকামাকড়রা। আপনি দিনশেষে খুব খাটাখাটুনি করে আপনার নৌকায় ঘুমানোর আয়োজন করছেন? আপনাকে হতে হবে খুব সাবধান। ৮ ফুট লম্বা চ্যারা আর্থ্রোপ্লুরা ঘোরাঘুরি করছে আশেপাশে, নৌকায় উঠতে পারলে খবর আছে। একেকটার সাইজ কুমিরের সমান, তাই সাবধান।

সন্ধ্যার দিকে একেবারে ছইয়ের ভিতর ঢুকে থাকলে ভালো হয়। এই সময় ফড়িং উড়াউড়ি করে। ফড়িং কে এত ভয় পাওয়ার কি আছে ? মেগানিউরা নামের কার্বনিফেরাসের এই ফড়িং এখন পর্যন্ত পাওয়া পোকামাকড়দের মধ্যে সবচেয়ে বড়, এদের উইংস্প্যান আড়াই ফুট। প্রায় ঈগল সাইজের একেকটা ফড়িং তার বিশাল ২টা মৌচাকের মত পুঞ্জাক্ষি মেলে শিকার খুঁজছে জলাভূমিতে, বন্দুকটাকে হাতের কাছে রাখতে ভুলবেন না। মাটিতে নেমে কোনো একটা ট্রি ফার্নে চড়ে রাত কাটাবেন? আরও খারাপ কথা, ৩০ ইঞ্চি লম্বা বিছা ঘুরে বেড়াচ্ছে, এদের স্টিং মারাত্মক।

সব দিক ঠিক করার পর ঘুমাতে গেলে ৯ ঘণ্টা আগে অ্যালার্ম দিয়ে রাখবেন, দিনরাত কিন্তু এখন সাড়ে ২২ ঘণ্টা, আর সকাল হলেই ফড়িংয়ের উড়াউড়ি শুরু হয়ে যাবে।

পারমিয়ান

১। কার্বনিফেরাসের ঘন দুর্ভেদ্য আদিম বনভূমির কথা মনে আছে? ওই যে যেখানে উড়ে বেড়াতো ৩ ফুট লম্বা ফড়িং আর চড়ে বেড়াত ৮ ফুট লম্বা চ্যারা/কেন্নো? একদিন এই ঘন দুর্ভেদ্য জঙ্গল বিশাল পৃথিবীর জন্য কাল হয়ে দাঁড়ালো।

বাতাসে ৩৩ ভাগ অক্সিজেন পেয়ে গাছের সংখ্যা বাড়তেই থাকলো, বাড়তেই থাকলো। এই গাছগুলো বাতাস থেকে শুষে নিতে থাকলো কার্বন-ডাই-অক্সাইড। গাছগুলো হয়তো ভাবছিল সবাই ওদের উপর খুব খুশি, আরও অক্সিজেন চাই, CO2 চাই না।

এদিকে হয়েছে কী, CO2 তাপ ধরে রেখে পৃথিবীকে বেশি ঠাণ্ডা হতে দেয় না। CO2 এর পরিমাণ কমে যাওয়াতে পৃথিবীর তাপমাত্রা কমতে থাকলো। মেরু অঞ্চলের বরফ বেড়ে গিয়ে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা কমে গেল ৯০০ মিটার। আর এই বিপর্যয়ের, সবচেয়ে বড় ভিকটিম হলো ওই গাছগুলো। গরম অঞ্চলের রেইন ফরেস্টের গাছ, ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে না। বেচারারা মারা পড়ল শ'য়ে শ'য়ে। অনেক জায়গায় পাইনের বন দখল করে নিলো ফার্নের বনকে। অনেক জায়গায় সেটাও হলো না। বিরাট বিরাট জঙ্গল পরিণত হল মরুভূমিতে। গাছ কমাতে অক্সিজেন কমলো, কার্বনিফেরাসের বিরাট বিরাট পোকামাকড়গুলো আস্তে আস্তে কালের গর্ভে হারিয়ে গেল।

বরফে ঢাকা কার্বনিফেরাসের বিরান ভূমিতে শুরু হলো নতুন যুগ: পারমিয়ান।

২। পৃথিবীর ইতিহাসে ৩০ কোটি বছর আগে থেকে শুরু করে প্রায় ২৫ কোটি বছর আগ পর্যন্ত সময় কালের নাম পার্মিয়ান পিরিয়ড। বরফের আঁতুড়ঘরে তার জন্ম, আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে তার মৃত্যু। সেই সময় সারা পৃথিবীর সবগুলো মহাদেশ একসাথে হয়ে গড়ে তুলেছে বিরাট এক মহাদেশ, নাম প্যাঞ্জিয়া। চারপাশে তার প্যান্থালাসা নামের বিশাল এক সমুদ্র।

এই বিরাট বিস্তৃত মহাদেশের মরুভূমিতে, পাইনের বনে আর বরফে ঢাকা প্রান্তরে রাজত্ব করছে ম্যামাল-লাইক রেপ্টাইলরা, আজকের ম্যামালদের পূর্বপুরুষ।

চলুন ঘুরে আসি পারমিয়ান থেকে।

৩। একটু আগে জঙ্গলে গরগনপ্সিডের পায়ের ছাপ দেখা গেছে, আর বেশি ঘোরাঘুরি করা উচিত হবে না। ৯০ ফুট লম্বা পার্মিয়ানের এই বাঘের তীক্ষ্ণ শ্বদন্ত, একটা মানুষকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলতে বেশিক্ষণ লাগবে না। মাটিতে রাত কাটানো উচিত হবে না, শক্তপোক্ত একটা পাইন গাছ দেখে উঠে মাচা খাটানো উচিত।

বরফ যুগ শেষ হলেও এই এলাকায় ঠাণ্ডা পরে ভালো। গাছের উঁচু একটা ডাল দেখে গায়ে জ্যাকেট জড়িয়ে বিছানা পাতলেন। অসংখ্য তেলাপোকা আর ফড়িংয়ের উড়াউড়িতে মুখর বনানী। মাচার উপর মশারি পেতে ঘুমানোর আয়োজন করা উচিত, সকালে শিকারে বের হতে হবে। ছোট একটা কচ্ছপ জাতীয় আনাপ্সিড এর বারবিকিউ খেয়ে ২ দিন চলছেন, নতুন কিছু দরকার।

মাঝরাত। কীসের একটা শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। পোকামাকড় তেলাপোকা সব চুপচাপ। আকাশে বিরাট বড় একটা চাঁদ উঠেছে, তার প্রাগৈতিহাসিক জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ছে পার্মিয়ানের পাইন বনে। সেই জ্যোৎস্নার আলোয় নিচের ফাঁকা জায়গাটুকুতে চলছে অপার্থিব এক নাটক। গরগনপ্সিডের শিকার করা ছোট আর্কোসরটার উপর হামলা করেছে বিরাট বড় এক ডাইমেট্রডন, পিঠের বিরাট বড় পাখনাটা কেঁপে কেঁপে উঠছে তার। গরগনপ্সিড বাঘের মতো ক্ষিপ্রতায় ডাইমেট্রডনটার গলা কামড়ে ধরার চেষ্টা

করছে, মিস করছে বারবার।

স্তন্যপায়ীর দুই পূর্বপুরুষের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব অবাক চোখে দেখছে প্রাগৈতিহাসিক অরণ্য।

৪। প্রায় ২৫ কোটি বছর আগে পার্মিয়ানবাসীর উপর কেয়ামত নেমে আসে।

কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে না কীভাবে এর শুরু। অনেকগুলো হাইপোথিসিস আছে। কারো কারো মতে, আগ্নেয়গিরিগুলোর ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাতে ছাই ভস্ম ছড়িয়ে যায় স্ট্রাটোস্ফিয়ার পর্যন্ত, পৃথিবী ঢাকা পড়ে ঘন কালো অন্ধকারে। কারো কারো মতে, ভয়াবহ উল্কাপাত অথবা কাছাকাছি সুপারনোভার বিস্ফোরণ এই ঘটনার জন্য দায়ী। যে কারণেই হোক, সূর্যের আলোর অভাবে আস্তে আস্তে মারা যায় বিরাট বিরাট গাছগুলো। তারপর একে একে মারা যায় তার উপর ডিপেন্ডেন্ট প্রাণীগুলো।

পার্মিয়ান-ট্রায়াসিক এক্সটিঙ্কশন ইভেন্টকে বলা হয় পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় মার্ডার মিস্ট্রি। এই ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞে বিলুপ্ত হয় সমুদ্রের প্রায় ৯৬% প্রাণী, ডাঙার প্রায় ৭০% প্রাণী। পরিবেশ এতো বিষাক্ত হয়ে যায় যে প্রায় ১ কোটি বছর লাগে পৃথিবীকে আগের জায়গায় ফিরে আসতে।

ম্যামালদের রাজত্বের আশা আগামী ১৫ কোটি বছরের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। বিরাট বিরাট ম্যামাল-লাইক রেপ্টাইলরা প্রায় সবাই মারা পড়ে এই ধ্বংসযজ্ঞে। আগামী ১৫ কোটি বছর ম্যামালরা ইঁদুর-ছুঁচোর আকৃতি নিয়ে ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে দিন কাটাবে।

৫। চারপাশে লাশের স্তূপ, এর মধ্যে খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে ছোট একটা আর্কোসর। সে পার্মিয়ান সার্ভাইভার।

একদিন এই আর্কোসরের বংশধররা ৪টা ভাগে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়বে সারা পৃথিবীতে।

এক ভাগ থেকে জন্ম হবে কুমিরদের। এরা রাজত্ব করবে নদী-নালায়।

এক ভাগ হাল ধরবে সমুদ্রের। বিরাট বিরাট মোসেসর, প্লেসিওসর এই ভাগের প্রাণী।

তিন নম্বর ভাগ দখল করবে আকাশ। আগামী ১৫ কোটি বছর এদের নাম হবে টেরোসর – আকাশের মূর্তিমান আতঙ্ক।

চার নম্বর ভাগের নাম হলো ডাইনোসর।

আর্কোসর কথাটার অর্থ তাই The Ruling Lizard.

ট্রায়াসিক

১। বিশাল বড় মহাদেশ প্যাঞ্জিয়ায় ভাঙন ধরেছে।

উত্তরে দেখা দিয়েছে নতুন মহাদেশ, লরেশিয়া।

দক্ষিণে গন্ডোয়ানা।

মাঝখানে তার টেথিস সাগর।

পার্মিয়ান ধ্বংসযজ্ঞের কোটি কোটি মৃত লাশের কবরস্থানে কেটে গেছে রাতের আঁধার।

ধূলি ধূসরিত ঊষর পৃথিবীতে এসেছে নতুন যুগ: ট্রায়াসিক, Age of Sandstones

২। উদ্ভট পরিবেশ। একটানা বেশ কয়েকদিন শুকনো আবহাওয়ার পর গতরাতে ঝড় এসেছিল হঠাৎ করে। বিজলির দমকে চমকে চমকে উঠেছিল চারদিক।

এদিকে মাছের সাপ্লাইও শেষ হয়ে গেছে। আজকে ওয়েট করলে না খেয়ে থাকতে হবে। সাহসে ভর করে ছোট স্পিডবোটটাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সমুদ্রে।

ভোর সকাল। রাতভর ঝড়ের পর চারদিক যেন থমথম করছে। সব নিশ্চুপ। মনটা কু-ডাক ডাকছে। আজকে না বের হলেই বা কী হতো! ফোঁটা ফোঁটাবৃষ্টি পড়ছে টেথিস সাগরে। বেশিদূর দেখা যায় না। আপনি মাছ ধরতে মগ্ন। না হলে ৭০ ফুট লম্বা কালো ছায়াটা যখন বহুদূরে দেখা গিয়েছিল তখনই ইউ-টার্ন নিতে পারতেন।

যখন টের পেলেন তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

ডলফিনের মতো চেহারার, সামনে করাত মাছের মতো লম্বা একটা চোয়াল নিয়ে ইকথাইওসর শনিসরাস চলে এসেছে ২০০ ফুটের মধ্যে। একটা ৭ তলা বিল্ডিংকে উল্টো করে শোয়ালে যত বড় হয়,

শনিসরাস প্রায় সেই সাইজের। ২টা স্পার্ম তিমির সমান ওজন, হাঁ করা মুখে দাঁতগুলো ঝকঝক করছে। মাছ ধরছে শনিসরাস। আপনার কপালে আজকে শনি আছে।

জন্তুটা আপনাকে ভালভাবে খেয়াল করার আগেই ইউ-টার্ন নিলেন। শনিসরাস বেশি স্পিডে নড়তে পারে না। ভাগ্য ভালো থাকলে তীরে ফিরতে পারবেন।

দূরত্ব বাড়ছে। আজকে হয়তো বেঁচে যাবেন। হঠাৎ বিদ্যুতের শিখা চমকে উঠল আকাশে। ঝকমক করে উঠল স্পিডবোটের মেটালিক বডি।

ঘুরে সামনে বাড়ল শনিসরাস। সাইজ দিয়ে পুষিয়ে নিবে স্পিডের ঘাটতি ...
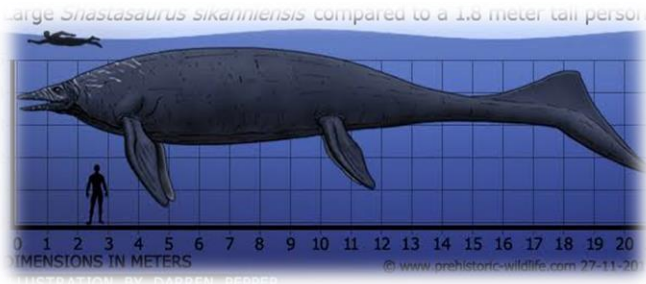
৩। ধড়-মড় করে ঘুম ভেঙে গেল আপনার। দরদর করে ঘামছেন। ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসে একটু শান্ত হলেন। ভয়ের কিছু নেই। বিশাল ফড়িংগুলো নাই। ধ্বংস হয়ে গেছে। ঝিঁঝি পোকা নামের নতুন একজাতের পোকার জন্ম হয়েছে, জঙ্গল মাতাল করে রেখেছে এরা। মাছ আসলেই শেষ, কিন্তু ওই স্বপ্নের পর আর সাগরে যেতে ইচ্ছা করলো না। ছোট ছোট ইঁদুরের মতো এজস্ট্রডন আছে এলাকায়, ২-৯টাকে ধরে আজকের মতো চলা যাবে। আবার এদের ধরতে ভয়ও লাগে, পৃথিবীর একেবারে প্রথম দিকের সত্যিকারের ম্যামাল, মারতে গেলে যদি স্পেস-টাইম উলটা-পালটা হয়ে যায়!

৪। এই জঙ্গলটা ভালো, সব জঙ্গল ভালো নয়।

আর্কোসরের বংশধররা ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। ট্রায়াসিকের শুষ্ক পরিবেশে টিকে থাকার জন্য যা যা দরকার সব আছে এদের।

পর্যাপ্ত খাবার, প্রচুর জায়গা পেয়ে আকারে বড় হয়ে উঠছে তারা।

কোনো কোনো জলাভূমির তীরে পস্টোসুচাসের গল্প শোনা যায়। ৯৫ ফুট লম্বা এই কুমিরগুলোর ধারে কাছে ঘেঁষে না কেউ।

মাঝে মাঝে আকাশে বাদুরের মতো কি জানি উড়তে দেখা যায়। ৩ ফুট চওড়া পাখা, খুব বেশি ডেঞ্জারাস না।

পাশের মরুভূমিতে ইউর‍্যাপ্টরের গল্প শোনা গেছে। ৩ ফুট লম্বা, গিরগিটির মতো। আপনার টাইম ট্র্যাভেলার ফ্রেন্ডের তাঁবু থেকে মাছ চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল সেদিন।

ওরা বড় হচ্ছে। সামনে আসছে ডাইনোসরের যুগ।
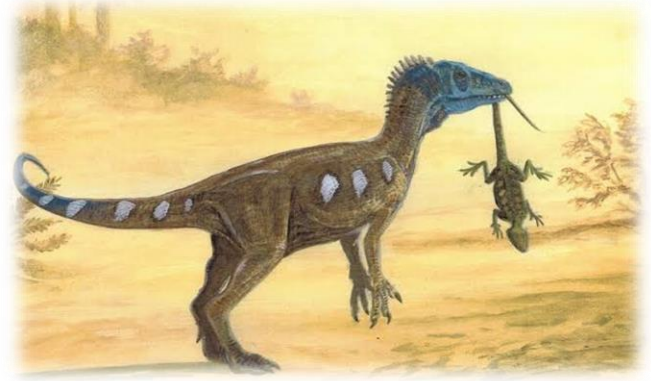
জুরাসিক

৯। পেছনে খাড়া উঁচু, খটখটে পাথরের একটা পাহাড়। আকাশটাকে অনেকখানি ঢেকে দিয়েছে সেটা। ঘন কুয়াশা আর মেঘে ঢাকা পড়েছে তার উপর দিকটা, চূড়া দেখা যাচ্ছে না।

সামনে গহীন ঘন জঙ্গল। যতদূর চোখ যায় গাছ আর গাছ।

ওই জঙ্গল পাড়ি দিতে হবে দিনের আলো থাকতে থাকতে, তারপর রাত কাটাতে হবে সুবিধামতো কোনো খোলা জায়গায়। পরদিন ভোরে থাকতে হবে জঙ্গলের মাঝ বরাবর জলাভূমিটার তীরে।

মেঘ ডাকছে বারবার। দূরে, অনেক ওপরে, পাহাড়ের গায়ে উড়াউড়ি করছে নগ্ন শকুনের মতো দেখতে কতকগুলো দানব। শিকার নিয়ে মারামারি করছে ওরা, মেঘের গর্জন ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে তাদের পাখা ঝাপ্টানোর আওয়াজ আর কর্কশ চিৎকার।

আর দেরি করা ঠিক হবে না। আপনি আর আপনার সঙ্গী জঙ্গলে ঢুকলেন।

২। আদিম, অকৃত্রিম জুরাসিক জঙ্গল। হাজার হাজার পাইন গাছ, সাইকাসের ঝাড়, গিঙ্গোর ঝোপ। নানান জাতের আর রঙের ফার্ন – ট্রি ফার্ন, লতানো ফার্ন, আগাছার মতো সাইকাসের গা বেয়ে গজিয়ে ওঠা ফার্ন। এই আদিম অরণ্যে একটা গাছেরও ফুল নেই, ফল নেই, নেই মৌমাছিদের গুঞ্জন, পাখির ডাক। আছে তেলাপোকা, মশা আর হাজার হাজার ঝিঁঝি পোকা। আর আছে ডাইনোসরের আতঙ্ক।

এই মুহূর্তে আদিম বনভূমি গুমোট হয়ে আছে ঝড়ের আগমনী বার্তায়। আশেপাশে সব নিশ্চুপ। হাতে বড় একটা ম্যাশেটি নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঝোপঝাড় কেটে আগাতে হবে।

ঝড় আসলো। কেঁপে উঠল জঙ্গল, দুলে উঠল সাইকাসের দল। বিকট শব্দে বাজ পড়ল। একটু পর বহু দূরে বাজের শব্দের জবাব দিলো রক্ত পানি করা একটা হুঙ্কার। এখন থামলে চলবে না, এগিয়ে যেতে হবে, দিনের আলোর আর বেশি বাকি নেই। এই নিষ্ঠুর জঙ্গলে কাউকে বিশ্বাস নেই। ২০ ফুট দূরে যে ঝোপটা নড়ে উঠলো সেখানে কি ওত পেতে বসে আছে ঝুঁটিওয়ালা এল্লিসরাস? থপ্ করে বহুদূরে কী জানি একটা পড়ল, কেঁপে উঠল মাটি। কোনো দানবের পায়ের আওয়াজ নাকি ঝড়ে ডালপালা ভাঙ্গার শব্দ?

বিকালের দিকে ঝড় পড়ে আসলো। দেখা মিলল আমাদের প্রথম দানবের। ৩০ ফুট লম্বা, পিঠে লাইন করে অনেকগুলো তিনকোনা পাখনার মতো, লেজে বীভৎস বড় বড় কাঁটা, সামনে ছোট্ট একটা মাথা। এই মুহূর্তে গাছপালা খাচ্ছে স্টেগোসরাস'টা, ওকে বিরক্ত না করলে সেও আপনাকে কিছু বলবে না।
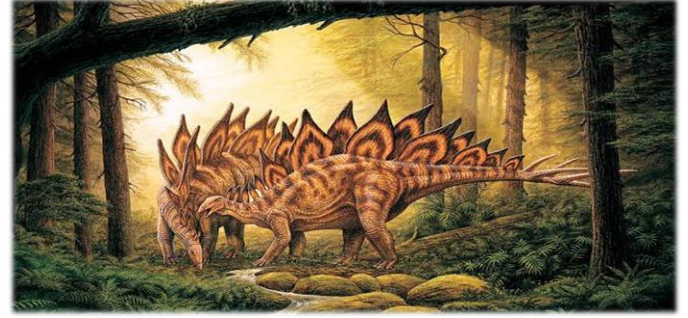
৩। জুরাসিকের রাত। বনের সব পশুপাখি নাকি আগুনকে ভয় পায়। সারাদিনের উত্তেজনায় পেটে কিছু পড়ে নি। একটু খোলা জায়গা পেয়ে আগুন ধরিয়েছেন, ভেজা কাঠে অনেক কষ্টে ধরানো আগুনে ধোঁয়া হচ্ছে প্রচুর। ইঁদুরের মতো কয়েকটা মেগাজসট্রোডন ধরা হয়েছে, ঝলসে খেতে চিকেন ফ্রাইয়ের মতো লাগছে। আশেপাশে গহীন জঙ্গল, ঝিঁঝি ডাকছে একটানা, মাঝে মাঝে ঝিঁঝির ডাক ছাপিয়ে ভেসে আসছে রক্ত হিম করা চিৎকার। তাড়াতাড়ি মোটামুটি শক্ত একটা ডালে মাচা বেঁধে ঘুমাতে হবে, সকালে অনেক কাজ।

সে আসলো নিশুতি রাতে, আপনি ঘুমানোর অনেক পর। যখন আসলো তখন থেমে গেল সব চিৎকার, বন্ধ হলো ঝিঁঝির ডাক। নিচে আগুনটা নিভুনিভু করে জ্বলছিল, পায়ের তলায় পিষে সেটাকে নিভিয়ে দেয় সে। আপনার ঘুম ভাঙল অনেক পরে, আপনার সঙ্গীর মরণ চিৎকার শুনে।

আপনার পা থেকে কয়েক ফুট নিচে দাঁড়িয়ে আছে কালো কুচকুচা একটা দানব, তার ৪০ ফুট লম্বা দেহটা সাপের মতো কিলবিল করছে। ডাইনোসর আলোসরাস তার হ্যাচেটের মতো চোয়ালটাকে ইচ্ছামত হাঁ করতে পারে, সেই চোয়ালের মাঝে ঝকঝকা দাঁতের ফাঁকে ছটফট করছে আপনার সঙ্গীর দেহটা। দানবের একটা চোখ স্থির তাকিয়ে আছে আপনার দিকে, বিরাট বড় নাকটা দিয়ে দুর্গন্ধের বাষ্প উঠছে।

৪। চারপাশে ঘন কালো অন্ধকার, আপনি ছুটছেন। ঝোঁপঝাড় চেপে আসছে, দুলে উঠছে ডালপালা, আপনাকে থামলে চলবে না। গহীন জঙ্গলে ঘন ডালপালার ফাঁকে ওটা আসতে পারবে না, তাই আপনাকে আরও গভীরে ঢুকতে হবে।

সেই কালো রাতে, হাতে একটা টর্চ আর একটা ছোট পয়েন্ট টু টু বোরের রাইফেলকে সাথে নিয়ে, আদিম জঙ্গলের সব বিপদ আপদকে পাশ কাটিয়ে আপনি কীভাবে একটা গাছের মগডালে এসে উঠলেন আপনি জানেন না। গভীর রাতে আবার আসলো ঝড়। গাছের ডাল শক্তভাবে আঁকড়ে ঝুলে থাকলেন কোনোমতে।

৫। খুব ভোর। মেঘের সাগরে ঢাকা বনভূমি। ঝড় কেটে গেছে, কিন্তু হিম হয়ে আছে চারদিক। থপ করে দূরে কোথাও ভারি কিছু একটা পড়ল, আপনি জেগে উঠলেন। দেখলেন এক অপার্থিব দৃশ্য। দূরে, কুয়াশা ভেদ করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে একজোড়া জিরাফোটাইটান। তাদের ৯০ ফুট লম্বা শরীরটা সবচেয়ে উঁচু গাছগুলোর চেয়েও উঁচু। তারা একটা করে পা ফেলছে আর মাটি কাঁপছে থরথর দকরে। আপনার ভাগ্য আপাতত ভালো, জিরাফোটাইটান মাংস খায় না। কিন্তু এ জঙ্গলকে বিশ্বাস নেই। ছোট পাখির মতো যে জীবগুলো ডালে ডালে উড়াউড়ি করছে খেয়াল করলে দেখবেন চোয়াল ভরা দাঁত আছে তাদের। পালকভরা ডানার নিচে লুকিয়ে রেখেছে ধারালো নখর।
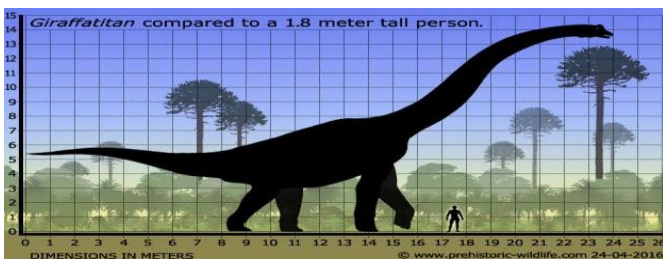
আপনার গন্তব্য জঙ্গলের মাঝের ওই লেকটা। সেখানে গেলে মানুষের দেখা মিলবে, লেকের পারে অপেক্ষা করছে টাইম মেশিনটা। আবার মেশিনটি হাতে নিয়ে মাটিতে নেমে পড়তে হবে। আপনি কিন্তু জানেন না, টাইম মেশিন ঠিকই আছে, লেকের পাড়ের ওই মানুষগুলো আর নেই। সবুজ শেওলাভরা পানিতে নাক ডুবিয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে জলের দানব লাইয়াপ্লুরোডন!

৬। প্রায় ২০ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে শুরু হয় জুরাসিক যুগ, শেষ হয় ১৪ কোটি বছর আগে। এরপরের ৮ কোটি বছর চলে ক্রেটাসিয়াস যুগ। জুরাসিক যদি হয় ডাইনোসরদের রৌপ্য যুগ, ক্রেটাসিয়াসকে বলা চলে স্বর্ণযুগ!

আজকে যদি লাইয়াপ্লুরোডনের হাত থেকে বাঁচতে পারেন, ক্রেটাসিয়াসে আবার দেখা হবে – টি-রেক্সের দেশে...

৭। আজ থেকে প্রায় ২০০০ বছর আগে যিশু বা ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পৃথিবীতে প্রথম হোমো স্যাপিয়েন্স জাতের প্রাণী দেখা যায় প্রায় ১ লক্ষ বছর আগে। ১ লক্ষ মানে ৫০ × ২০০০, ৫০ যিশু আগে।

১ লক্ষকে ১০০ দিয়ে গুণ করলে হয় ১ কোটি। ১ কোটিকে ৭ দিয়ে গুণ করলে হয় ৭ কোটি। ২০০০ দিয়ে ভাগ করলে হয় ৩৫০০০। অনেক, অনেক লম্বা সময়। এই সাত কোটি বছরে পৃথিবীর মানচিত্র উলটে-পালটে গেছে। ইন্ডিয়া সমুদ্রের মাঝখানে ছিল, এশিয়ার সাথে এসে লেগেছে। হিমালয় পর্বত গড়ে উঠেছে।

সাত কোটি বছর আগে ডাইনোসর টি-রেক্স বাস করত পৃথিবীতে। আরও ৮ কোটি বছর আগে শেষ হয় জুরাসিক যুগ, সেই সময় থাকত বিরাট বিরাট লম্বা গলাওয়ালা আপাটসরাস ব্র্যাকিওসরাসরা।

গতকাল সকালে যদি যিশুখ্রিস্টের জন্ম হয়ে থাকে, টি-রেক্সরা পৃথিবীতে ছিল ১০০ বছর আগে। ব্র্যাকিওসরাসরা ২০৫ বছর আগে। আমাদের কাছে টি-রেক্সরা যত আগের, টি-রেক্স দের কাছে ব্র্যাকিওসরাসরা তার চেয়েও বেশি আগের।

মানুষ যদি পৃথিবীতে আসে দেড় মাস আগে, যিশু এসেছেন মাত্র ১ দিন আগে, আর ১৭০০ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০০ বছর রাজত্ব করেছে ডাইনোসররা।

৮। মানচিত্রের কথায় আসি। ১৫ কোটি বছর আগে পৃথিবীর ম্যাপ পুরোই অন্যরকম ছিল। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, অ্যান্টার্কটিকা, অস্ট্রেলিয়া একসাথে ছিল, নাম ছিল গন্ডোয়ানাল্যান্ড। উত্তরে ছিল উত্তর আমেরিকা, এশিয়ার অনেকটা, নাম লরেশিয়া। বামে প্রশান্ত মহাসাগর, ডানের সমুদ্রটার নাম টেথিস সাগর। মেরু অঞ্চল তখন ছিল সবুজ, সতেজ ডাইনোসর চারণভূমি। আমরা এখন বাস করি কোয়ার্টার্নারি যুগে, এই যুগে কয়েক হাজার বছর পর পর আইস এজ আসে, এই চক্রের নাম মিলাঙ্কোভিচ সাইকেল। জুরাসিক সেরকম ছিল না। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ছিল ১৬ ডিগ্রির মতো, এমনকি বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছিল এখনকার প্রায় ৫ গুন, অক্সিজেন ছিল ১৩০%।
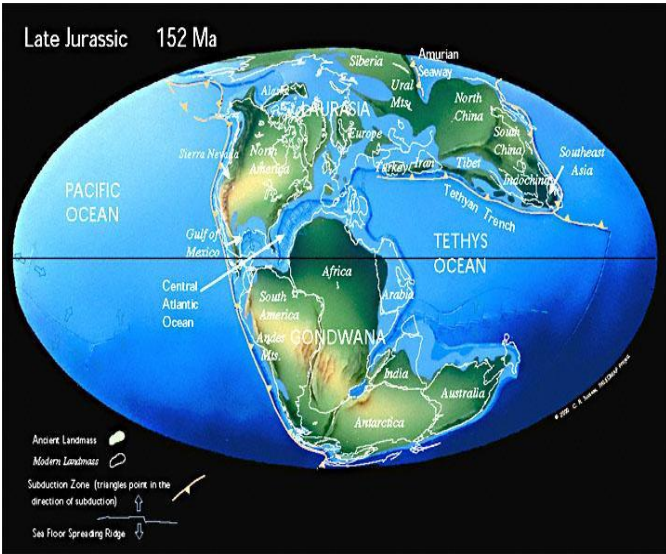
৯। সবশেষে ডাইনোসরদের কথা। পার্মিয়ান ধ্বংসযজ্ঞের শেষে ম্যামাল-লাইক রেপ্টাইলরা বেশিরভাগই ধ্বংস হয়ে যায়, টিকে থাকে আর্কোসররা। আর্কোসরদের অনেক বংশধর ছিল, ট্রায়াসিকের শেষে আরো একবার কেয়ামত নামে পৃথিবীতে, আর্কোসরদের আর সব বংশধর ঝাড়েবংশে শেষ হয়ে যায়। হারাধনের ১০টি ছেলে, রইল বাকি তিন।

তিন ছেলের এক ছেলের নাম কুমির। এরা হাটে পা বাঁকা করে, থাকে জলাভূমির তীরে।

নগ্ন শকুনের মতো যারা আকাশে উড়াল দিল তাদের নাম টেরোসর। টেরোসর কিন্তু ডাইনোসর না, তাদের আত্মীয় বলা যায়।

আর্কোসরদের বংশধর, যারা ডাঙায় বাস করত, বিশেষ ভঙ্গিতে সোজা হয়ে হাঁটত তাদেরকে বলে ডাইনোসর। জিরাফের মতো লম্বা গলাওয়ালা বিশালদেহী ডাইনোসরদের বলে সরোপড, আর টি-রেক্সের মতো খাটো গলাওয়ালা, ছোট ছোট গলাওয়ালা ডাইনোসরদের নাম থেরোপড। সরোপড থেরোপড ছাড়াও আরও অনেক ধরনের ডাইনোসর আছে, আস্তে আস্তে তাদের গল্প আসবে।

১০। সাড়ে ৬ কোটি বছর আগে, প্রায় ১৫ কোটি বছর রাজত্ব করার পর ডাইনোসররা ধ্বংস হয়। ডাইনোসরদের শেষ জীবন্ত বংশধর হচ্ছে পাখি। পাখি এসেছে থেরোপড ডাইনোসর থেকে, পৃথিবীতে টি-রেক্সের সবচেয়ে কাছের আত্মীয় হলো মুরগি টাইপের পাখি!

পনেরো কোটি বছরে এরা রেখে গেছে হাজার হাজার ফসিল। আস্ত ডাইনোসরের যেসব ফসিল পাওয়া যায় তা ছোট ছোট ডাইনোসরের, বড় ডাইনোসরের আস্ত ফসিল বেশ রেয়ার। এই ফসিলগুলো ডাইনোসরের জীবন্ত ইতিহাস। চামড়ার ফসিল মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, অনেক ডাইনোসরের চামড়ায় স্পষ্ট পালক দেখা গেছে, কিন্তু রঙ সাধারণত এতো বছরে নষ্ট হয়ে যায়। মাংসাশী ডাইনোসরের পেটের ভেতর অনেক সময়ই তৃণভোজী ডাইনোসরের হাড় পাওয়া যায়।

বড় ডাইনোসরের আস্ত ফসিল দুর্লভ হলেও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, হই চই পড়ে যায় তখন। কয়েক বছর আগে এক খনির ভেতর বিশাল এক নডোসরের আস্ত ফসিল পাওয়া যায় একেবারে চামড়া সহ,তারও কয়েক বছর আগে পাওয়া যায় টি-রেক্সের আস্ত ফসিল।

ক্রেটাসিয়াস

১। ঘ্যাঙ, ঘ্যাঙর ব্যাঙ।

বিলজেবুফো ডাকছে। একটু আগে ডাইনোসরের বাচ্চার রান দিয়ে ব্রেকফাস্ট করেছে সে। এখন মনের আনন্দে গান গাচ্ছে।

ক্রেটাসিয়াস হলো দানবদের যুগ। একগাদা ক্যাটাগরিতে সবচেয়ে বড় প্রাণীদের জায়গা হবে ক্রেটাসিয়াসে।

সবচেয়ে বড় ব্যাঙ কে? ক্রেটাসিয়াসের বিলজেবুফো।

সবচেয়ে বড় কুমির কে? ক্রেটাসিয়াসের সারকোসুচাস।

যাই হোক, বিলজেবুফোর কথায় আসি। বিলজেবুফো ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ করে ডাকছিল, একটু পর কার জানি পায়ের নিচে পরে ভর্তা হয়ে গেল।

যে ভয়ঙ্কর প্রাণীটা তাকে চাপা দিয়ে গেল তার তুলনায় সে একটা পিঁপড়ার চেয়ে ছোট।

সে আপনাকে আমাকে চাপা দিয়ে ভর্তা করতে পারবে।

একটা আফ্রিকান হাতিকেও ভর্তা করতে পারবে।

তার নামের সাথে 'টাইটান' আছে। একটা নীলতিমির চেয়েও লম্বা সে।

ডাইনোসর পাতাগোটাইটান ১৩০ ফুট লম্বা, সর্বকালের সবচেয়ে লম্বা প্রাণী। ওজন নীলতিমির চেয়ে কিছুটা কম।

বিলজেবুফো ভর্তা হওয়ার আগে অবশ্য অতটা খেয়াল করেনি। যে তাকে চাপা দিয়েছে সে পাতাগোটাইটান হতে পারে, আবার আর্জেন্টিনোসরাসও হতে পারে।

আর্জেন্টিনার আর্জেন্টিনোসরাস লম্বায় সামান্য ছোট, ওজনে আরও অনেক ভারী। অন্য কেউ হলে দেখে চিনতে পারত, বিলজেবুফো পারে নি। সে বায়োলজিতে খুব একটা ভালো না।

পাতাগোটাইটান এই মুহূর্তে বেশ বিরক্ত। বিলজেবুফোকে সে কেয়ারও করে না, কিন্তু তার মাথার কাছে যে চামচিকাগুলো বিরক্ত করছে সেগুলোকে কেয়ার না করলে চলে না। কত্ত বড় সাহস! টি-রেক্স পাতাগোটাইটানের পায়ের কাছে ঘুরে, হাঁটুর সমান সাইজ, আর কতকগুলো চামচিকা এসেছে তাকে বিরক্ত করতে!!
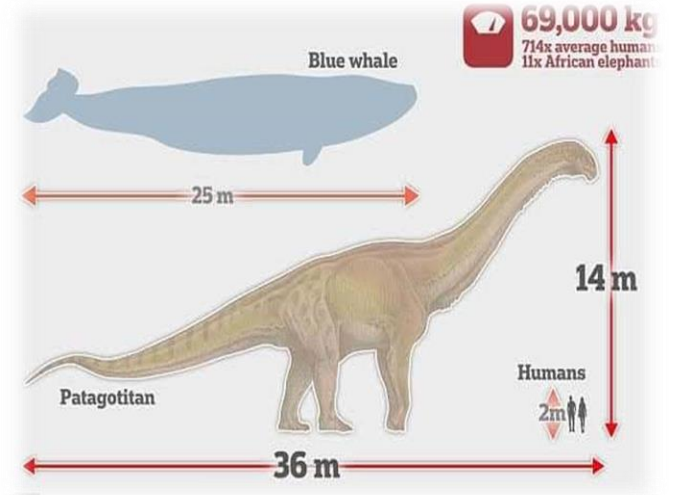
যে 'চামচিকা'গুলো পাতাগোটাইটানকে কামড়ানোর চেষ্টা করছে একেকটার সাইজ প্লেনের সমান। কম করে ৪০ ফুট চওড়া। এক কামড়ে একেকটা নাঈম এদের পেটে যাবে। সাপের দেবী কোয়েটজালকোয়াটলের নামে এদের নাম, বসে থাকলে একেকটা জিরাফের সমান সাইজের হয়। স্পিড ঘণ্টায় ৯০ কি.মি। একটার পিঠে চড়ে বসলে সে আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাবে ক্রেটাসিয়াসের দুনিয়া।

২। লরেশিয়া আর গন্ডোয়ানা ভেঙে গেছে, উত্তরে জন্মেছে উত্তর আমেরিকা আর ইউরেশিয়া, দক্ষিণে দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা আর অ্যান্টার্কটিকা। অস্ট্রেলিয়া তখনও লেগে আছে অ্যান্টার্কটিকার সাথে, আর আফ্রিকা আর

অ্যান্টার্কটিকার মাঝে সমুদ্রে ভাসছে ইন্ডিয়া।

কোয়েটজালকোয়াটলের পিঠে চড়ে আমরা দেখে আসবো ওই অপরূপ রূপকথার রাজ্য।
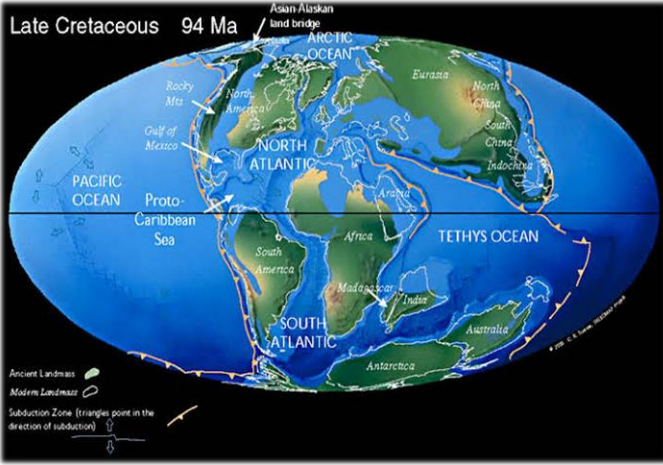
সর্পদেবীর পিঠের সাথে আপনি বাঁধা। সে এখনও আপনাকে খেয়াল করে নি, তাই ভাগ্য ভালো। নিচের মাঠ ঘাট এক অবাস্তব দুনিয়া। কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে টিয়া পাখির মতো মাথা আর ডাইনোসরের শরীরওয়ালা সিট্টাকোসরাস। কোথাও গায়ে মাথায় বিশাল বিশাল কাঁটা পরে বর্মওয়ালা সরোপেল্টা আর্মি ট্যাঙ্কের মতো জড়ো হচ্ছে। ওই দেখেন। একঝাঁক ভেলোসির‍্যাপ্টর শিকারের পেছনে দৌড়াচ্ছে। জুরাসিক ওয়ার্ল্ডের ক্লু'র সাথে কোনো মিল নেই এদের। সারা শরীর মুরগির মতো পালকে ঢাকা। হাতের জায়গায় দুইটা ডানা। পেছনে পাখির মতো ঝলমলে একটা লেজ।

ওই দেখেন! ট্রাইসেরাটপ্সকে তাড়া করছে একটা টি-রেক্স! আমেরিকান টাইরানোসরাস রেক্স নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বিখ্যাত ডাইনোসর, এই পর্যন্ত একগাদা মুভিতে স্টার হয়েছে সে। অভিনয় ভালোই পারে। টি-রেক্স কিন্তু সবচেয়ে বড় মাংসাশী ডাইনো না, ওই রেকর্ড স্পাইনোসরাসের। টি-রেক্স বিখ্যাত তার অসম্ভব শক্তিশালী চোয়ালদুটোর জন্য।

মানুষের বাইট ফোর্স ৭২০ নিউটন।

একটা বাঘের বাইট ফোর্স সাড়ে চার হাজার নিউটন। সে মানুষের মাথাকে ডিমের খোসার মতো গুঁড়িয়ে দিতে পারে।

বর্তমান যুগের সবচেয়ে পাওয়ারফুল চোয়াল লোনাপানির কুমিরের। ১৬ হাজার নিউটন। মারাত্মক!

টি-রেক্সের বাইট ফোর্স কত? ৪০ হাজার নিউটন। এই রেকর্ড মাটির প্রাণীদের মধ্যে সর্বোচ্চ। টি-রেক্সকে বেঁচে থাকতে হয় ৩০ ফুট লম্বা বর্মওয়ালা ডাইনোসরদের খেয়ে খেয়ে, ওই বাইট ফোর্স তার দরকার আছে। টি-রেক্সের ওই চোয়ালটার নাম দেওয়া হয়েছে বোন ক্রাশার।

এই টি-রেক্সটার ভাগ্য ভালো না। সে পানির বেশি কাছাকাছি চলে এসেছিল। ৪০ ফুট লম্বা দানব কুমির ডেইনসুচাসের বাইট ফোর্স ৬ লাখ ২ হাজার নিউটন। সে টি-রেক্সের মাথাটা ডিমের খোসার মতো ভাঙতে পারে।

সবচেয়ে বেশি বাইট ফোর্স তাহলে কার? ওই গল্প হবে সিনোজোইক পর্বে।

৩। কোয়েটজালকোয়াটল নামটা বিশাল, লিখতে গেলে খবর হয়ে যায়। নিজের প্রয়োজনেই ধরে নিচ্ছি, পানির ধারে এসে সর্পদেবী অবশেষে টের পেল তার ঘাড়ে উকুনের মতো একটা উটকো ঝামেলা চেপে বসেছে। সে হুট করে ঘুরে তাকিয়ে ঘাড় ঝাড়া দিল, আপনিও টুপ করে পানিতে পরে গেলেন।

ক্রেটাসিয়াসের সমুদ্র উত্তাল, ঢেউয়ের পরতে পরতে সেখানে মুখ লুকিয়ে থাকে ভয়ঙ্কর সব দৈত্য দানো। কয়েক মাস গভীর সমুদ্রে লম্বা একটা ঘুম দিয়ে এই মুহূর্তে সেখানে জেগে উঠেছে দানব কাছিম আর্কিলন। তার পনেরো ফুট বিশাল শরীরটায় খোলসটা আছে

নিচের দিকে। কি করব বলেন, একেবারে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী, জামাটাও ঠিকমতো পরতে শেখেনি! প্রিয় পাঠক, খুব লম্বা করে একটা নিঃশ্বাস নেন, আর্কিলনের পিঠে চড়ে আমরা ডুব দিবো ক্রেটাসিয়াসের গভীর সমুদ্রে!

৪। ক্রেটাসিয়াসের মাটির উপর রাজত্ব করত নানান জাতের ডাইনোসররা, পানির দুনিয়ায় তাদের জায়গা দখল করেছিল নানান জাতের সাগর দানোরা। ডলফিনের মতো চেহারার মাছের মতো দেখতে সরীসৃপদের নাম ছিল ইকথাইওসর – ফিশ রেপ্টাইল। বিশাল লম্বা গলাওয়ালা সরীসৃপদের নাম প্লেসিওসর, তাদের চারটা করে পাখনা প্যাডেলের মতো সাঁতার কাটে।
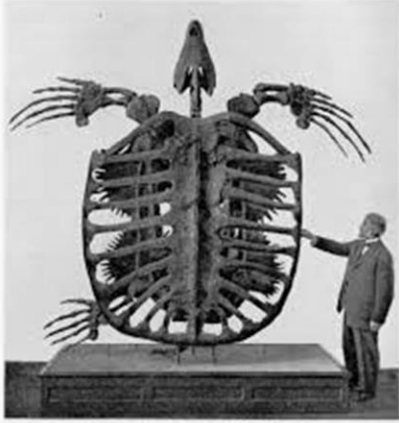
সাপের মতো চেহারার অনেকটা কমোডো ড্রাগন টাইপ দাঁতালো দানবদের নাম মোজেসর।
ইকথাইওসর শনিসরাসের গল্প ট্রায়াসিক পর্বে বলেছি, আজকে বলব বাকি দুই জনের গল্প।
৫। লক নেসের দানব নেসির কথা মনে আছে? ঐ যে বিশাল লম্বা গলা, পিঠের উপর উটের মতো কুঁজ? নেসি থাকে স্কটল্যান্ডের লক নেস নামের লেকে, বহুদিন পরপর একবার মাথা তুলে আকাশটা দেখার চেষ্টা করে। নেসির অস্তিত্ব সত্যি সত্যি ছিল কিনা জানি না। অল্প কিছু ছবি পাওয়া যায়, ফেইক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক।

সত্যিকারের যে প্রাগৈতিহাসিক দানব নেসির গল্পের জন্ম দেয় তার নাম প্লেসিওসর। এই পর্যন্ত অনেক জাতের প্লেসিওসরের ফসিল পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো ইলাজমোসরাস। তার ৫০ ফুট লম্বা ৫ তলার সমান বিশাল শরীরটার বেশিরভাগ জায়গা জুড়ে আছে জিরাফের মতো লম্বা একটা গলা। ওই গলাটা এঁকে বেঁকে সে শিকার করত ক্রেটাসিয়াসের দানব মাছ আর অন্যান্য সব সরীসৃপদের। ইলাজমোসরাস হলো সরীসৃপ, কুমিরদের মতোই সে পানিতে শ্বাস নিতে পারত না। বুকের মাপ দেখে বুঝা যায় তার ছিল বিশাল একটা ফুসফুস, একবার নিঃশ্বাস নিলে ২০ মিনিট পর্যন্ত বাতাস ধরে রাখতে পারত।
কোথাও কোনো ইলাজমসরাসের ডিম পাওয়া যায়নি, ধারণা করা হয় সে আস্ত বাচ্চা দিতো ম্যামালদের মতো।

৬। জুরাসিক ওয়ার্ল্ডের মোজেসরাসের কথা মনে আছে? ঐ যে বিশাল পানির দানব, যার সকালের নাস্তা ছিল গ্রেট হোয়াইট শার্ক আর রাতের ডিনার ছিল ডাইনোসরের মাংসের

কাবাব। প্লেসিওসররা যেমন জন্ম দিয়েছে লক নেসের মনস্টারের গল্প, মোজেসরদের হাড়-গোড় আর ফসিল তেমনি জন্ম দিয়েছে সাগর দানবদের গল্প।

নর্স মিথলজিতে আছে সুবিশাল মিডগার্ড সার্পেন্টের কাহিনী, যে কিনা এত বড় যে, পুরো পৃথিবীটাকে সে একপাক প্যাঁচিয়ে ফেলতে পারবে। মহাজ্ঞানী গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল historia animalum এ আরেক দানবের কাহিনী বলে গেছেন, যে মুখ খুললে আস্ত ঘাড়সুদ্ধমানুষ পেটে ঢুকে পড়তে পারে। ১৭৩৪ সালের ৬ই জুলাই হ্যান্স এগেড নামের নাবিক গ্রিনল্যান্ডের কাছাকাছি সমুদ্রে জাহাজের ক্রোস নেস্ট থেকে তাকিয়ে দেখেন এমনি আরেক ভয়াবহ সাগর দানো, আকারে যে কিনা তার জাহাজটার চেয়েও অনেক বড়, আর চেহারাটা এমন ভয়ঙ্কর যে, আমাদের পরিচিত কোন কিছুর সাথে তার কোন মিল নেই।

আবারও, এই কাহিনীগুলোর সত্যতা আমি দাবি করছি না, তিলকে তাল বানানো মানুষের স্বভাব। এগুলোর উৎস হিসাবে ধরা যায় প্রাগৈতিহাসিক মোজেসরের হাড়গোড়কে।

মোজেসরদের প্লেসিওসরদের মতো লম্বা গলা নেই, তাদের চিকন চ্যাপ্টা দেহটা স্রোতের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য খুবই উপযোগী। শরীরটা ৫০ ফুট, ৫ তলার সমান লম্বা। ঝকঝকা দাঁতের মাথাটা বহু প্রাণীর হাড়-গোড় চিবিয়ে খাওয়ার জন্য যথেষ্ট। আপনি যেই পনেরো ফুট লম্বা সি টারটলটার পিঠে আছেন, সেটা মোজেসরাসের খাবার, তাই আপনাকে অনেক সাবধান হতে হবে।

৭। মাটিতে ডাইনোসর, আকাশে টেরোসর, পানিতে সাগরদানো – প্রাণের এই অভূতপূর্ব মহাযজ্ঞ চিরদিন চলবে না। এই নিয়ে চারবার পৃথিবীর প্রাণিজগৎ ধ্বংস হয়ে গেছে, আরও একবার হবে।

এবারের কালপ্রিটটার নাম চিক্সুলাব। সে একটা অ্যাস্টেরয়েডের টুকরা। দানবীয় উল্কাটার সাইজ ধারণা করা হয় ১১ থেকে ৮১ কিলোমিটার পর্যন্ত। মেক্সিকোর চিক্সুলাব অঞ্চলে সে যেই ক্ষত রেখে গেছে তার ব্যাস ১৫০ কিলোমিটার।
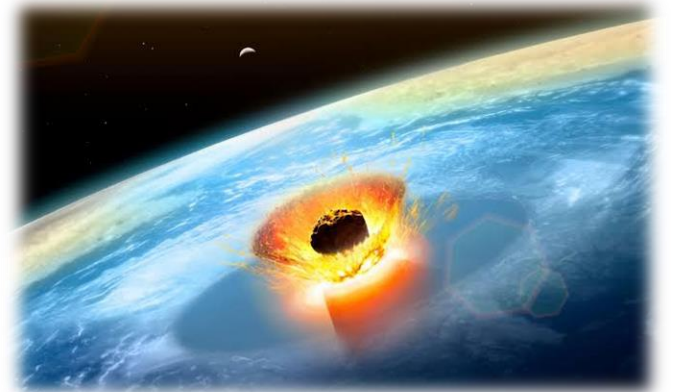
ডাইনোসর ধ্বংসের আমরা যেই ছবিটা মনে মনে চিন্তা করি – বিরাট বড় একটা উল্কা আছড়ে পড়ল আর ডাইনোসররা সব পুড়ে ছারখার হয়ে গেল, ব্যাপারটা আসলে সেরকম না। মৃত্যু জিনিসটা স্লো, করুণ, ভয়ঙ্কর। উল্কাপাতে আশেপাশের প্রাণীরা মারা যায় ঠিকই, সারা পৃথিবীতে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগে। উল্কার ধ্বংসাবশেষ বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে, একেবারে স্ট্রাটোস্ফিয়ার পর্যন্ত। সূর্যের আলো আসা খুব কমে যায়। পৃথিবীটা তখন ঘন কালো মেঘাচ্ছন্ন জগত।

আলো আসা খুব কমে যাওয়ায় বড় বড় গাছরা মরে সালোকসংশ্লেষণের অভাবে। না খেতে পেরে আস্তে আস্তে মারা যায়

বিশাল তৃণভোজী ডাইনোসররা। শেষে মারা যায় তাদের খেয়ে যারা বেঁচে থাকত সেইসব মাংসাশী প্রাণীরা।

কতদিন ধরে মড়ক চলেছিল বিতর্ক আছে। কেউ বলে কয়েক বছর, কেউ বলে কয়েক হাজার। পৃথিবীর ৭৫ ভাগ প্রাণী এই মহাধ্বংসযজ্ঞে মারা যায়। কিছু কুমির ছাড়া, ২৫ কেজির বেশি ওজনের কোনো মাটির প্রাণী রক্ষা পায় নি। একমাত্র পাখি ছাড়া প্রায় সব ধরনের ডাইনোসর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সাগরে ভাসতে থাকে মোজেসর আর প্লেসিওসরদের লাশ।

৮। শেষ করার আগে একটা ভালো খবর দিয়ে যাই। ডাইনোসরের যুগের শেষে এসে, ক্রেটাসিয়াস যুগে গাছরা ফুল ফোটাতে শিখে গেছে। ফুল আর মৌমাছি, প্রজাপতিতে ভেসে গেছে চারদিক।

এই গাছগুলো সব ধ্বংস হয়নি উল্কাপাতে, কেউ কেউ টিকে গেছে সবকিছু সহ্য করে। সামনে আসছে ম্যামালদের যুগ, নতুন পৃথিবীকে ফুল ফল আর অক্সিজেন দিয়ে ভরে দিতে এই গাছগুলোর খুব দরকার হবে।

এই পৃথিবীতে হোমো স্যাপিয়েন্স নামের প্রাণী এসেছে খুব বেশি হলে এক লক্ষ বছর আগে। সেখানে ডাইনোসররা এখানে রাজত্ব করেছিল পনেরো কোটি বছর ধরে। আজ থেকে সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে মেক্সিকোর চিক্সুলাবে(Chicxulub) ভয়াবহ এক উল্কা নেমে আসে, তাই ছাই ভস্ম ছড়িয়ে পড়ে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার জুড়ে। সূর্যের আলোর অভাবে প্রথমে বড় গাছ, পরে মাঝারি গাছ আস্তে আস্তে মারা যায়। অন্ধকারে ক্ষুধায় কাতর হয়ে ধুঁকে-ধুঁকেমরে ২৫ কেজির বেশি ওজনের সকল স্থলচর প্রাণীরা। শেষের দিকে ঠান্ডায়হিমশীতল হয়ে যায় পৃথিবী।

তারপর প্রায় সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে বিশ্বজোড়া শীতল ডাইনোসরের কবরস্থানে সূচনা হয় নতুন যুগের – প্যালিওজিন। গত পনেরো কোটি বছর যে স্তন্যপায়ী প্রাণীরা ডাইনোসরদের লাথি-গুঁতা খেয়ে উঠে দাঁড়াতে পারত না, আজ এতদিন পর তারা সুযোগ পেল। কিছুদিন পর হিমশীতল পৃথিবী স্বাভাবিক হয়ে আসলো, সবুজ পাতা, ঘাস আর ফুলে ফুলে ভরে গেল চারদিক। নতুন পৃথিবী ভরে গেল নতুন বাসিন্দাদের দিয়ে।

চলুন ঘুরে আসি প্যালিওজিনের দুনিয়া থেকে।

প্যালিওজিন

১। কলাম্বিয়ার গহীন জঙ্গল। পাঁচ কোটি নব্বই লাখ বছর আগে। আকাশে চাঁদ উঠেছে, কিন্তু জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে না। পাশের মজা ডোবা কুয়াশা ছড়াচ্ছে, সে কুয়াশা পাক খেয়ে খেয়ে আধিভৌতিক পরিবেশ তৈরি করেছে বন জুড়ে। বড় বড় বুদবুদ অদ্ভুত শব্দে ফাটছে ডোবাটার মাঝখানে, একটা বোঁটকা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে।

আপনি বসে আছেন ডোবার ধারে বড় গাছটার মাচায়। টাইম মেশিনে করে খাওয়ার জন্য যে তিনটা ছাগল এনেছিলেন তাদের দুইটাই শিকার হয়ে গেছে গত সপ্তাহে। কিছু একটা আসে নিঃশব্দে, আস্ত গিলে ফেলে শিকারকে, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে চলে যায় জলার দিকে।

মাঝ রাত। মশামাছির প্রচণ্ড উপদ্রব, তারপরও ঝিমুনির মতো হয়েছিল। নিচের নিস্তরঙ্গ জলায় হঠাৎ ঝটপট নড়াচড়ার শব্দে ঘুম

ছুটে গেল চোখ থেকে। .450 বোরের রাইফেলটা তাক করলেন নিচের দিকে।

বেশ বড়সড় একটা কুমির বের হয়ে আসলো জলা থেকে। পনেরো ফুট লম্বা হবে অন্তত। এই শালাই তাহলে কালপ্রিট। রাইফেলটা তাক করে ট্রিগারে হাত রাখলেন। চোখের নিচ বরারর গুলি করতে হবে।

একটা মশার কামড়, এক মুহূর্তের ইতস্তত আপনাকে বাঁচিয়ে দিল। রাইফেলের ঘোড়া টিপলে সর্বনাশ হয়ে যেত নাহলে। কারণ একটু আগে পনেরো ফুট লম্বা যে কুমিরটা মাটিতে দাঁড়িয়ে ছিল, সে এখন আছে মাটি থেকে দশ ফুট উপরে। বাঁচার জন্য ছটফট করছে।

জলা থেকে উঠে আসা পঁয়তাল্লিশ ফুট লম্বা এক টন ওজনের সুবিশাল সাপ মহাদানব টাইটানোবোয়ার মুখের মধ্যে পনেরো ফুট লম্বা কুমিরটাকে টিকটিকির মতো লাগছে। নিস্পৃহ, নিশ্চল সবুজ চোখ মেলে সে দেখছে চারপাশের কুয়াশাঘেরা প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবী। আশেপাশের পুরো দুনিয়া শান্ত, নিশ্চল হয়ে গেছে, শুধু বোঁটকা গন্ধের রাজত্ব করছে অনুভূতি জুড়ে। আপনি কি কাঁপছেন? মাচা কাঁপছে কি ঠকঠক করে? সাবধান, সর্পরাজ ঘুরে তাকাবে!

২। ডাইনোসর শেষ, পৃথিবীতে এসেছে নতুন দানবরা। আমাজনের জঙ্গলে জলাভূমিতে তখন রাজত্ব করছে দানবাকার সাপ

টাইটানোবোয়া, ওদিকে ইংল্যান্ড আর বেলজিয়ামের বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে দানব পাখি গ্যাস্টর্নিস।

সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, সারা গায়ে পালকভর্তি, ছোট একটা লেজ, ছোট দুইটা ডানা। ক্রেটাসিয়াস যুগে প্রায় হুবহু তার মতো দেখতে পালক ওয়ালা লোমশ ডাইনোসর ছিল। তার ঠোঁটটা টিয়া পাখির মতো, কিন্তু অনেক বড়, কেমন জানি বীভৎস। এই জাতীয় ঠোঁটকে বলে নাটক্র্যাকার। জঙ্গলে ছোটাছুটি করে কর্কশ চিৎকার করে শিকার খুঁজে চলেছে সে, সাবধানে থাকাই ভালো। আফটার অল, ডাইনোসরের বংশধর সে, রক্তে মিশে আছে পশুশক্তি।

৩। কিন্তু পাখিদের যুগ, সাপদের যুগ বেশিদিন থাকবে না। স্তন্যপায়ীরা ছড়িয়ে পড়ছে সারা পৃথিবীতে। আমেরিকার জঙ্গলে পনেরো ইঞ্চি লম্বা মিনি বিড়ালের সমান এক ধরনের প্রাণী দেখা যাচ্ছে। আকারে বিড়ালের সমান হলেও দেখতে সে পুরোদস্তুর ঘোড়া। নাম তার প্রোটো হিপ্পাস। হিপ্পাস কথাটার মানে ঘোড়া। প্রোটো হিপ্পাস মানে আদি ঘোড়া। কিছুদিন পরেই তাদের জায়গা নেবে কুকুরের সমান সাইজের ইওহিপ্পাসরা।

এসেছে আদি খরগোশ, ইওমিস নামের উড়ন্ত কাঠবিড়াল গ্লাইড করে বেড়াচ্ছে ডালে ডালে। আদিম চামচিকা কিচমিচ করছে সন্ধ্যার জঙ্গলে। দশ ফুট লম্বা অ্যাম্বুলোসিটাস হচ্ছে তিমির পূর্বপুরুষ। এরা এখনও মাটিতেই আছে, শক্ত চারটা পা এখনও বিবর্তিত হয়ে পাখনা হয়ে যায়নি। জলার ধারে মাঝে মাঝেই এদের সশব্দে পানিতে আছড়ে পড়তে দেখা যায়।
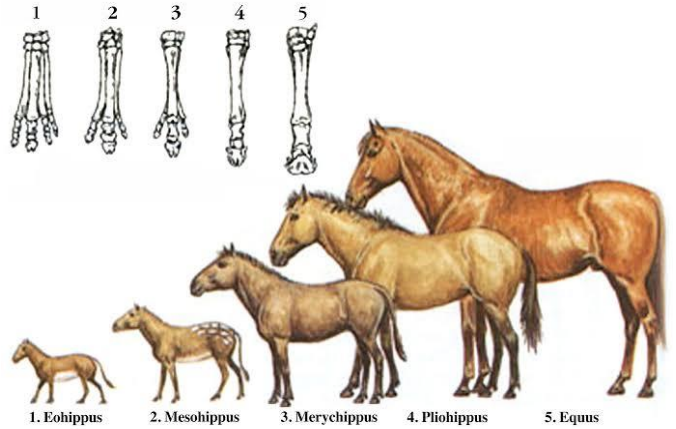
বাঘ সিংহ ভালুকের এখনও দেখা মেলেনি। রাতের মঙ্গোলিয়ার মরুভূমিতে চোখ লাল করে, সাড়ে তিন ফুট লম্বা মাথায় ঝকঝকে শিকারী দাঁত নিয়ে ঘুরে বেড়ায় অ্যান্ড্রুসার্কাসের দল। মাংসাশী হিংস্র এই শূকর। একেকটা তেরো ফুট লম্বা, তাদের শক্ত চোয়ালটায়

অস্বাভাবিক শক্তি ধরে। শূকরের এই পূর্বপুরুষ এখন পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে বড় স্থলচর শিকারী ম্যামাল।

৪। চারপাশে বিচিত্র সব প্রাণী, কেউ শিকার কেউ শিকারী। এর মাঝে জার্মানির জঙ্গলে গাছে গাছে নেচে বেড়াচ্ছে তেইশ ইঞ্চি লম্বা ছোট একটা প্রাণী। গাছের পাতা, ফল আর বীজ খেয়ে তার দিন কাটে। মাঝে মাঝে বড় বড় শিকারী দাবড়ানি দেয়, সে দৌড়ে মুখ লুকায় ডাল পালায় তৈরি তার ছোট বাসাটায়।

সেদিনের প্রাণিজগতের এসব ভাবার মতো বুদ্ধি ছিল না। যদি থাকত তাহলে বুঝত এই নিরীহ গোবেচারা প্রাণীটার বংশধর একদিন সারা পৃথিবীর দখল নেবে। তাহলে বুঝত এক দিন এর কারণে ঝাড়েবংশে নির্বংশ হবে সব প্রাণীরা। যদি ভাবত বুঝতে পারত একে কোনোমতেই বাঁচতে দেওয়া উচিত হবে না।

মিট ডারউইনিয়াস – সকল বানর, গরিলা, শিম্পাঞ্জি আর মানুষদের সম্ভাব্য পূর্বপুরুষ!

নিওজিন

১। বলেছিলাম- একটা মানুষের বাইট ফোর্স ৭২০ নিউটন। মুরগির হাড়-গোড় চাবাতে পারে সহজেই। গরুর মাথার খুলি কামড়ে ভাঙতে তার খবর হয়ে যাবে।

একটা বাঘের বাইট ফোর্স সাড়ে চার হাজার নিউটন। সে মানুষের মাথাকে ডিমের খোসার মতো গুঁড়িয়ে দিতে পারে।

বর্তমান যুগের সবচেয়ে পাওয়ারফুল চোয়াল লোনাপানির কুমিরের। ১৬ হাজার নিউটন। মারাত্মক!

ডাইনোসর টি-রেক্সের বাইট ফোর্স কত? ৪০ হাজার নিউটন। এই রেকর্ড মাটির প্রাণীদের মধ্যে সর্বোচ্চ। টি-রেক্সকে বেঁচে থাকতে হয় ৩০ ফুট লম্বা বর্মওয়ালা ডাইনোসরদের খেয়ে খেয়ে, ওই বাইট ফোর্স তার দরকার আছে। টি-রেক্সের ওই চোয়ালটার নাম দেওয়া হয়েছে বোন ক্রাশার।

সবচেয়ে বেশি বাইট ফোর্স তাহলে কার? অন্য কোনো দানবের? তিমির?

প্রাগৈতিহাসিক মন্সটার শার্ক কার্কারোডন মেগালোডনের বাইট ফোর্স ধারণা করা হয় সর্বোচ্চ এক লাখ আশি হাজার নিউটন। কিছুদিন আগে মেগ নামের একটা মুভি বের হয়েছিল, সেখানে মেগালোডন নিয়ে অনেক ভুলভাল তথ্য ছিল। কিন্তু একটা তথ্য ঠিক, এই ভয়াবহ দানব আসলেই কামড়ে একটা জাহাজকে দুই টুকরা করার সামর্থ্য রাখত। [i]

আজ থেকে দুই কোটি বছর আগে, দানব হাঙরের চোয়ালের নিচে টগবগ করে ফুটতে থাকা রক্তলাল সমুদ্রের নিওজিন যুগে আপনাকে স্বাগত!

২। হাঙর নামের প্রাণীটা পৃথিবীতে আসে ৪২ কোটি বছর আগে, সেই ডেভোনিয়ান যুগে। তারপর দিনের পর দিন সে বিবর্তিত হয়েছে, আরও বুদ্ধিমান হয়েছে, শক্তিশালী হয়েছে, বড় হয়েছে। ৪০ কোটি বছরের বিবর্তন এদেরকে পরিণত করেছে প্রাণিজগতের সবচেয়ে দক্ষ খুনিদের একজন হিসাবে।

মেগালোডন শব্দটার মানে হচ্ছে বড় দাঁত। মেগালোডনের মুখের ভেতর পাঁচ সারি দাঁত ছিল, সেগুলোর সাইজ ৭ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হতে পারতো। এই পাঁচটা সারি মিলে মেগালোডনের দাঁত ছিল ২৭৬ টা। একটা দাঁত কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেলে দুই তিনদিনের ভেতরই নতুন দাঁত গজাত। আস্ত ফসিল তার খুব রেয়ার, এমনকি ৭ ইঞ্চি দাঁতও মারাত্মক রেয়ার, একেকটার দাম পড়তে পারে ৫০ হাজার পাউন্ডের মতো। কিন্তু ছোট ছোট দাঁতের ভাঙ্গা ফসিল বেশ কমন, amazon.com এ অল্প দামেই বিক্রি হয়। কিছুদিন আগে স্পাইনোসরাসের দাঁত কিনেছি একটা, মেগালোডনের দাঁতও সংগ্রহে রাখার ইচ্ছে আছে অনেক। [i]

মুখের ভেতর সারি সারি বড় বড় দাঁত নিয়ে মেগালোডনের ২০ মিটার (৬৬ ফুট) লম্বা শরীরটা অস্বাভাবিক শক্তি রাখত। সেই সাথে ছিল তার তীব্র ইলেকট্রিক্যাল সেন্স। ঘন কালো অন্ধকারেও শিকারীর মাসলের সামান্য নড়াচড়া সে ডিটেক্ট করতে পারত। ছোট ছোট তিমি থেকে শুরু করে কাছিম, সি লায়ন, সি কাউ ছিল তার শিকারের লিস্টে। সারা পৃথিবীতে উষ্ণ, আলোকিত সমুদ্রে শিকারের সন্ধানে চষে বেড়াত এরা।

আজ থেকে ২৬-২৮ লাখ বছর আগে মেগালোডন পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। বিলুপ্তির কারণ হিসাবে ধারণা করা হয় নতুন আসা বড় বড় তিমি আর গ্রেট হোয়াইট শার্কদের সাথে কম্পিটিশনে টিকতে না পারা। গভীর সমুদ্রে এরা কখনোই থাকেনি, ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চের গভীরে এদেরকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই কোনো। এই জাতীয় শার্ক গভীর সমুদ্রের অস্বাভাবিক চাপ সহ্য করতে পারত, এমন কোনো প্রমাণ নেই। মেগালোডন এখনও দুই চারটা বেঁচে আছে, এ সম্ভাবনায় বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন না। [i]

মেগের মুখের হাঁ ছিল প্রায় একটা পূর্ণবয়স্ক মানুষের সমান। বর্তমানে জীবিত অতি হিংস্র গ্রেট হোয়াইট শার্কের খুব কাছের আত্মীয় ছিল এরা। ছবিতে গ্রেট হোয়াইট শার্কের সাথে মেগের আকার আকৃতি তুলনা করা হয়েছে।
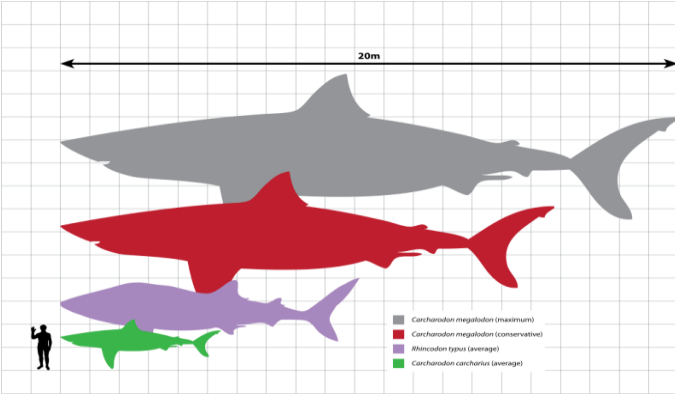
আজ থেকে মোটামুটি আড়াই কোটি বছর আগে থেকে এ যুগের শুরু, মোটামুটি ২৬ লাখ বছর আগে এর শেষ। এ সময় ভারতবর্ষের ধাক্কা লেগে গেছে এশিয়ার মূল ভূখন্ডের সাথে, হিমালয় পর্বত আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। মেরু অঞ্চল ঢেকে গেছে বরফে। সারা পৃথিবী ছেয়ে গেছে ঘাসবনে আর নানান জাতের সিজনাল বনভূমিতে।

ডাইনোসরের রাজত্ব বহু আগেই শেষ। দানব সাপরাও আজ বিলুপ্ত। সেই ঘাসবন আর বনভূমিতে আজ, এত বছর পর, অবশেষে রাজত্ব করছে স্তন্যপায়ীরা। আকাশে ডানা মেলছে সত্যিকারের পাখিরা।

৩। পাকিস্তান, আড়াই কোটি বছর আগে।

ঘাসবন।

বৃষ্টির পরে পানি জমেছে, ঘাসবনে জন্ম হয়েছে ছোট ছোট অনেক পুকুরের।

এখানে পানি খেতে এসেছে একজোড়া প্যারাসেরাথেরিয়াম। আদিম শিংবিহীন গন্ডার।

এর বিশাল মাথাটা সাড়ে চার ফুট লম্বা। আট মিটার লম্বা শরীরটার ওজন প্রায় ১৭ টন। উচ্চতায় দুজন মানুষের বেশি। ঘাসখেকো, রগচটা স্বভাবের, গায়ে তার পেশি ফুলে ফুলে উঠছে। আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সর্বকালের সবচেয়ে বড় মাটির ম্যামাল - অতএব সাবধান!

৪। কত বড় হয় এখনকার দিনের একটা পাখি? চার ফুট? পাঁচ ফুট? আর্জেন্টিনার আকাশে নিওজিন যুগে উড়েছে কুখ্যাত থান্ডারবার্ড আর্জেন্টাভিস। একেকটার ওজন ছিল ৮০ কেজির মতো। এক ডানা থেকে আরেক ডানার দূরত্ব প্রায় ৮ মিটার (২৬ ফুট)।

এই বিশাল শরীর নিয়ে এরা খুব সহজে এক ঘণ্টায় পাড়ি দিতে পারে চল্লিশ কিলোমিটার পথ। প্রতিদিন এদের খাবার দরকার হয় আড়াই থেকে পাঁচ কেজি। ঈগলের মতো দক্ষতায় চষে বেড়ায় আকাশ।

এরা কি মানুষকে তুলতে পারত? সম্ভবত পারত। ভাগ্য ভালো, পাখির শিকার হওয়ার জন্য কোনো মানুষ সে যুগে সেখানে ছিল না।

৫। দক্ষিণ আমেরিকা। আমাজনের জঙ্গল।

গহীন বনের মাঝে একটু ফাঁকা জায়গা। সেখানে আপনি তাঁবু গেরেছেন।

অনেকক্ষন ধরে বোঁটকা একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে জঙ্গলে। একটু দূরে ডালপালা ভাঙার একটা শব্দ হচ্ছে। বিশ ফুট লম্বা একটা রোমশ ছায়া আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ কি জানি ঝাঁপিয়ে পড়ল দানবের উপর। বাঘের গর্জন শোনা গেল, জবাবে অন্য একটা প্রতি গর্জন। ডালপালা ভাঙার শব্দ কোনোমতে রাত পার করলেন। ভোরের অনেক আগেই শব্দ থেমে গেছে। সাবধানে ইনভেস্টিগেশনে আগালেন।

জঙ্গলে গাছের নিচে পড়ে আছে একটা সেবার টুথ টাইগারের লাশ। কে জানি বুকটা খুবলে নিয়েছে তার। রক্তে ভেসে গেছে চারপাশ, আর চারপাশে ঘুরছে বিরাট বিরাট পিঁপড়া।

কেন জানি মনে হচ্ছে, যে এই কাজ করেছে, সে কাছে পিঠেই কোথাও আছে। ডালপালা ভেঙেছে কি দূরে?

৬। যে দানব একটা প্রাগৈতিহাসিক বাঘকে এভাবে মেরে ফেলতে পারে তার নাম আপাতত অজানাই থাক। সব কিছু জানতে হয় না। প্রায় চৌত্রিশ লক্ষ বছর আগে এই পৃথিবীতে মানুষের অতি প্রাচীন, আদিম পূর্বপুরুষেরা নতুন যুগের সূচনা করেছে। বলেন তো কোন যুগ?

আরও বাড়ল। চোয়াল খোলা বন্ধ হওয়ার খটখট শব্দ হলো। তীক্ষ্ণ আঁচড়ের শব্দ হলো। রাক্ষসের গোঙানিতে কেঁপে উঠলো নিশুতি রাত।

তাঁবুর ভেতর আপনি বসে কাঁপছেন থরথর করে।

তার বদলে চলুন ঘুরে আসি আফ্রিকা থেকে।

তানজানিয়া, ত্রিশ লক্ষ বছর আগে।

এইখানে বাস করে একদল অস্ট্রেলোপিথেকাস আফ্রিকানাস। বুদ্ধিমত্তা মোটামুটি, এখনকার গরিলা বা শিম্পাঞ্জিদের চেয়ে কম। গাছ ছেড়ে মাটিতে নেমে এসেছে তারা, সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখেছে। আরেকটা জিনিস তারা শিখেছে, সেটা হচ্ছে অস্ত্রের ব্যবহার। পাথর কেটে কেটে তারা নানা ধরণের ভোতা অস্ত্র তৈরি করেছে।

রাইট। সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় এই যুগের নাম হচ্ছে প্রস্তর যুগ। ওই দেখেন, পাথরে শান দিয়ে রেডি হচ্ছে তারা, শিকারের সন্ধানে যাচ্ছে।

সমুদ্র জিত সাহা

INTERNATIONAL CHRONOSTRATIGRAPHIC CHART

International Commission on Stratigraphy

Eonothem / Eon	Erathem / Era	System / Period	Series / Epoch	Stage / Age	numerical age (Ma)
					present
Phanerozoic	Cenozoic	Quaternary	Holocene		0.0117
			Pleistocene	Upper	0.126
				Middle	0.781
				Calabrian	1.80
				Gelasian	2.58
		Neogene	Pliocene	Piacenzian	3.600
				Zanclean	5.333
			Miocene	Messinian	7.246
				Tortonian	11.62
				Serravallian	13.82
				Langhian	15.97
				Burdigalian	20.44
				Aquitanian	23.03
		Paleogene	Oligocene	Chattian	28.1
				Rupelian	33.9
			Eocene	Priabonian	38.0
				Bartonian	41.3
				Lutetian	47.8
				Ypresian	56.0
			Paleocene	Thanetian	59.2
				Selandian	61.6
				Danian	66.0
	Mesozoic	Cretaceous	Upper	Maastrichtian	72.1 ±0.2
				Campanian	83.6 ±0.2
				Santonian	86.3 ±0.5
				Coniacian	89.8 ±0.3
				Turonian	93.9
				Cenomanian	100.5
			Lower	Albian	~ 113.0
				Aptian	~ 125.0
				Barremian	~ 129.4
				Hauterivian	~ 132.9
				Valanginian	~ 139.8
				Berriasian	~ 145.0

Eonothem / Eon	Erathem / Era	System / Period	Series / Epoch	Stage / Age	numerical age (Ma)
					~ 145.0
Phanerozoic	Mesozoic	Jurassic	Upper	Tithonian	152.1 ±0.9
				Kimmeridgian	157.3 ±1.0
				Oxfordian	163.5 ±1.0
			Middle	Callovian	166.1 ±1.2
				Bathonian	168.3 ±1.3
				Bajocian	170.3 ±1.4
				Aalenian	174.1 ±1.0
			Lower	Toarcian	182.7 ±0.7
				Pliensbachian	190.8 ±1.0
				Sinemurian	199.3 ±0.3
				Hettangian	201.3 ±0.2
		Triassic	Upper	Rhaetian	~ 208.5
				Norian	~ 227
				Carnian	~ 237
			Middle	Ladinian	~ 242
				Anisian	247.2
			Lower	Olenekian	251.2
				Induan	252.17 ±0.06
	Paleozoic	Permian	Lopingian	Changhsingian	254.14 ±0.07
				Wuchiapingian	259.8 ±0.4
			Guadalupian	Capitanian	265.1 ±0.4
				Wordian	268.8 ±0.5
				Roadian	272.3 ±0.5
			Cisuralian	Kungurian	283.5 ±0.6
				Artinskian	290.1 ±0.26
				Sakmarian	295.0 ±0.18
				Asselian	298.9 ±0.15
		Carboniferous (Pennsylvanian)	Upper	Gzhelian	303.7 ±0.1
				Kasimovian	307.0 ±0.1
			Middle	Moscovian	315.2 ±0.2
			Lower	Bashkirian	323.2 ±0.4
		Carboniferous (Mississippian)	Upper	Serpukhovian	330.9 ±0.2
			Middle	Visean	346.7 ±0.4
			Lower	Tournaisian	358.9 ±0.4

Eonothem / Eon	Erathem / Era	System / Period	Series / Epoch	Stage / Age	numerical age (Ma)
					358.9 ± 0.4
Phanerozoic	Paleozoic	Devonian	Upper	Famennian	372.2 ±1.6
				Frasnian	382.7 ±1.6
			Middle	Givetian	387.7 ±0.8
				Eifelian	393.3 ±1.2
			Lower	Emsian	407.6 ±2.6
				Pragian	410.8 ±2.8
				Lochkovian	419.2 ±3.2
		Silurian	Pridoli		423.0 ±2.3
			Ludlow	Ludfordian	425.6 ±0.9
				Gorstian	427.4 ±0.5
			Wenlock	Homerian	430.5 ±0.7
				Sheinwoodian	433.4 ±0.8
			Llandovery	Telychian	438.5 ±1.1
				Aeronian	440.8 ±1.2
				Rhuddanian	443.4 ±1.5
		Ordovician	Upper	Hirnantian	445.2 ±1.4
				Katian	453.0 ±0.7
				Sandbian	458.4 ±0.9
			Middle	Darriwilian	467.3 ±1.1
				Dapingian	470.0 ±1.4
			Lower	Floian	477.7 ±1.4
				Tremadocian	485.4 ±1.9
		Cambrian	Furongian	Stage 10	~ 489.5
				Jiangshanian	~ 494
				Paibian	~ 497
			Series 3	Guzhangian	~ 500.5
				Drumian	~ 504.5
				Stage 5	~ 509
			Series 2	Stage 4	~ 514
				Stage 3	~ 521
			Terreneuvian	Stage 2	~ 529
				Fortunian	541.0 ±1.0

Eonothem / Eon		Erathem / Era	System / Period	numerical age (Ma)
				~ 541.0 ±1.0
Precambrian	Proterozoic	Neo-proterozoic	Ediacaran	~ 635
			Cryogenian	850
			Tonian	1000
		Meso-proterozoic	Stenian	1200
			Ectasian	1400
			Calymmian	1600
		Paleo-proterozoic	Statherian	1800
			Orosirian	2050
			Rhyacian	2300
			Siderian	2500
	Archean	Neo-archean		2800
		Meso-archean		3200
		Paleo-archean		3600
		Eo-archean		4000
	Hadean			~ 4600

Units of all ranks are in the process of being defined by Global Boundary Stratotype Section and Points (GSSP) for their lower boundaries, including those of the Archean and Proterozoic, long defined by Global Standard Stratigraphic Ages (GSSA). Charts and detailed information on ratified GSSPs are available at the website http://www.stratigraphy.org. The URL to this chart is found below.

Numerical ages are subject to revision and do not define units in the Phanerozoic and the Ediacaran; only GSSPs do. For boundaries in the Phanerozoic without ratified GSSPs or without constrained numerical ages, an approximate numerical age (~) is provided.

Numerical ages for all systems except Lower Pleistocene, Permian, Triassic, Cretaceous and Precambrian are taken from 'A Geologic Time Scale 2012' by Gradstein et al. (2012); those for the Lower Pleistocene, Permian, Triassic and Cretaceous were provided by the relevant ICS subcommissions.

Coloring follows the Commission for the Geological Map of the World (http://www.ccgm.org)

CCGM CGMW

Chart drafted by K.M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard
(c) International Commission on Stratigraphy, February 2014

To cite: Cohen, K.M., Finney, S.C., Gibbard, P.L. & Fan, J.-X. (2013; updated) The ICS International Chronostratigraphic Chart. Episodes 36: 199-204.

ভূ-তাত্ত্বিক সময় সারণি

আবু রায়হান

সময়ের পরিক্রমায় পৃথিবীর বয়স আজ প্রায় ৪৬০কোটি বছর। ৪৬০কোটি বছরে কেটে গেছে কত না যুগ-মহাযুগ!
(Wikipedia মতে ৪৫৪ ± কোটি বছর)
তো,সেই ৪৬০কোটি বছরের সকল যুগ-মহাযুগ এবং তার সকল শ্রেণিবিভাগ নিয়ে মূলত এ লেখাটি যা ম্যাগাজিন পাঠে প্রাচীন পৃথিবীর আলোচনায় উল্লেখিত সময় ও যুগগুলো বুঝতে একটু সহায়ক হবে। মূলত টাইম স্কেলগুলোই তুলে ধরেছি, সাথে যুগগুলো নিয়ে একটু-আকটু বর্ণনা। আমি এখানে ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন স্ট্র্যাটিগ্রাফি (ICS) এর লেটেস্ট সময় সারণি(২০১৪)কে অনুসরণ করেছি। তো,চলুন শুরু করা যাক-
(ICS)আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে স্বীকৃত টাইম সিরিয়াল হলো-
SuperEon>Eon>Era>
Period>Epoch>Ages
এখানে,

Super Eon,Eon,Era,Period,Epoch,Ages শব্দগুলোকে যথাক্রমে
বৃহৎ মহাযুগ,মহাযুগ,Era,Period,Epoch,Ages হিসেবে ব্যবহার করেছি। (বাংলায় এ শব্দগুলোর প্রচুর সমার্থক শব্দ আছে ফলে অনুবাদকৃত অর্থ নিয়ে একটু বিতর্ক আছে তাই মহাযুগ বাদে বাকিগুলো ইংরেজিতেই রেখেছি)।
আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার স্বার্থে Epoch, Ages গুলোকে আলোচনার বাইর রেখেছি।
(ওসব সহ আরো বিস্তারিত জানতে সাথে প্রদত্ত চিত্র বা,লিঙ্কটি দেখতে পারেন।)
প্রাক-ক্যামব্রিয়ান বৃহৎ মহাযুগ(Pre-Cambrian Super Eon):
[৪৬০ থেকে ৫৪.৬কোটি বছর]
ব্যাপ্তিকাল:
৪৬০কোটি বছর আগে শুরু — ৫৪.৬ কোটি বছর আগে শেষ।
পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অতিবাহিত সময়কালকে ভূ-তাত্ত্বিক সময় সারণিতে প্রধানত দুটি মহাযুগে ভাগ করা হয় —
1.প্রাক – ক্যামব্রিয়ান বৃহৎ মহাযুগ(Pre-Cambrian Super Eon):-
পৃ্থিবী সৃষ্টির সাথে সাথে আজ থেকে প্রায় ৪৬০কোটি বছর আগে শুরু হয়েছিল এ বৃহৎ মহাযুগের
এবং ৫৪.৬কোটি বছর আগে এ মহাযুগটির মেয়াদ শেষ হয়েছিল। পৃথিবীর জন্য এটিই একমাত্র Super Eon বা বৃহৎ মহাযুগ। মানে পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো Super Eon নেই। তবে কিছু মহাযুগ(Eon) আছে।
2. ফ্যানেরোজোয়িক মহাযুগ(Phanerozoic Eon):-
প্রাক-ক্যামব্রিয়ান বৃহৎ মহাযুগ শেষ হওয়ার সাথে সাথে এ মহাযুগ শুরু হয়। সে হিসেবে এর শুরু
৫৪.৬কোটি বছর পূর্ব থেকে এবং বর্তমানকালেও এর পরিধি বয়ে চলছে। অনেক ভূতত্ত্ববিদ এ মহাযুগটাকে Post-Cambrian Super Eon নামেও অভিহিত করেন।
এই প্রাক-ক্যামব্রিয়ান বৃহৎ মহাযুগকে আবার ৩ টি মহাযুগ(Eon)-এ বিভক্ত করা হয় —
হেডিয়ান মহাযুগ (Hadean Eon)
আর্কিয়ান মহাযুগ (Archean Eon)
প্রোটেরোজোয়িক মহাযুগ
(Proterozoic Eon) তারমানে এই তিন মহাযুগ মিলে প্রায় ৪০০কোটি বছর কেটে যায়।আবার এই তিন মহাযুগ আরেকটি বৃহৎ মহাযুগ প্রাক-ক্যামব্রিয়ান মহাযুগেরই অংশ।

হেডিয়ান মহাযুগ(Hadean Eon):
ব্যাপ্তিকাল: ৪৬০কোটি — ৪০০ কোটি বছর
'হেডিয়ান' পৃথিবীর ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন মহাযুগ। এই মহাযুগে পৃথিবীর পরিস্থিতি ছিল নরকের মতো উত্তপ্ত, তাই গ্রিক পাতালের দেবতা Hades এর নাম অনুসারে এই মহাযুগটির নামকরন করা হয়েছে। এই মহাযুগকে প্রাক-আর্কিয়ানও (Pre-Archean) বলা হয়।
হেডিয়ান মহাযুগের প্রধান প্রধান ঘটনাবলিগুলো হলো — পৃথিবীর সৃষ্টি, চাঁদের সৃষ্টি, প্রাচীনতম শিলার উৎপত্তি, পৃ্থিবীতে পানির আগমন, সুপ্রাচীন জীবনের অপ্রত্যক্ষ সালোকসংশ্লেষণের প্রমান (উদাহরনস্বরূপ – কেরোজেন) প্রভৃতি।
II)আর্কিয়ান মহাযুগ:
ব্যাপ্তিকাল:৪০০কোটি — ২৫০কোটি বছর
হেডিয়ান মহাযুগের পরই শুরু হয় আর্কিয়ান মহাযুগ।
আর্কিয়ান মহাযুগকে আবার ৪টি Era তে বিভক্ত করা হয় —
1.ইয়ো-আর্কিয়ান Era(Eoarchean)
2.প্যালিও-আর্কিয়ান Era (Paleoarchean)
3.মেসো-আর্কিয়ান Era
(Mesoarchean)
4.নিও-আর্কিয়ান Era (Neoarchean)
প্রাক– ক্যামব্রিয়ান বৃহৎ মহাযুগের দ্বিতীয় মহাযুগটি হলো আর্কিয়ান মহাযুগ। আর্কিয়ান নামটি প্রাচীন গ্রিক শব্দ ‘Arkhe’ থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো — শুরু বা উৎপত্তি (Beginning ; Origin)। ১৮৭২ সালে আর্কিয়ান শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়, সেসময় এটিই ছিল সবচেয়ে প্রাচীন ভূ-তাত্ত্বিক মহাযুগ।
ইয়ো-আর্কিয়ান Era:
ব্যাপ্তিকাল:
৪০০কোটি — ৩৬০ কোটি বছর
এই Era এর প্রধান প্রধান ঘটনাবলিগুলো হলো — সাধারন এককোষী জীবনের আবির্ভাব (ব্যাকটেরিয়া ও আর্কেইয়া) ; সম্ভাব্য প্রাচীনতম অণু জীবাশ্মের উদ্ভব ;প্রথম স্ব-প্রতিলেপনকারী RNA অণুর আবির্ভাব, অ্যান্টার্কটিকার নেপিয়ার পর্বতের গঠন প্রভৃতি।
প্যালিও- আর্কিয়ান Era:
ব্যাপ্তিকাল:
৩৬০কোটি — ৩২০কোটি

এই Era এর প্রধান প্রধান ঘটনাবলিগুলো হলো — প্রথম অক্সিজেন উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়ার উদ্ভব ; প্রাচীনতম অণু জীবাশ্মের উদ্ভব ;

মেসো-আর্কিয়ান Era:

ব্যাপ্তিকাল:৩২০কোটি — ২৮০ কোটি বছর

নিও-আর্কিয়ান Era:

ব্যাপ্তিকাল: ২৮০— ২৫০ কোটি বছর

III)প্রোটেরোজোয়িক মহাযুগ:

ব্যাপ্তিকাল: ২৫০কোটি — ৫৪.১ কোটি বছর

প্রাক- ক্যামব্রিয়ান বৃহৎ মহাযুগ (Super Eon) এর তৃতীয় তথা শেষ হলো প্রোটেরোজোয়িক মহাযুগ।

Proterozoic নামটি দুটি গ্রিক শব্দ 'Protero' = পূর্বের বা প্রাক্তন (Earlier ; Former) এবং 'Zoic' = প্রাণী বা জীব (Animal ; Living Being) থেকে এসেছে।

প্রোটেরোজোয়িক মহাযুগকে ৩ টি Era তে বিভক্ত করা হয় —

1)প্যালিও প্রোটেরোজোয়িক (Paleo Proterozoic Era)

2) মেসো প্রোটেরোজোয়িক (Meso Proterozoic Era)

3) নিও প্রোটেরোজোয়িক (Neo Proterozoic Era)

1)প্যালিও প্রোটেরোজোয়িক Era:

ব্যাপ্তিকাল:

২৫০কোটি — ১৬০কোটি বছর

প্রোটেরোজোয়িক মহাযুগের প্রাচীনতম ভূ-তাত্ত্বিক সময়কালকে বোঝাতে এখানে 'Paleo' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

প্যালিও প্রোটেরোজোয়িক Era কে আবার ৪ টি Period-এ বিভক্ত করা হয়–

a) সিডেরিয়ান (Siderian Period)

b) রিয়াসিয়ান (Rhyacian Period)

c) ওরোসিয়ান (Orosian Period)

d) স্ট্যাথেরিয়ান (Statherian Period)

সিডেরিয়ান Period:

ব্যাপ্তিকাল:

২৫০কোটি — ২৩০কোটি বছর

এই পিরিয়ডের প্রধান প্রধান ঘটনাবলিগুলো হলো — পৃথিবীতে অক্সিজেন বিপর্যয় ; স্তরীয় লোহার গঠন ; অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে স্লিয়াফোর্ড পর্বত গঠন ; গাউলার ক্রেটন(Craton)-এর গঠন প্রভৃতি।

b)রিয়াসিয়ান Period :

ব্যাপ্তিকাল:২৩০কোটি — ২০৫কোটি বছর

এই যুগের প্রধান প্রধান ঘটনাবলিগুলো হলো — বুশভেল্ড আগ্নেয় কমপ্লেক্স গঠন ; হুরোনিয়ান হিমযুগ (সবচেয়ে প্রাচীন ও সবচেয়ে দীর্ঘ হিমযুগ) প্রভৃতি।

c)ওরোসিয়ান Period:

ব্যাপ্তিকাল:

২০৫কোটি — ১৮০ কোটি বছর

এই Period এর প্রধান প্রধান ঘটনাবলিগুলো হলো — অক্সিজেন প্রধান বায়ুমন্ডল ; ভ্রেডেফোর্ট ও সাডবারি বেসিন গ্রহাণুপাত ; উঃ আমেরিকায় পেনোকিয়ান এবং ট্রান্স – হাডসনিয়ান পর্বত গঠন প্রভৃতি

d)স্ট্যাথেরিয়ান Period:

ব্যাপ্তিকাল:

১৮০কোটি — ১৬০কোটি বছর

2)মেসো প্রোটেরোজোয়িক Era:

ব্যাপ্তিকাল: ১৬০কোটি —

১০০কোটি বছর

মেসো-প্রোটেরোজোয়িক Era আবার ৩ টি Period-এ বিভক্ত করা হয়েছে—

ক্যালিম্মাইয়ান (Calymmaian Period)

একটাসিয়ান (Ectasian Period):

স্টেনিয়ান(Stenian Period)

এটি প্রোটেরোজোয়িক মহাযুগের দ্বিতীয় Era।

Meso Proterozoic নামটি দুটি গ্রিক শব্দ 'Meso' = মধ্য (Middle) এবং 'Proterozoic' = পূর্বের জীব (Earlier/Former Living Being) থেকে এসেছে। প্রোটেরোজোয়িক মহাযুগের মাঝামাঝি ভূ-তাত্ত্বিক সময়কালকে বোঝাতে এখানে Meso শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

a)ক্যালিম্মাইয়ান Period:

ব্যাপ্তিকাল: ১৬০কোটি বছর —

১৪০কোটি বছর

b.একটাসিয়ান Period :

ব্যাপ্তিকাল:

১৪০কোটি —১২০কোটি বছর

c.স্টেনিয়ান Period:

ব্যাপ্তিকাল:

৯২০কোটি — ৯০০কোটি বছর
3.নিও-প্রোটেরোজোয়িক Era:
ব্যাপ্তিকাল:
৯০০কোটি — ৫৪.৯কোটি বছর
নিও প্রোটেরোজোয়িক যুগ-
নিও প্রোটেরোজোয়িক Eraকে আবার ৩ টি Period-এ বিভক্ত করা যায় —
টোনিয়ান যুগ(Tonian Period)
ক্রায়োজেনিয়ান যুগ (Cryogenian Period):
এডিয়াকারান যুগ (Ediacaran Period)
টোনিয়ান Period:
ব্যাপ্তিকাল:
৯০০কোটি — ৮৫কোটি বছর
b)ক্রায়োজেনিয়ান Period:
ব্যাপ্তিকাল:
৮৫কোটি — ৬৩.৫কোটি বছর
এডিয়াকারান Period:
ব্যাপ্তিকাল:
৬৩.৫কোটি — ৫৪.৯কোটি বছর

প্রাক-ক্যামব্রিয়ান বৃহৎ মহাযুগের পরিসমাপ্তি

ফ্যানেরোজোয়িক মহাযুগ:
ব্যাপ্তিকাল:
শুরু:৫৪.৯
শেষ:বর্তমানেও চলমান
প্রাক-ক্যামব্রিয়ান পরবর্তী ভূ-তাত্ত্বিক সময়কালটি ফ্যানেরোজোয়িক মহাযুগ নামে পরিচিত।
Phanerozoic নামটি দুটি গ্রিক শব্দ ‘Phaneros’ = দৃশ্যমান (Visible) এবং ‘Zoic’ = জীবন (Life) থেকে এসেছে। এই মহাযুগেই জীবপ্রজাতির সবচেয়ে বেশি উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে বলে, এই মহাযুগের এইরূপ নামকরন করা হয়েছে।
ফ্যানেরোজোয়িক মহাযুগটিকে ৩ টি Era তে বিভক্ত করা হয় —
I) প্যালিওজোয়িক (Paleozoic Era)
II) মেসোজোয়িক (Mesozoic Era)
III) সেনোজোয়িক (Cenozoic Era)
প্যালিওজোয়িক Era:
ব্যাপ্তিকাল:
৫৪.৯ কোটি — ২৫.১৯০২কোটি বছর
প্যালিওজোয়িক
Era আবার ৬ টি Period-এ বিভক্ত করা হয় —
1) ক্যামব্রিয়ান(Cambrian Period)
2) অর্ডোভিসিয়ান (Ordovician Period)
3) সিলুরিয়া (Silurian Period)
4) ডেভোনিয়ান (Devonian Period)
5) কার্বনিফেরাস (Carboniferous Period)
6) পার্মিয়ান(Permian Period)
এটি ফ্যানেরোজোয়িক মহাযুগের সবচেয়ে প্রাচীন Era।
Paleozoic নামটি দুটি গ্রিক শব্দ ‘Palaios’ = প্রাচীন (Old) এবং ‘Zoic’ = জীবন (Life) থেকে এসেছে। অর্থাৎ Paleozoic শব্দটির অর্থ হলো — প্রাচীন জীবন (Ancient Life)।
1.ক্যামব্রিয়ান Period:
ব্যাপ্তিকাল:
৫৪.৯কোটি — ৪৮.৫৪ কোটি বছর
এটি প্যালিওজোয়িক Era এর সবচেয়ে প্রাচীন Period।
ক্যামব্রিয়ান Period এর প্রধান প্রধান ঘটনাবলিগুলো হলো — প্রথম জীব পর্ব (Phylum)-এর উৎপত্তি; প্রথম মেরুদন্ডী প্রাণীর উদ্ভব ; গন্ডোয়ানা নামক বৃহৎ মহাদেশের (Super Continent) উদ্ভব ; অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে পিটারম্যান পর্বত গঠন সমাপ্ত ; অ্যান্টার্কটিকায় রস পর্বত গঠন ; বায়ুমন্ডলীয় কার্বন ডাই অক্সাইের মাত্রা ৬০০০ ppmv (বর্তমানের ৩৮৫ ppmv থেকে ২০-৩৫ গুন বেশি) প্রভৃতি।
2. অর্ডোভিসিয়ান Period:
ব্যাপ্তিকাল:৪৮.৫৪কোটি — ৪৪.৩৮ কোটি বছর
এটি প্যালিওজোয়িক Era এর দ্বিতীয় Period।
Ordovician নামটি ‘Ordovice’ নামক সেলটিক উপজাতির নাম থেকে এসেছে।
অর্ডোভিসিয়ান Period এর প্রধান প্রধান ঘটনাবলিগুলো হলো — বিভিন্ন প্রকার অমেরুদণ্ডী প্রাণীর বৈচিত্র্যময় উদ্ভব ; প্রাথমিক প্রবাল, ট্রাইলোবাইট, ব্রায়োজোয়া প্রভৃতি জীবের প্রাধান্য ; কনোডোন্ট প্রাণীর উদ্ভব ; স্থলভাগে প্রথম সবুজ উদ্ভিদ ও ফাংগির উদ্ভব ; এই Period এর শেষদিকে হিমযুগের সূচনা প্রভৃতি।
3.সিলুরিয়ান Period:
ব্যাপ্তিকাল:44.38 কোটি — 41.92 কোটি বছর
এটি প্যালিওজোয়িক Era এর তৃতীয় Period।

Silurian নামটি ‘Silures’ নামক সেলটিক উপজাতির নাম থেকে এসেছে।

সিলুরিয়ান Period-এর প্রধান প্রধান ঘটনাবলিগুলো হলো — প্রথম কলাগঠিত উদ্ভিদ (Vascular Plant)-এর উদ্ভব ; স্থলভাগে প্রথম Millipedas ও Arthropleurids-এর উদ্ভব ; প্রথম চোয়াল যুক্ত মাছের উদ্ভব ; সমুদ্র-বিছার সর্বোচ্চ আকৃতি লাভ ; ট্রালোবাইট ও মোলাস জাতীয় প্রাণীর বৈচিত্র্য বৃদ্ধি ; ক্যালিডোনিয়ান পর্বত গঠন ; স্ক্যান্ডিনেভীয়ান পর্বত সৃষ্টি ; অ্যাকাডিয়ান পর্বত গঠন ; ট্যাকোনিক ও লাচলান পর্বত গঠন সমাপ্ত প্রভৃতি।

4.ডেভোনিয়ান Period:

ব্যাপ্তিকাল:

41.92কোটি — 35.89 কোটি বছর

এটি প্যালিওজোয়িক Era এর চতুর্থ Period।

Devonian নামটি ইংল্যান্ডের ডেভোন কাউন্টির নাম থেকে এসেছে। ইংল্যান্ডের ডেভোন কাউন্টিতেই সর্বপ্রথম এই Period এর শিলা অধ্যয়ন করা হয় বলে, এইরূপ নামকরন করা হয়েছে। এই Periodকে ‘Age Of Fish’ ও বলা হয়।

ডেভোনিয়ান Period এর প্রধান প্রধান ঘটনাবলিগুলো হলো — প্রথম Clubmosses, Horsetails ও ফার্নের উদ্ভব ; প্রথম বীজযুক্ত উদ্ভিদের উদ্ভব ; প্রথম বৃক্ষ ও পতঙ্গের উদ্ভব ; সমুদ্রে চোয়ালধারী মাছেদের রাজত্ব ; প্রথম উভচর প্রজাতি এখনও জলজ প্রজাতি রূপে রয়েছে ; আফ্রিকায় অ্যাকাডিয়ান পর্বত গঠন ; ভারিসকান ও টুহুয়া পর্বত গঠন প্রভৃতি।

5.কার্বনিফেরাস Period :

ব্যাপ্তিকাল:35.89কোটি —

29.89কোটি বছর

এটি প্যালিওজোয়িক Era এর পঞ্চম Period।

Carboniferous নামটি দুটি লাতিন শব্দ ‘Carbo’ = কয়লা (Coal) এবং ‘Fero’ = আমি বহনকারী (I Carry / I Bear) থেকে এসেছে। অর্থাৎ Carboniferous = Coal-Bearing বা কয়লা বহনকারী।

এই Period কে “Age Of Coal” ও বলা হয়।

কার্বনিফেরাস Period এর প্রধান প্রধান ঘটনাবলিগুলো হলো — ডানাযুক্ত পতঙ্গের দ্রুত উত্থান ; উভচর প্রাণীর উদ্ভব ও বিকাশ ; প্রথম সরীসৃপ ও কয়লা-অরণ্যের উদ্ভব ; বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের মাত্রা সর্বকালীন ভাবে সর্বোচ্চ ; সমুদ্রে প্রবাল, Bivalves, Goniatites প্রভৃতির প্রাচুর্য্য ; ইউরেশিয়াতে ইউরাল পর্বত গঠন ; ইউরোপ ও উঃ আমেরিকায় ভারিসকান পর্বত গঠন ; প্রথম স্থলজ মেরুদণ্ডী প্রানীর উদ্ভব ; সমুদ্রে প্রাচীন হাঙরের প্রাধান্য ; পূর্ব গন্ডোয়ানাতে হিমায়ন শুরু ; নিউজিল্যান্ডে টুহুয়া পর্বত গঠন সমাপ্ত প্রভৃতি।

6.পার্মিয়ান Period:

ব্যাপ্তিকাল:

29.89কোটি — 25.217কোটি বছর

- এটি প্যালিওজোয়িক Era এর ষষ্ঠ তথা শেষ Period । পার্মিয়ান Period এর প্রধান প্রধান ঘটনাবলিগুলো হলো— স্থলভাগগুলো মিলিত হয়ে প্যানজিয়া নামক বৃহৎ মহাদেশ (Super Continent) গঠন ; অ্যাপলাশিয়ান পর্বত গঠন ; পার্মো – কার্বনিফেরাস হিমযুগের সমাপ্তি ; প্রথম প্রকৃত মসের উদ্ভব ; গুবরে পোকা ও মাছির বিবর্তন ; ট্রায়াসিক বিলুপ্তি পর্ব (পৃথিবীর ৯৫% জীবের বিনাশ) ; ইউরেশিয়াতে ইউরাল পর্বত গঠন সমাপ্ত ; উঃ আমেরিকাতে কোয়াচিতা ও ইননুইশিয়ান পর্বত গঠন ; এশিয়াতে আলতাই পর্বত গঠন প্রভৃতি।

II)মেসোজোয়িক যুগ:

ব্যাপ্তিকাল:

২৫.১৯০২কোটি — ৬.৬কোটি বছর

মেসোজোয়িক Era আবার ৩টি Period-এ বিভক্ত —

ট্রায়াসিক Period

জুরাসিক Period

ক্রিটাশিয়াস Period

-এটি ফ্যানেরোজোয়িক মহাযুগের দ্বিতীয় Era।

Mesozoic নামটি দুটি গ্রিক শব্দ ‘Meso’ = মধ্যবর্তী (Middle ; Between) এবং ‘Zoic’ = জীবন(Life) থেকে এসেছে। অর্থাৎ Mesozoic শব্দটির অর্থ হলো — মধ্যবর্তী জীবন (Middle Life)। মেসোজোয়িক Era ‘Age Of Reptiles’ বা ‘সরীসৃপের যুগ’ এবং ‘Age Of Conifers’ বা ‘সরলবর্গীয় মোচাকৃতি বৃক্ষের যুগ’ নামেও পরিচিত।

1.ট্রায়াসিক Period:

ব্যাপ্তিকাল:

২৫.১৯০২ কোটি —

২০.১৩ কোটি বছর

-এটি মেসোজোয়িক Era এর সবচেয়ে প্রাচীন Period।

Triassic নামটি জার্মান শব্দ ‘Trias’ = তিন অর্থাৎ তিনটি শিলাস্তর (পার্মিয়ান ও জুরাসিক মধ্যবর্তী তিনটি শিলাস্তর — Red

Beds, Limestone & Mud – Sandstone কে বোঝায় ; যা জার্মানি ও উঃ-পঃ ইউরোপ জুড়ে পাওয়া গেছে) থেকে এসেছে।

ট্রায়াসিক Period এর প্রধান প্রধান ঘটনাবলিগুলো হলো — স্থলে Archosaurs ও সমুদ্রে Ichthyosaurs, Nothosaurs এবং আকাশে Pterosaurs এর প্রাধান্য ; প্রথম স্তন্যপায়ী ও কুমির প্রজাতির উদ্ভব ; স্থলভাগে Dicroidium Flora এর প্রাচুর্য্য ; আধুনিক প্রবাল এবং Teleost মাছের আবির্ভাব ; ডাইনোসরের উদ্ভব) ; দঃ আমেরিকায় আন্দিজ পর্বত গঠন ;

2.জুরাসিক Period:

ব্যাপ্তিকাল:

20.13কোটি—14.5 কোটি বছর আগে

এটি মেসোজোয়িক Era এর দ্বিতীয় Period।

Jurassic নামটি ইউরোপের জুরা পর্বতের নাম থেকে (Jura শব্দটি সেলটিক শব্দ Jor > লাতিন শব্দ Juria = অরণ্য বা Forest ; Jura Mountains = Forest Mountains) এসেছে।

জুরাসিক Period এর প্রধান প্রধান ঘটনাবলিগুলো হলো — জিমনোস্পার্ম ও ফার্নের প্রাচুর্য্য, স্থলভাগে ডাইনোসরের বিকাশ (Sauropods, Carnosaurs প্রভৃতি); স্তন্যপায়ীদের বিস্তার(যদিও আকৃতিতে ছোটো); প্রথম পাখি ও গিরিগিটির উদ্ভব; সমুদ্রে Sea Urchin, Starfish, Sponge প্রভৃতির প্রাচুর্য্য ; প্যানজিয়া (অতি মহাদেশ) ভেঙে গন্ডোয়ানা ও লরেশিয়ার উদ্ভব ; সমুদ্রতলের উত্থান প্রভৃতি।

3.ক্রিটাশিয়াস Period:

ব্যাপ্তিকাল:

14.5কোটি — 6.6 কোটি বছর

এটি মেসোজোয়িক Era এর তৃতীয় তথা শেষ Period।

Cretaceous নামটি লাতিন শব্দ 'Creta' = চক (Chalk) থেকে এসেছে। এই Period-এ পৃথিবীর নানা স্থানে চক শিলার উৎপত্তি হয় বলে এই Period এর এইরূপ নামকরন করা হয়েছে।

ক্রিটাশিয়াস Period এর প্রধান প্রধান ঘটনাবলিগুলো হলো — অারও আধুনিক Teleost মাছের আবির্ভাব ; সপুষ্পক উদ্ভিদের দ্রুত বিস্তার ; নানারকম পতঙ্গের উদ্ভব ; Ammonnoids, Belemnoids, Sea Urchins, Sponge প্রভৃতির প্রাচুর্য্য ; প্রথমার্ধে নানা প্রজাতির ডাইনোসরের উদ্ভব ও বিকাশ (Tyrannosaurs, Titanosaurs প্রভৃতি) ; শেষার্ধে ডাইনোসরের বিলুপ্তি ; সমুদ্রে আধুনিক হাঙর ও কুমিরের আবির্ভাব ; গন্ডোয়ানার ভাঙন ; বায়ুমন্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা ছিল বর্তমান কালের মতোই ; নদীগুলো দ্বারা ব-দ্বীপ সৃষ্টি ; পর্ণমোচী অরণ্যের আয়তন বৃদ্ধি প্রভৃতি।

সেনোজোয়িক Era:

ব্যাপ্তিকাল:

৬.৬কোটি — বর্তমান সময়

সেনোজোয়িক Era আবার ৩ টি Period-এ বিভক্ত —

প্যালিওজিন (Paleogene Period)

নিওজিন (Neogene Period)

কোয়াটারনারী (Quaternary Period)

এটি ফ্যানেরোজোয়িক মহাযুগের তৃতীয় তথা শেষ Era।

Cenozoic নামটি দুটি গ্রিক শব্দ 'Ceno'/'Kaino' = নতুন (New) এবং 'Zoic' = জীবন(Life) থেকে এসেছে। অর্থাৎ Cenozoic শব্দটির অর্থ হলো — নতুন জীবন (New Life)। সেনোজোয়িক Era 'Age Of Mammals এবং 'Age Of Birds' নামেও পরিচিত।

1.প্যালিওজিন Period:

ব্যাপ্তিকাল:

৬.৬কোটি — ২.৩০৩কোটি বছর

এটি সেনোজোয়িক Era এর সবচেয়ে প্রাচীন Period। Paleogene নামটি দুটি গ্রিক শব্দ 'Paleo' = পুরোনো (Old) এবং ' Gene' = জীবন (Life) থেকে এসেছে। এই Period টি নিম্ন টার্সিয়ারী Period (Lower Tertiary Period) নামেও পরিচিত।

2. নিওজিন Period:

ব্যাপ্তিকাল:২.৩০৩ কোটি — ২৫.৮ লক্ষ বছর

এটি সেনোজোয়িক Era এর দ্বিতীয় Period। Neogene নামটি দুটি গ্রিক শব্দ 'Neo' = নতুন/তরুন (New ; Youth) এবং 'Gene' = জীবন (Life) থেকে এসেছে। এই Period টি ঊর্ধ্ব টার্সিয়ারী যুগ (Upper Tertiary Period) নামেও পরিচিত।

3.কোয়াটার্নারি Period:

ব্যাপ্তিকাল: ২৫.৮লক্ষ বছর — বর্তমান সময়

এটি সেনোজোয়িক Era এর তৃতীয় তথা শেষ Period।

Quaternary নামটি লাতিন শব্দ 'Quaternarius' = চার (Containing Of Four) থেকে এসেছে। ১৮২৯ সালে, জুলস ডেজনোয়ার্স, ফ্রান্সের সীন অববাহিকার পলল সঞ্চয়(যা ছিল টার্সিয়ারী যুগের চেয়ে নবীন) দেখে Quaternary নামটি ব্যবহার করেন।

শেষ পিরিয়ড বিধায় এর অন্যান্য নিম্নতর সময় বিভাজনও তুলে ধরা হলো-

কোয়াটার্নারি Period কে দুইটি Epoch-এ ভাগ করা হয়েছে-

1.প্লায়েস্টোসিন Epoch

2.হলোসিন Epoch

a)প্লায়েস্টোসিন (Pleistocene Epoch):

ব্যাপ্তিকাল:২৫লক্ষ — ১১.৭হাজার বছর

b)হলোসিন(Holocene Epoch):

ব্যাপ্তিকাল: ১১.৭হাজার — বর্তমান

হলোসিন Epoch রয়েছে তিনটি ages:

1.Greenlandian(আদি হলোসিন- গ্রিনল্যান্ডিয়ান):

ব্যাপ্তিকাল:১১.৭হাজার — ৮.২হাজার

2.Northgrippian(মধ্য হলোসিন - -নর্তগ্রিপ্পিয়ান):

ব্যাপ্তিকাল:

৮.২হাজার — ৪.২হাজার

3.Meghalayan(শেষ হলোসিন-মেঘালয়ান):

ব্যাপ্তিকাল:

৪.২হাজার — বর্তমান

হলোসিন Epoch এর প্রধান ঘটনাবলিগুলো হলো — কোয়াটার্নারী হিমযুগের পশ্চাদ অপসরণ ; বর্তমান আন্তঃহিম সময়কালের সূচনা ; মানবসভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ ; সাভানা থেকে সাহারা মরুভূমির সৃষ্টি ; কৃষিকাজ প্রণালীর উদ্ভব ; শিল্প বিপ্লব ; মানব ইতিহাসে প্রস্তরযুগ থেকে ব্রোঞ্জ ও লৌহযুগের ক্রমবিবর্তন ; বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধি (২৮০ ppmv থেকে ৪০০ ppmv) প্রভৃতি।

কারো কারো মতে Anthropocene নামে একটি তৃতীয় Epoch আছে যা ১৮ শতাব্দীতে শুরু হয়।

তাহলে কি দাঁড়াল?

আমরা -

ফ্যানেরোজোয়িক মহাযুগের(Eon) > সেনোজোয়িক Era তে >কোয়াটার্নারি Period-এর >হলোসিন Epoch-এ>

মেঘালয়ান Age-এ বাস করছি।

এছাড়াও এসবের মাঝেই আছে প্রস্তর যুগ>ব্রোঞ্জ যুগ>লৌহ যুগ> >ধ্রুপদী(Classical) যুগ(800BC -500AD),ধ্রুপদী পরবর্তী যুগ(500AD-1500AD)/

মধ্য যুগ,বর্তমান যুগ(১৫০০-বর্তমান)

তথ্যসূত্র
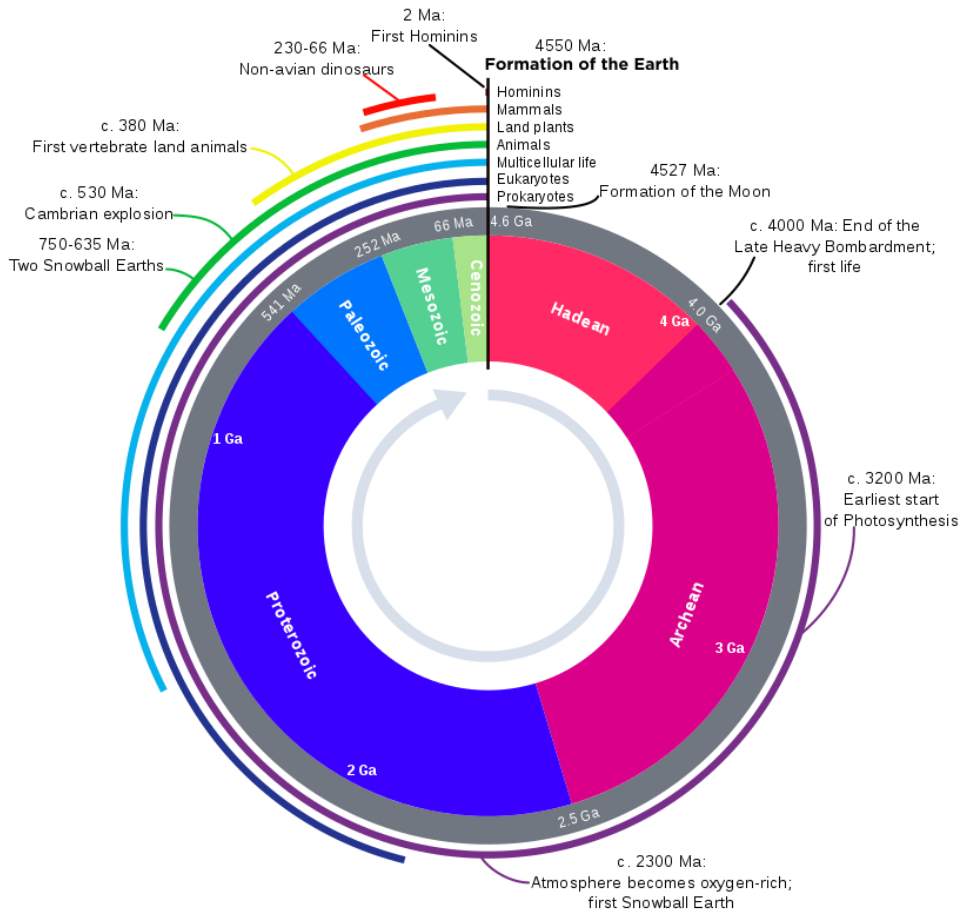
মানব ইতিহাস

শাওন গুপ্ত, প্রজেশ দত্ত

আপনার পরিচয় কি? আপনার নাম, কর্মজীবন, নিজেকে নিয়ে দু-চার কথা। শেষ। কেউ যদি শোনে বংশ পরিচয় কী? আপনার নাম, গোত্র তো আছেই, সাথে আছে আপনার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের পরিচয়।

মানুষের পরিচয় কী? মানুষ কোন প্রাণী থেকে এসেছে? অনেক লম্বা আর জটিল ইতিহাস আমাদের। মানুষের শ্রেণিবিন্যাসের দিকে নজর দিলে আমরা আমদের প্রাথমিক পরিচয় জানতে পারব। বংশ পরিচয় না। আমরা স্যাপিয়েন্স। আমাদের গণ "হোমো"। এই হোমো গণের অন্তর্ভুক্ত আরও অনেক প্রাণী রয়েছে। তারা আমাদের মামাতো-চাচাতো ভাই। আমাদের ফ্যামিলি হোমিনোইডি, এর অন্তর্ভুক্ত বাকি সদস্যরা আমাদের পিতামহের সৎভাইয়ের বংশধর। এভাবে আমরা পৌঁছাব আমাদের বর্গে। প্রাইমেট। এখান থেকেই শুরু হবে আমাদের ইতিহাস। প্রায় পঁচাশি-পঁচিশ মিলিয়ন বছর পূর্বে বিবর্তনের ধারায় পৃথিবীর বুকে পা দেয় প্রথম প্রাইমেট প্রাণী। তারপর?
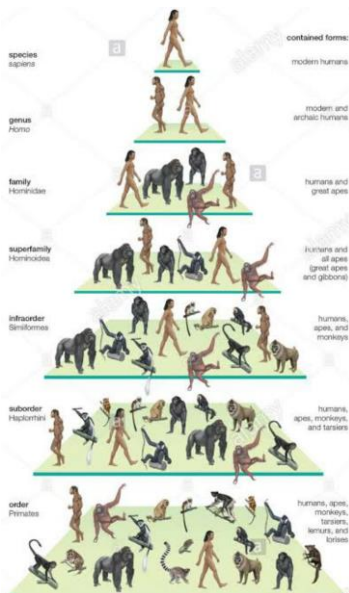
পঁচিশ মিলিয়ন বছর পূর্বে-

ক্যাটারাইনা দুটি ফ্যামিলিতে বিভক্ত হয়েছিল। যার একটি হলো পুরাতন পৃথিবীর বানর অর্থাৎ সারকোপ্যাথেকোইডি ফ্যামিলির অন্তর্ভুক্ত বানরেরা, আর অন্যটি হলো এইপস অর্থাৎ হোমিনোইডি ফ্যামিলির অন্তর্ভুক্ত যারা। প্রোকনসাল (Proconsul) হলো ক্যাটারাইনা ফ্যামিলির একটা বর্গ যাদের মাঝে Old world monkeys আর Apes দুই ফ্যামিলিরই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন Ape দের মতোই এদের লেজ ছিল না, কনুই ছিল Ape দের মতোই, বডি সাইজের তুলনায় মস্তিষ্ক বড় ছিল আবার Old world monkeys দের মতোই এদের সামনের পা গুলো ছোট ছিল, দাঁত চিকন চিকন ছিল। এই সময় থেকেই হোমিনোইডি ফ্যামিলির উত্থান ঘটে।

আঠারো মিলিয়ন বছর পূর্বে-

হোমিনোইডি বিভক্ত হয়ে যায় গিবনদের পূর্বপুরুষদের থেকে। গিবেনদের সাধারণত ছোট সাইজের এইপ হিসেবে ধরা হয় আর হোমিনোইডির এইপদের বড় সাইজের এইপ হিসেবে।

ষোলো মিলিয়ন বছর পূর্বে-

হোমিনোইডিদের থেকে বিভক্ত হয়ে যায় ওরাংওটাংয়ের পূর্বপুরুষেরা। Pierolapithecus catalaunicus কে মানুষ ও গ্রেট এইপদের কমন এন্সেস্টর হিসেবে ধরা হয়। এদের ফসিল যে কোনো কমন এন্সেস্টরের ফসিলের থেকে বেশি ভালো ভাবে বুঝতে সাহায্য করেছে যে আমরা সবাই একে অপরের সাথে রিলেটেড। গাছে চড়া ও গাছে গাছে ঘোরাঘুরির জন্য মর্ডান এইপদের মতোই এদের ফ্লেক্সিবল কব্জি ছিল, প্রশশস্ত সমতল পাঁজর জোড়া ছিল, শক্তপোক্ত কশেরুকা ছিল।

বারো মিলিয়ন বছর পূর্বে-

Danuvius guggenmosi দের দেখা যায়। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এরা যেমন অন্যান্য এইপদের মতো ক্লাইম্বিং (গাছে চড়া) ও করতে পারত আবার এরা বাইপেডালও ছিল অর্থাৎ দুপায়ে ভর দিয়ে হাঁটতেও পারত। এদের লম্বা হাড় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে এদের অ্যানাটোমিক্যাল স্ট্রাকচার এবং লোকোমোশন। এদেরকে লাস্ট কমন এন্সেস্টর হিসেবে ধরা হয় যাদের লোকোমোশনে মানুষ এবং গ্রেট এইপদের সিমিলারিটি পরিলক্ষিত হয়।

দশ-আট মিলিয়ন বছর পূর্বে-

প্রথম গরিলার প্রত্যক্ষ পূর্ব-পুরুষের আবির্ভাব ঘটে দশ-এগারো মিলিয়ন বছর আগে। Homininae থেকে দুইটা ধারা তৈরি হয়। এক ধারায় আসে গরিলা, অন্য ধরায় আসে শিম্পাঞ্জি, মানুষ। প্রায় ছয় মিলিয়ন বছর পূর্বে শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের বিবর্তনীয় ধারা আলাদা হয়ে যায়। Hominini থেকে স্যাহেল্যান্থ্রোপাস এবং শিম্পাঞ্জি দুইটা শাখার উৎপত্তি ঘটে।

আট-ছয় মিলিয়ন বছর আগে মানুষ ও শিম্পাঞ্জির লাস্ট কমন এন্সেস্টররা বাস করত। এদের মাঝে থাকা স্বরযন্ত্র, গলবিল ও লাঙ-এর সাহায্যে স্বর তৈরির বৈশিষ্ট্যটি বর্তমান মানুষ ও শিম্পাঞ্জির মাঝে একটি রিলেশন তৈরি করে। Sahelanthropus tchadensis একটি উল্লেখযোগ্য প্রজাতি যার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

সাড়ে পাঁচ মিলিয়ন বছর পূর্বে-আর্ডিপিথেকাস, প্রাথমিক প্রোটো হিউম্যান হিসেবে পরিচিত। স্যাহেল্যান্থ্রোপাস থেকে আলাদা হয় আর্ডিপিথেকাস এবং অস্ট্রালোপিথেকাস অ্যানামেনসিস।
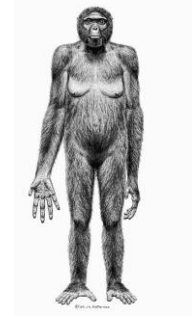
চার মিলিয়ন বছর পূর্বে-

অস্ট্রেলোপিথেসিনস পৃথিবীর বুকে পা রাখে। এদের মস্তিষ্কের আয়তন ৪০০-৫০০ সিসি। আমরা আগেই দেখেছি মানুষের এক পূর্বপুরুষ দুপায়ে চলতে শিখেছিল, কিন্তু প্রথম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করে অস্ট্রেলোপিথেসিনস। এরাই মানুষের প্রথম প্রজাতি যারা আফ্রিকার তৃণাবৃত, শ্যামল এলাকায় বাস শুরু করে।
এরপর ইতিহাসের পাতায় আসে অস্ট্রালোপিথেকাস অ্যাফারেন্সিস। এরা পূর্বে উল্লিখিত অ্যানামেনসিস থেকে বিবর্তিত হয়েছে।

দুই মিলিয়ন সাত লক্ষ বছর পূর্বে-

অস্ট্রেলোপিথেসিনস ট্রাইবের তালিকায় এসময় নাম লেখায় নতুন গণ "প্যারান্থ্রপাস"। এরা ২.৭-০৬ মিলিয়ন বছর সময়কালে বসবাস করত। স্যাহেলান্থ্রোপাস থেকে আর্ডিপিথেকাসের পর প্যারান্থ্রপাস বিবর্তিত হয়ে আসে। এরা জঙ্গলে, তৃণভূমিতে থাকত এবং সেখান থেকে খাদ্য সংগ্রহ করত। তাই এদের চোয়াল তেমনই মজবুত ছিল; গাছপালা, তৃণ, মূল খাদ্য হিসেবে গ্রহণের জন্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অস্ট্রেলোপিথেকাস আর প্যারান্থ্রপাসকে সিনোনিমাস মনে করা হয়।

আড়াই মিলিয়ন বছর পূর্বে-

হোমো হ্যাবিলিসের আগমনের সময় এটা। Australopithecus afarensis আর Homo Erectus দের মধ্যবর্তী প্রজাতি হিসেবে হোমো হ্যাবিলিসকে ধরা হয়। মূলত অস্ট্রালোপিথেকাস অ্যাফারেন্সিস থেকে অস্ট্রালোপিথেকাস অাফ্রিকানাসের আবির্ভাব ঘটে।

অস্ট্রালোপিথেকাস আফ্রিকানাস ছিলো হাবিলিসের পূর্বপুরুষ। এদের মুখ বাইরের থেকে খুব প্রসারিত ছিল না হোমিনিড গোত্রের প্রাথমিক সদস্যদের মতো। এদের মস্তিষ্কের আয়তন ৬০০ সিসি। হোমো গণের মধ্যে এরাই প্রথম ব্যবহার উপযোগী পাথুরে হাতিয়ার, সামগ্রী তৈরি করে।

একই সময়ে কিছু হোমিনিড সদস্য মাংসাশী হয়ে ওঠে অর্থাৎ তাদের প্রধান খাদ্য হয়ে ওঠে মাংস নির্ভর। মাংস নির্ভর হওয়ার ফলে প্রাপ্ত অতিরিক্ত শক্তি তুলনামূলক বৃহত্তর মস্তিষ্কের বিবর্তনে ভূমিকা রেখেছিল।

দুই মিলিয়ন বছর পূর্বে-

হোমো হ্যাবিলিসের পাথুরে সামগ্রীর কথা জানলাম। ১.৫-২ মিলিয়ন বছর আগের সময়কালে আগমন ঘটে হোমো আর্গাস্টারের। তারা আরও উন্নত সামগ্রী ব্যবহার শুরু করে। তাদের ব্রেনের আয়তন ছিল প্রায় ৮৫০ সিসি।

হোমো হ্যাবিলিসরা যদিও অ্যানাটমি ও ফিজিওলজির দিক থেকে হোমো আর্গাস্টার ও আফ্রিকান হোমো ইরেক্টাসদের থেকে ভিন্ন ছিল কিন্তু এটা ধারণা করা হয় এরা হোমো ইরেক্টাসদের সাথে একই সময়ে এই পৃথিবীতে অস্তিত্বমান ছিল প্রায় হাফ মিলিয়ন বছর। এদের ১.৯ মিলিয়ন বছর আগের আবির্ভাবের সময় থেকেই এরা পূর্ব আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় বণ্টিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে এরা পুরো ইউরেশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল অনেকগুলো সাব-স্পিসিজ হিসেবে।
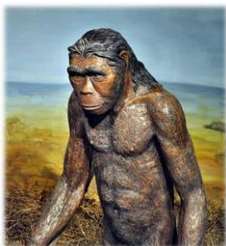
দেড় মিলিয়ন বছর পূর্বে-

এ সময় এশিয়া মহাদেশে বাস শুরু হয় হোমো ইরেক্টাসের। মানব ইতিহাসের প্রথম মাইগ্রেশন ছিল এটা, আফ্রিকার বাইরে হোমো গণের এক বড় অংশ বাস করা শুরু করে। এদের মস্তিষ্ক ছিল আরও বড়, প্রায় ১০০০ সিসি। হোমো ইরেক্টাসই সর্বপ্রথম আগুনের ব্যবহার শুরু করে ১.৬ মিলিয়ন বছর পূর্বে। হোমো ইরেক্টাস নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা ম্যাগাজিনের পরবর্তীতে রয়েছে।

৬ লক্ষ বছর পূর্বে-

এসময় হোমো হাইডেলবার্জেন্সিসের উত্থান ঘটে। তারা আফ্রিকা আর এশিয়ায় বসবাস করত। এদের ব্রেইন ক্যাপাসিটি আধুনিক মানুষের সমান ছিল, আয়তন প্রায় ১২২০ সিসি।
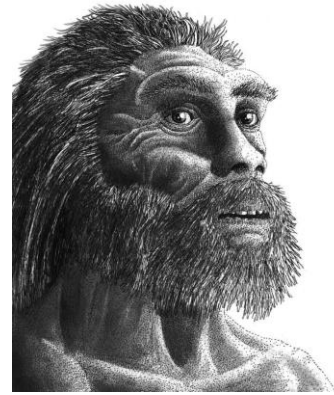
পাঁচ লক্ষ বছর পূর্বে-

সর্বপ্রথম মানুষ ঘর তৈরিরি শুরু করে, কুঁড়েঘর। চার লক্ষ বছর পূর্বে বর্শা তৈরিরি হয়। প্রাথমিক পর্যায়ের মানুষেরা শিকার শুরু করে বর্শা দিয়ে। তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার বছর আগের সার্ভাইভিং অবস্থায় তিনজন মানুষের পদচিহ্ন পাওয়া গেছে ইতালির ভলকানোর ঢালে। জটিল পাথুরে ব্লেড তৈরিরি হয় দুই লক্ষ আশি বছর আগে, তখন পাথর চূর্ণ করার কৌশলও জানত মানুষ।

দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার বছর পূর্বে-

আমরা হোমো স্যাপিয়েন্স, আমরা আধুনিক মানুষ। মানুষের উত্থানের ধারায় এজন্য আমরা আমাদের কাছাকাছি অন্যান্য

প্রজাতি, গণের মানুষকে "প্রোটো হিউম্যান" বা "প্রাথমিক পর্যায়ের মানুষ" বলে সম্বোধন করেছি।

আমাদের সাথে সাথে আমাদের অন্য এক প্রজাতি দীর্ঘদিন বসবাস করেছে।ছিল নিয়ান্ডারথাল। নিয়ান্ডারথালের আবির্ভাব ঘটে প্রায় দুই লক্ষ ত্রিশ বছর আগে। হাইডেলবারজেন্সিস বিকশিত হয়ে নিয়ান্ডারথাল এবং ডেনিসোভা উৎপন্ন হয়। তারা বাস করত ইউরোপ জুড়ে। নিয়ান্ডারথালদের বিলুপ্তি ঘটে মাত্র চল্লিশ হাজার বছর আগে। তাদের বিলুপ্তির পেছনে আমাদের, মানে হোমো স্যাপিয়েন্সদের, অবদান ছিল।

দুই লক্ষ বছর পূর্বে-

সবার শেষে মঞ্চে আবির্ভাব ঘটে হোমো স্যাপিয়েন্সস্যাের যারা এখনো রাজত্ব করছে পৃথিবীতে। নিজেদের নিয়ে কী বলব আর? হোমো স্যাপিয়েন্সস্যাদের মস্তিষ্কের গড় আয়তন ১৩০০ সিসি। তবে আমাদের ব্রেইনের আকার মানব ইতিহাসে সবচেয়ে বড় না। এমনকি বর্তমানের তুলনায় শুরুর দিকের হোমো স্যাপিয়েন্সস্যাদের অ্যাভারেজ ব্রেইন সাইজ বেশিই ছিল। যাইহোক, নিয়ান্ডারথালের গড় ব্রেইন সাইজ ছিল ১৪১০ সিসি (১২০০ সিসি-১৭৫০ সিসি)।

আমরা একই সময়ে হোমো গণের বিভিন্ন প্রজাতি ও উপপ্রজাতির সাথে বসবাস করেছি। যেমন: হোমো নিয়ান্ডারথাল, ডেনিসোভান, হোমো ফ্লোরেনসিস, এবং আমাদের প্রথম দিকের স্যাপিয়েন্স দের সাথে হোমো ইরেক্টাসদের শেষের দিকের মানুষগণও বসবাস করেছে। শুধু তাই নয় আমাদের প্রজাতি হোমো স্যাপিয়েন্সরা হোমো গণের অন্য প্রজাতিদের সাথে যেমন হোমো নিয়ান্ডারথাল, ডেনিসোভান দের সাথে যৌন সংসর্গেও লিপ্ত হয়েছিলাম। এর প্রমাণ হিসেবে আমরা আজও আমাদের ডিএনএ তে নিয়ান্ডারথালদের ডিএনএ এর অস্তিত্ব খুঁজে পাই।

হোমো নিয়ান্ডারথাল

রঞ্জু খান

নিয়ান্ডারথালঃ

এক নিঃসঙ্গ মানব প্রজাতির ইতিহাস।

পৃথিবীর প্রজাতির ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি লক্ষ লক্ষ প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে,বিভিন্ন স্টাডিতে দেখা গেছে, পৃথিবীর ইতিহাসের প্রায় ৯৯.৯% প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে, প্রায় ৭ জনের মধ্যে ১০ জন বিজ্ঞানী বা বায়োলজিস্ট এটি মনে করে থাকেন ১। এই পৃথিবীতে প্রায় ৫ টি বড় ধরনের বিশাল আকারে বিলুপ্তির ঘটনা ঘটেছে এবং আমরা খুব সম্ভবত ৬ নাম্বারের অপেক্ষায় আছি, মানুষদেরও অনেক প্রজাতি এক সময় বেঁচে ছিল এই পৃথিবীতে, তাদের সবাই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, সবার সাথে যুদ্ধ করে অথবা ন্যাচারাল সিলেকশানে হয়তো মানুষ জিতে গিয়েছে, তাই

আমরা হোমো স্যাপিয়েন্সস্যারা আজকে পৃথিবী শাসন করছি। এরকম একটি প্রাচীন প্রজাতির নাম হচ্ছে নিয়ান্ডারথাল। বৈজ্ঞানিক নাম (*homo neanderthalensis*) অথবা হোমো স্যাপিয়েন্সদের নিয়ান্ডারথেলেনসিস । সমসাময়িক কিছু রিসার্চে দেখা গিয়েছে নিয়ান্ডারথালেরা আজ থেকে প্রায় ৪০,০০০ হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং মনে করা হয়ে থাকে তারা মূলত মর্ডান হোমো স্যাপিয়েন্সদের সাথে খাদ্য, যুদ্ধ এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরেই বিলুপ্ত হয়ে যায়, এছাড়াও বলা হয়ে থাকে জলবায়ুর পরিবর্তন তাদের বিলুপ্তির একটি অন্যতম কারণ, এটি স্পষ্ট নয় কখন নিয়ান্ডারথালরা আধুনিক মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে এটুকু

জানা যায় প্রায় ৮ লক্ষ বছর আগে আমরা আমাদের কাজিন নিয়ান্ডারথালদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাই, নিয়ান্ডারথালদের দাঁত এবং প্রথম দিকের হোমো স্যাপিয়েন্সদের দাঁতের জীবাশ্মের উপরে ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা এই ধারণা পোষণ করেন।

১।

বিবর্তন -

ধারণা করা হয় যে, ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকাতে যথাক্রমে জনসংখ্যা বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে এইচ হাইডেলবার্গেনসিসরাই হচ্ছে নিয়ান্ডারথালস, ডেনিসোভান এবং আধুনিক মানুষের সর্বশেষ সাধারণ পূর্বপুরুষছিল। হাইডেলবার্গেনসিস এবং নিয়ান্ডারথালসের মধ্যে ট্যাক্সনোমিক পার্থক্যটি সামুদ্রিক আইসোটোপ পর্যায়ে ৮০০ থেকে ২৪৩ হাজার বছর আগের ইউরোপের জীবাশ্ম ব্যবধানের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

যাইহোক,

৪৩০ হাজার বছর পুরোনো নিয়ান্ডারথালের জীবাশ্ম (sima de los Huesos) এই জীবাশ্ম এর অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা পূরণ করছে এবং ৪,০০,০০০ বছর আগের জীবাশ্ম

Aroeira3 এইচ হাইডেলবার্গেনসিস এবং নিয়ান্ডারথালেদের মধ্যে ট্রাঞ্জিশনাল ফর্ম হিসাবে ধরা হয়। অর্থাৎ এইচ হাইডেলবার্গেনসিস এবং নিয়ান্ডারথালেরা হয়তো একই সময়ে বসবাস করত।এইচ হাইডেলবার্গেনসিস পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আগে, মধ্য প্লেইস্টোসিন যুগে পশ্চিম ইউরোপ এবং আফ্রিকার মধ্যে জিন প্রবাহ ছিল এই দুই প্রজাতির মধ্যে, যা নিয়ান্ডারথালদের বৈশিষ্ট্যকে কিছুটা অস্পষ্ট করে তোলে।

জীবাশ্মের রেকর্ড মূলত সম্পূর্ণ হয় ১,৩০,০০০ বছর আগে থেকে। এই সময়কালের ফসিলগুলো প্রচলিত নিয়ান্ডারথাল কঙ্কালের বলে প্রমাণিত হয়। ইতালির " ভিজোগলিয়ানো" এবং "ফন্টানা রানুসিও" থেকে দাঁতের অবশিষ্ট অংশের ফসিল ইঙ্গিত দেয় যে মধ্য প্লেইস্টোসিনের সময় থেকে নিয়ান্ডারথালদের দাঁতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো প্রায় ৪৫০-৪৩০ হাজার বছর আগে বিকশিত হয়েছিল। আধুনিক মানবের তুলনায় নিয়ান্ডারথালস এবং

ডেনিসোভান একে অপরের সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, যার অর্থ আধুনিক মানুষের সাথে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর নিয়ান্ডারথাল এবং ডেনিসোভান রা আলাদা হয়েছিল, যদি ধরে নেওয়া হয় এদের মিউটেশান রেট হচ্ছে 1x10−9 or 0.5x10−9 bp প্রতি বছর, তবে নিয়ান্ডারথাল এবং ডেনিসোভিয়ান আলাদা হয়েছিল ২৩৬-৬৯০ অথবা ৪৭৩ - ৩৮৬ বছর আগে, আলাদা হওয়ার আগে, নিয়ান্ডারথাল / ডেনিসোভান (বা "নিয়ান্ডারসোভানস") আফ্রিকা থেকে ইউরোপে পাড়ি জমায়।

২।

নিয়ান্ডারথালদের বাস

নিয়ান্ডারথালেরা ইউরোপ এবং এশিয়ায় বিবর্তিত হয়েছিল যখন আধুনিক মানুষের প্রজাতি হোমো স্যাপিয়েন্স আফ্রিকাতে বিবর্তিত হয়েছিল। উত্তর স্পেনের "সিমা দে লস হিউসোস " এবং ইংল্যান্ডের কেন্টের সোয়ানসিকম্বের জীবাশ্ম প্রমাণের ভিত্তিতে দেখা যায়, নিয়ান্ডারথাল প্রজাতিটি ৪,০০,০০০ লক্ষ বছর আগে ইউরোপে বসবাস শুরু করেছিল, নিয়ান্ডারথালদের আবাস বিস্তৃত ছিল ইউরেশিয়া, পশ্চিম পর্তুগাল এবং ওয়েলস থেকে শুরু করে পূর্বের সাইবেরিয়ার আলতাই পর্বতমালা পর্যন্ত ।

৩।

ফসিল রেকর্ড -

নিয়ান্ডারথালদের নামকরণ করা হয়েছে উপত্যকার নামানুসারে,প্রথম নিয়ান্ডারথালদের ফসিল আবিষ্কার করেন ডাচ ন্যাচারালিস্ট ফিলিপ-চার্লস শ্মারলিং ১৮২৯ সালে।
কিন্তু তিনি মনে করেছিলেন এটি কোনো আধুনিক হোমো স্যাপিয়েন্সের খুলি।
১৮৫৬ সালের আগস্টে নিয়ান্ডারথাল -১ নামে একটি বিখ্যাত ফসিল আবিষ্কার হয় নিয়ান্ডার ভ্যালি জার্মানিতে, প্রথমে পাওয়া যায় স্কাল ক্যাপ, পরবর্তিতে পাওয়া যায় দুটি ফিমারস, ৫ টি আর্ম বোন, বাম পাশের পেলভিসের অংশ, এবং শোল্ডার ব্লেডের আর রিবের কিছু অংশ, প্রায় ৩০০ নিয়ান্ডারথেলদের ফসিল আজ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে ইউরোপ মহাদেশে ৩

৪।

অ্যানাটমি -

নিয়ান্ডারথাল পুরুষরা প্রায় 164-168 সেমি (5.3 ফুট) লম্বা এবং ওজনে গড় 77.6 কেজি (171 পাউন্ড) ছিলেন। নিয়ান্ডারথাল মহিলাদের প্রায় 154 সেন্টিমিটার (5 ফুট) লম্বা ছিল এবং ওজনে গড়ে .4 66.8 কেজি (১46 পাউন্ড) ছিলেন। তাদের লম্বা কিন্তু চাপা স্কাল ছিল, তাদের চেহারাও ছিল স্বতন্ত্র, মুখের মূল অংশটি সামনের দিকে ছড়িয়ে ছিল, নাক ছিল বড় এবং প্রশস্ত ৪। কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন যে এই বৈশিষ্ট্যটি ঠাণ্ডা এবং শুষ্ক পরিবেশে বাস করার জন্য একটি অ্যাডাপটেশন হতে পারে। তাদের সামনের দাঁতগুলো অপেক্ষাকৃত বড় ছিল, যা তারা তাদের তৃতীয় হাতের মতো নিয়মিত ব্যবহার করতেন।

নিয়ান্ডারথালদের বুদ্ধি এবং আচরণ -

আদিম 'কেইভম্যান' হিসাবে খ্যাতি সত্ত্বেও নিয়ান্ডারথালরা আসলে খুব বুদ্ধিমান এবং দক্ষ মানুষ ছিলেন, মস্তিষ্কের আয়তন ছিল 1,200cm3 to 1,750cm3 । প্রায় ৩০,০০০ বছর আগে হোমো স্যাপিয়েন্সের মাথার খুলিও আজকের মানুষের
তুলনায় গড়ে বড় ছিল

৫ ।

নিয়ান্ডারথালেরা দক্ষ টুল মেকার হিসাবে পরিচিত, এরা পাথরের তৈরি বর্শা, এবং কুঠার বানাতে জানত, জীবজন্তুর হাড় দিয়ে প্রয়োজনীয় অস্ত্র বানাত , এটা প্রমাণ করে যে, তারা প্রয়োজনের সময় নিজেদের প্রয়োজনীয় অস্ত্র বানিয়ে নিতে পারত। প্রায় ৩,০০,০০০ বছর আগে নিয়ান্ডারথালেরা একটি অভিনব পাথর প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছিল যাকে বলা হয় Levallois Techniques, অর্থাৎ তারা কিছুটা সুচালো পাথর সংগ্রহ করে রেখে দিত যেন পরবর্তীতে তা আবার কেটে নতুন সরঞ্জাম তৈরি করতে পারে, যার মানে হচ্ছে এরা ঘুরে বেড়াত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় এবং দরকার পড়লে পাথর কেটে অস্ত্র তৈরি করে নিত।

নিয়ান্ডারথালেদের বিভিন্ন শিকারের ফসিলের অংশ থেকে বুঝা যায়, ম্যামথ, বাইসন, রেইনডিয়ারের ফসিলের হাড্ডি-গুড্ডি থেকে পাওয়া তথ্য আমাদের জানায় নিয়ান্ডারথালেরা ছিলেন দক্ষ শিকারী, বুদ্ধিমান এবং অভিজ্ঞ কমিউনিকেটর।

আসুন এবার নিয়ান্ডারথাল আর হোমো স্যাপিয়েন্সদের জেনেটিক কিছু তথ্য জেনে নিই ।

সেক্স, ডিজিজ, বিলুপ্তি -

নিয়ান্ডারথালদের বিলুপ্তির কারণ অনেকেই বলে থাকেন হোমো স্যাপিয়েন্স দায়ী , নিয়ান্ডারথেলদের নিয়ে প্রচুর স্টাডির থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু স্টাডি নিয়ে এখন লিখব, নিয়ান্ডারথালদের সাথে আমাদের জিনের এক্সচেঞ্জ হওয়ার ফলে তাদের ডিএনএ'র অনেক অংশ আধুনিক হোমো স্যাপিয়েন্সদের মধ্যে রয়ে গেছে, উল্লেখযোগ্যভাবে এইসব জিনগুলো আমাদের চুলের রং,থেকে শুরু করে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য কে নিয়ন্ত্রণ করে অনেকাংশে, আধুনিক হোমো স্যাপিয়েন্সদের এবং নিয়ান্ডারথালেরা তাদের কমন এন্সেস্টর শেয়ার করে প্রায় হাফ মিলিয়ন বছর আগে, এরপর তারা আলাদা হয়ে যায়, হিউম্যান থেকে যায় আফ্রিকায় আর নিয়ান্ডারথালেরা স্থানান্তর হয় ইউরোপে।

যখন আধুনিক হোমো স্যাপিয়েন্সরা ইউরো এশিয়ায় প্রবেশ করে তখন তারা নিয়ান্ডারথালেদের সাথে সেক্সের ফলেই জিন শেয়ার করে, আজ আফ্রিকান বংশোদ্ভূত নয় এমন লোকেরা তাদের নিয়ান্ডারথালদের পূর্বপুরুষদের কাছে তাদের ডিএনএর প্রায় ২ শতাংশ শেয়ার করে, প্রশ্ন হচ্ছে এই ডিএনএ'র বা জিনের অংশ কী করে আমাদের শরীরে ? এর অবদান কী? কিছু স্টাডিতে দেখা গিয়েছে, নিয়ান্ডারথালেদের কিছু জিন যাদের মধ্যে আছে এরা ডিপ্রেশন, নিকোটিন ড্রাগস এবং চামড়ার রোগে আক্রান্ত হয় বেশি, কিন্তু এর পুরোটাই খারাপ অবশ্যই না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় এইসব জিনের কারণে আধুনিক হোমো স্যাপিয়েন্সরা সারভাইভাল ক্ষমতা লাভ করেছে ইউরো এশিয়ায়, যেমন স্কিন কালার পরিবর্তন অথবা বিশেষ রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা।

আরো বিস্ময়কর কিছু ব্যাপার জানা যায় কেন ৪০,০০০ হাজার বছর আগে নিয়ান্ডারথালেরা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে কিন্তু হোমো স্যাপিয়েন্স কেন বিলুপ্ত হয়নি, এর পিছনে অনেক থিওরি আছে, হোমো স্যাপিয়েন্সদের সাথে কুকুরের একটি ভাল সম্পর্ক আছে, ৬।

আরেকটি স্টাডি অনুসারে ৬,২২,০০০ বছর পুরোনো আলতাই নিয়ান্ডারথালের জিনের সাথে আজকের দিনের ইউকের ৬০০০০০ মানুষের ডিনএএ'র কম্পেয়ার করে দেখেছেন গবেষকরা, তারা দেখতে পান যে নিয়ান্ডারথাল ডিএনএ বিশেষত জিনের কিছু অংশে যেগুলোতে চুলের রঙ এবং ত্বকের কালারে অবদান রাখে সেই সব জিন দ্বারা আধুনিক মানুষ প্রভাবিত। এটার মানে হচ্ছে নিয়ান্ডারথালদের চুলের রঙ বা গায়ের কালার আলাদা ছিল, কুকুর মানুষকে শিকার ধরার কাজে সুবিধা দিয়েছিল, অন্যদিকে নিয়ান্ডারথালেরা এইসব সুবিধা পায়নি সারভাইভ করার জন্য, আবার হোমো স্যাপিয়েন্সরা খুব দ্রুত সন্তান উৎপাদন করতে পারে যেটা সারভাইভেলের সুবিধা দিয়েছে এবং দিচ্ছে।

এক জেনেটিক স্টাডিতে দেখা গিয়েছে ৬৯৮০ সালে ক্রোয়েশিয়ার গুহায় পাওয়া ৫২,০০০ হাজার বছর আগের কোন এক নিয়ান্ডারথাল মহিলার ফসিলের জিনোম (vindija) সিকোয়েন্সিং করে দেখা গিয়েছে ৬,২২,০০০ বছর আগের আলতাই পর্বতে (সাইবেরিয়া) পাওয়া অন্য এক নিয়ান্ডারথালের ফসিলের জিনের সাথে তার অনেক মিল আছে, এই দুটি নিয়ান্ডারথালের যে দুটি জায়গায় পাওয়া গিয়েছে সেই জায়গার পার্থক্য হলো ৩৭,০০০ মাইল এবং ৭০,০০০ বছরের পার্থক্য, এই দুটি ফসিলের মধ্যে এই সিমিলার জেনেটিক ডেটা এটাই প্রমান করে নিয়ান্ডারথালদের সংখ্যা বেশি ছিল না কারণ ৭০০০০ বছরের ব্যাবধানের জেনেটিক ডাইভার্সিটি অনেক বেশি হওয়ার কথা বায়োলজিক্যালি, জেনেটিক ডাইভার্সিটির অভাবেই খুব সম্ভবত নিয়ান্ডারথালেরা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

জেনেটিক ডাইভার্সিটি নির্ভর করে ন্যাচারাল সিলেকশানের উপর, একটি পপুলেশানের মধ্যে যদি একই ধরনের জিন থাকে তাহলে খুব দ্রুত সেই প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যায়, এই (vindija) জিনোম সিকোয়েন্সিং খুব গুরুত্বপূর্ণ নিয়ান্ডারথালদের ইতিহাসের জন্য, কারণ এই (vindija) জিনোমের কাছাকাছি আজকের আধুনিক হোমো স্যাপিয়েন্সদের জিনের কিছু অংশ এবং এভাবেই ধারনা করা হয় নিয়ান্ডারথালদের জিনের অনেক অংশই আমাদের জিনে রয়ে গেছে।

বিশেষ করে লাল চুলের কোন জিন নিয়ান্ডারথালদের মধ্যে ছিল না, নিয়ান্ডারথাল ডিএনএ আধুনিক মানুষের মনস্তাত্ত্বিক এবং স্নায়বিক বৈশিষ্ট্যগুলিকেও প্রভাবিত করেছিল - যেমন রাতের না ঘুমনো, একাকিত্ব ও হতাশার অনুভূতি এবং ধূমপান আসক্তি। এটার মানে এটা নয় যে নিয়ান্ডারথালদের জেনেটিক মিউটেশানের ফলেই মর্ডান হোমো স্যাপিয়েন্সদের উৎপত্তি, অথবা একই জেনেটিক ভেরিয়েশান একই ধরনের নিয়ান্ডারথালেদের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিল, নিয়ান্ডারথালদের জেনেটিক মিউটেশানের

সাথে ধূমপানের একটি সংযোগ পাওয়া যায়, এর মানে এটি নয় যে নিয়ান্ডারথালরা ধূমপান করত।

প্রাচীন হোমো স্যাপিয়েন্সরা শুধুমাত্র নিয়ান্ডারথালদের সাথে সেক্সই করত না সেই সাথে সাথে যুদ্ধ করত। ডেনমার্ক সিকোড়া ইউনির্ভাসিটির এক স্টাডিতে দেখা যায় ৩০,০০০ হাজার বছর আগের ফসিলের এক নিয়ান্ডারথাল , দুটি নিয়ান্ডারথাল শিশু, কবরে দেখা যায় যে ব্যক্তিটিকে একা একা কবর দিলেও শিশু দুটিকে একত্রেই কবর দেওয়া হয়েছিল, যাদের উরুকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল তাদের মাথার পাশে, এতেই এটি বুঝা যায় এরা কোনো সংঘর্ষের ফলেই মারা যায়।

নিয়ান্ডারথাল এবং বাংলাদেশে -

একটি স্টাডি অনুযায়ী বাংলাদেশের ৬৩% পপুলেশান নিয়ান্ডারথালদের একটি জিনের অংশ ক্যারি করছে, করোনা ভাইরাসের আক্রান্তের কারণ যে জিনগুলো দায়ী সেরকমই একটি জিন, সেগুলোর একটি অংশ এসেছে নিয়ান্ডারথালদের কাছে থেকে, এই জিনটির একটি সেগমেন্টের অবস্থান হিউম্যান ক্রোমোজোম নাম্বার ৩ এ, জিনটি বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে, জিনটির কারণে করোনা ভাইরাসের ইনফেকশন পরিমাণ বেড়ে যায় - বলছেন সাভান্তো পাবো এবং হিউগো যেব্রাক যারা কিনা গবেষণা করেন জার্মানির ম্যাক্স প্লাংক ইনস্টিটিউটে। তাদের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৬৩% বাংলাদেশী মানুষ এই জিনের একটি অংশ ক্যারি করে এবং পুরো সাউথ এশিয়ায় ৩ ভাগের একভাগ মানুষ এই জিন ক্যারি করেন, আবার এই জিনের সেগমেন্টটি ইউরোপ এবং ইস্ট এশিয়ায় ক্যারি করে মাত্র ৪% মানুষ এবং আফ্রিকার মানুষের মধ্যে এই জিনটি একদম নেই বললেই চলে, প্রায় ৬,০০,০০০ বছর আগে হোমো স্যাপিয়েন্সদের কিছু পূর্ব পুরুষেরা আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে ইউরোপ, এশিয়ার এবং আস্ট্রেলিয়ায় পৌছান এবং তারা খুব সম্ভবত নিয়ান্ডারথালদের সাথে ইন্টারব্রিড করেন।

একবার এই জিন যখন আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে তখন জেনারেশন ধরে এটি আমাদের জনসংখ্যার মধ্যে বিস্তার লাভ করে এবং রয়ে যায়।

যদিও নিয়ান্ডারথালেরা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে কিন্তু তাদের রয়ে যাওয়া জিন আমাদের মাঝে অনেক প্রভাব বিস্তার করছে।

রেফারেন্স:

মজার তথ্য

৩৩-৪৫ মিলিয়ন বছর আগে এই জায়ান্ট পেঙ্গুইনগুলো থাকত।

Metres
2
1
1.8 metres
1.72 metres
1.2 metres
Anthropornis
Human Male
Emperor Penguin
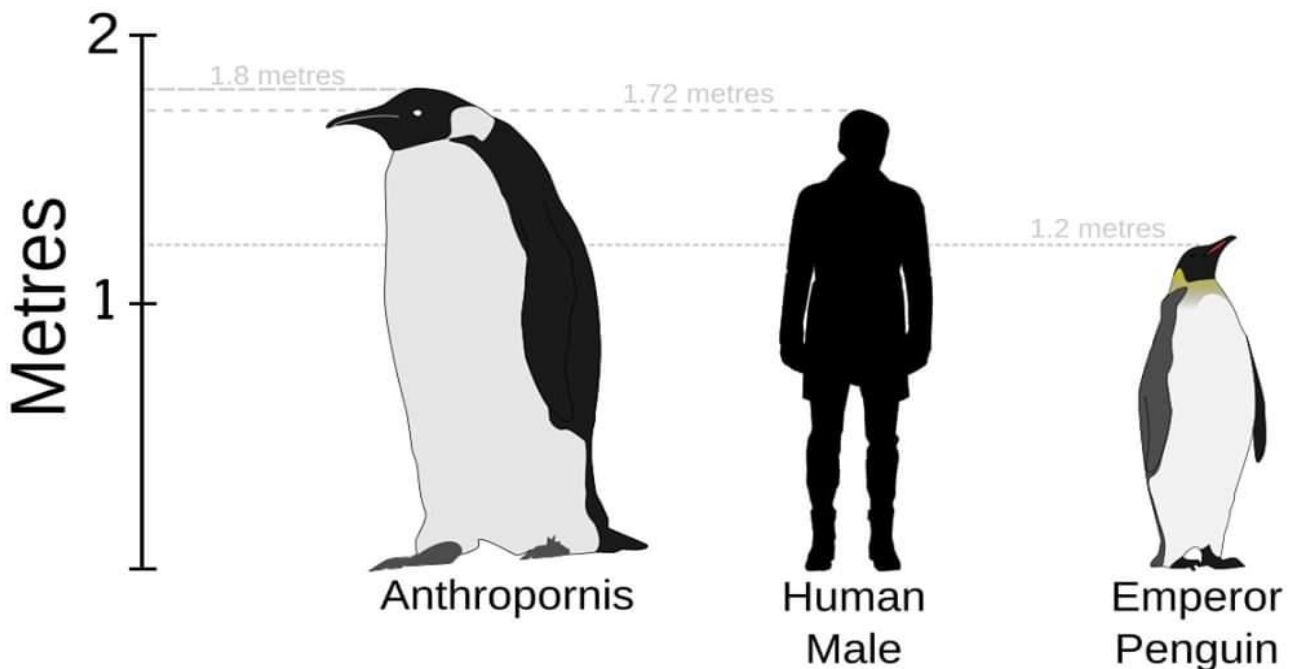
মোজেসরাস

প্রজেশ দত্ত

কোনো গল্পে যখন অদ্ভুত ধরনের ভয়ঙ্কর কোনো শিকারি প্রাণীর কথা ফোটে ওঠে, আমাদের শুধু গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায় না, বরং ভয়ে হয়তো মুখও লুকিয়ে ফেলি। আর যদি সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীটা হয় সমুদ্রের? বা অ্যামাজনের কোনো জলাভূমির? "Open water", "Deep rising", "Jaws", "Deep Blue sea" টাইপের মুভিগুলো ছোটবেলায় অনেক প্রিয় ছিল। মুভিগুলোতে দেখানো সামুদ্রিক মনস্টার দেখে শিহরিত হননি এমন মানুষ কমই আছেন। HBO, Star movies-এ নিয়মিত এরকম একটা না একটা মুভি দেখানো হতো। এই মুভিগুলো ভালো লাগার কারণ গভীর সমুদ্রে, পানির নিচে লুকিয়ে থাকা রহস্য, দানবাকৃতির প্রাণী। পানির নিচের দুনিয়া বরাবরই একটু ভয়ঙ্কর, রহস্যময়।

আজকে কোনো মুভির মনস্টার না, ৮২-৬৬ মিলিয়ন বছর আগে আমাদের এই পৃথিবীতে বাস করত এমন এক সামুদ্রিক দানবের গল্প বলব। মোজেসর (Mosasaur)। একে মেসোসর ডাইনোর সাথে গুলিয়ে ফেলবেন না। সর্বমোট ৩৮ টি গণের প্রাণীকে মোজেসর বলে সম্বোধন করা হয়। এদের অনেক গ্রুপ এবং সাবগ্রুপে বিভক্ত করা হয়েছে। তবে বৃহত্তম আকৃতির মোজেসর গুলো মোজেসরাস গণের অন্তর্ভুক্ত। তাই আমরা মোজেসরাস নিয়ে মূল আলোচনায় থাকব।

ক্রিটেসিয়াস যুগের শেষ দিক (ক্যাম্পানিয়ান এবং মাসট্রিকটিয়ান স্টেজ চলছে)। এই মোজেসরাস গণের প্রাণীরা সমুদ্রে রাজত্ব করছে তখন। আসলে মোজেসরাস কোনো নির্দিষ্ট প্রজাতির নাম না, গণের নাম, এই বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখবেন। এই গণের অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলো স্পিসিজের সন্ধান, ফসিল পাওয়া গেছে।

১৭৬৪ সালে এই প্রাণীর কঙ্কালের এক টুকরো মানুষের হাতে আসে, মাসট্রিক্টের নিকটবর্তী পাহাড় মাউন্ট সেইন্ট পিটারের নিচে ভূগর্ভস্থ চুনাপাথরের আকরিক থেকে। তখন এই প্রাণীটিকে মনে করা হয় কোনো তিমি মাছের মতো বড় প্রাণী। সেভাবেই এই ফসিলের বর্ণনা দিয়ে তখন আমজনতার সামনে তুলে ধরা হয় মোজেসরাসকে- "A species of big breathing fish."

আসলে মোজেসরাস কোনো মাছ ছিল না। আমরা যদি এর ক্লাসিফিকেশনের দিকে নজর দেই তবে এদের বর্গ (Order) ছিল স্কুয়ামাটা আর শ্রেণী (Class) ছিল রেপ্টিলিয়া। অর্থাৎ এরা ছিল সরীসৃপ প্রাণী, আপনার বাসার দেয়ালে ঘুরে বেড়ানো টিকটিকিও কিন্তু সরীসৃপ। স্কুয়ামাটা সরীসৃপ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সবথেকে বড় বর্গ। মোজেসরাস নামকরণের দিকে যদি আমরা নজর দেই তবে দেখব, মোজেসরাস অর্থ- "Lizard of the Meuse River."

আমরা একটু আগে যে মাসট্রিক্ট শহরের কথা বললাম সেটা এই মিউস নদীর কাছে অবস্থিত। যা হোক, ফসিলের সন্ধান ও আবিষ্কারের ক্রমধারায় এরপর মোজেসর প্রাণীদের অনেক ফসিল পেয়েছি আমরা।

ক্রিটেসিয়াস যুগের শেষ দিকে এসে মোজেসর প্রাণীরা অর্জন করেছিল সবথেকে ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক শিকারি প্রাণীর উপাধি। ক্রিটেসিয়াস যুগে অ্যাগিয়ালোসর নামে এক প্রকার জলজ লিজার্ড এই পৃথিবীতে নিজেদের জানান দিত। এই অ্যাগিয়ালোসর থেকেই মোজেসর প্রাণীরা বিবর্তিত হয়েছে- এমন প্রমাণ মেলে। অ্যাগিয়ালোসরের সময়কালে আরও দুইটি ভয়ঙ্কর শিকারি প্রাণীর দাপট প্রকৃতিতে ছিল। ইকথায়োসর এবং পাইলোসর। এরা ছিল ওই সময়ের সবথেকে দাপুটে শিকারি প্রাণী। কিন্তু ক্রিটেসিয়াস যুগের শেষে যখন অ্যাগিয়ালোসর থেকে মোজেসর আলাদা হচ্ছিল তখন এরা বিলুপ্ত হয়ে যায়। টুরোনিয়ান- মাসট্রিকটিয়ান স্টেজে। ফলে মোজেসররা হয়ে ওঠে সময়ের সবথেকে ভয়ানক শিকারি প্রাণী। আমরা সিনেমায় শার্ক/হাঙরকে দেখেছি মানুষ শিকার করতে, আমরা তাতেই ভয় পেয়ে যাই, কিন্তু মোজেসরাস প্রাণীরা (বৃহত্তম আকৃতির মোজেসর, সবথেকে আধিপত্য বিস্তারকারী শিকারি মোজেসর প্রজাতিগুলো এই গণের) নিজেদের খাদ্য তালিকার প্রথমেই রেখেছিল এই হাঙরদের। তারা হাঙর, সী টারটাইল, বনি ফিস, সেফালোপডস, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি খেতো। সবথেকে ভয়ানক বিষয় হলো, এই শিকারি গণের প্রাণীরা নিজেদেরই জ্ঞাতি ভাই অর্থাৎ অন্যান্য গণের অন্তর্ভুক্ত মোজেসরদের খাদ্য হিসেবে শিকার করতো । এই কারণে বর্তমান গবেষকরা মোজেসরাসদের শুধু মোজেসরদের মধ্যেই নয় বরং ঐ সময়ের ইকো-সিস্টেমের সব থেকে ভয়ানক শিকারি প্রাণীর আসনে বসিয়েছে।

মোজেসরাস গণের প্রাণীরা আকারে ৯ মিটারের থেকে বেশি লম্বা হতো। অর্থাৎ এই গণের সকল প্রাণীই ৯ মিটার থেকে দৈর্ঘ্যে বড়। সাধারণত ১০-১৮ মিটার হতে পারে এরা। মোজেসর প্রাণীদের সব থেকে নিকট আত্মীয়দের মধ্যে রয়েছে আমাদের পরিচিত গুইসাপ বা মনিটর লিজার্ড এবং কমোডো ড্রাগন। মোজেসর প্রাণীদের সাথে এদের স্কালের অনেক মিল পাওয়া যায়। এদের লেজ ছিল অনেক লম্বা এবং ইকথায়োসরের মতো লেজের প্রান্ত ছিল কিছুটা বাঁকা (Down curved)। সব ধরনের মোজেসর প্রাণীদের চোয়ালে চার ধরনের দাঁত ছিল ।

উপরের চোয়ালে ছিল তিন ধরনের দাঁত-

১) প্রিম্যাক্সিলারি টিথ

২) ম্যাক্সিলারি টিথ

৩) টেরিগয়েড টিথ

আর নিচের চোয়ালে এক ধরনের দাঁত। ডেন্টারি টিথ।

ফিরে আসি মোজেসরাসদের কথায়। মোজেসরাসদের চোয়াল ছিল কিছুটা শঙ্কু আকৃতির, এরা তাদের ঘাড়ের নমনীয়তার জন্য চোয়াল সামনে-পিছনে সাবলীলভাবে নড়া-চড়া করতে পারত। এই সাবলীল মুভমেন্ট তাদের শিকার ধরতে সাহায্য করত । দুই পাটি চোয়ালের বিশেষ ব্যবস্থার কারণে তারা বড় কোনো শিকার ধরার সময় নিজেদের নিম্ন চোয়াল অনেক বেশি বিস্তৃত করতে পারত ।

সব মোজেসর প্রাণীদের আকার-আকৃতি যেমন এক নয়, তেমনই প্রজাতিভেদে মোজেসরাস গণের অন্তর্ভুক্ত প্রাণীদের শারীরিক গঠনে ছোট-খাটো পার্থক্য দেখাই যায়। তবে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এই গণের প্রাণীদের আলাদা করেছে। এদের দাঁতের এনামেলের পরিধি কিছুটা প্রিজম আকৃতির। দাঁত এমনভাবে সজ্জিত, শিকার একবার চোয়ালের গহ্বরে প্রবেশ করলে গলাধঃকরণ পর্যন্ত যতই চেষ্টা করুক নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। মোজেসরাস গণের সরীসৃপদের দাঁত সবথেকে শক্ত এবং বড় বিবেচনা করা হয়। তবে কিছু প্রজাতির (Conodon, Lemonnieri) দাঁত এত শক্তিশালী না। কাটিং এজের ক্ষেত্রেও প্রজাতি ভেদে বৈচিত্র্য চলে আসে। কিছু প্রজাতির দাঁতের কাটিং এজ খাঁজ কাটা, কিছু প্রজাতির আবার মসৃণ। মজার বিষয় হলো, কিছু প্রজাতির প্রাণীতে একই সাথে মসৃণ, খাঁজকাটা উভয় ধরনের দাঁতই পাওয়া যায়।

মোজেসরাস গণের প্রাণীদের ডেন্টাল ফর্মুলা দেখলে আমরা দেখব- (২. ১২-১৬. ৮-১৬)|(১৪-১৭). এর অর্থ, উপরের চোয়ালে রয়েছে ২ টি প্রিম্যাক্সিলারি টিথ, প্রজাতিভেদে বা কখনো কখনো প্রাণীভেদে ১২-১৬ টি ম্যাক্সিলারি টিথ, ৮-১৬ টি টেরিগয়েড টিথ। আর নিচের চোয়ালে থাকে ১৪-১৭ টি ডেন্টারি টিথ।

মোজেসরাসদের ফসিল থেকে প্রাপ্ত টিস্যু নিয়ে করা গবেষণার ফলাফল থেকে বেরিয়ে আসে, এদের মেটাবলিক তথা বিপাকের হার বর্তমানে পাওয়া স্কুয়ামাটা সরীসৃপদের তুলনায় অনেক বেশি। এদের বিপাকের হার লেদারব্যাক সি টারটল আর ইকথায়োসরসের মাঝামাঝি পর্যায়ের। লেদারব্যাক সি টারটল জীবন্ত টারটলদের

মধ্যে বৃহত্তম এবং বর্তমানের সকল সরীসৃপদের মধ্যে ভরের দিক থেকে চতুর্থ।

মোজেসরাস প্রাণীরা ছিল এন্ডোথার্মিক, উষ্ণ রক্তের প্রাণী। এই বৈশিষ্ট্য স্কুয়ামেট সরীসৃপদের মধ্যে দেখা যায় না, এই বৈশিষ্ট্য মোজেসরাসদের অনন্য করেছে আর টিকে থাকতে অনেক বেশি সাহায্য করেছে। এন্ডোথার্ম শব্দের দুইটি অংশ- "এন্ডোন" এবং "থার্ম।" এন্ডোন অর্থ অভ্যন্তরীণ (Within), থার্ম অর্থ তাপ (Heat). এন্ডোথার্মিক প্রাণীরা উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট, এরা এদের দৈহিক তাপমাত্রার ভারসাম্য (বিপাকীয় ক্রিয়ার জন্য উপযোগী তাপমাত্রা) রক্ষা করে চলতে পারে। এদের দেহের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ায় যে শক্তি উৎপন্ন হয় এরা তার উপর নির্ভরশীল, পরিবেশের তাপমাত্রার উপর না। যার ফলে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পরিবেশে এন্ডোথার্মিক প্রাণীরা টিকে থাকায় সুবিধা পায়।

এন্ডোথার্মিক হওয়ার কারণে মোজেসরাস প্রাণীরা যে সুবিধা পেয়েছিল. তার অন্যতম হলো অ্যান্টার্কটিকার মতো সাব-পোলার এলাকায় টিকে থাকা যখন সমুদ্রের তাপমাত্রা বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম তাপমাত্রায় পতিত হতো (৪°-৫° সেলসিয়াস, সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ০° বা তারও কম)। তাদের স্ট্যামিনা অনেক বেশি ছিল, অনেক বড় এলাকা জুড়ে ঘুরে বেড়াত আর শিকার করতে পারত। ফলে প্রতিকূল পরিবেশে (অতি নিম্ন তাপমাত্রায়) যখন অন্য প্রাণীরা বা অন্যান্য স্কুয়ামেটরা খাদ্যাভাবে ভুগতো তখন মোজেসরাসরা বাঙালিদের মতো পেট ভরে খেয়ে-দেয়ে সুখনিদ্রায় চলে যেত।

মোজেসরাস প্রাণীদের লম্বা লেজ এবং প্যাডেলের মতো অঙ্গ তাদের অতি দ্রুত সাঁতার কাটতে সহায়তা করত, ঘণ্টায় প্রায় ৩০ মাইল। এদের শরীরের স্কাপুলা, হিউমেরাস ছিল পাখা আকৃতির; রেডিয়াস এবং আলনা ছিল খাটো। এদের চোখ ছিল মাথার দুই পার্শ্বে, আকারে অনেক বড়, প্রাপ্ত ফসিলে চোখের সকেট এবং স্ক্লেরোটিক বলয়ের আকার দেখে বড় চোখের ধারণা পাওয়া যায়। এদের দৃষ্টিশক্তি ভালো হলেও মাথার দুই পার্শ্বে চোখ হওয়ায় বাইনোকুলার ভিশন (ত্রিমাত্রিক ইমেজ তৈরির ক্ষমতা) তৈরি বাধাগ্রস্থ হত। বরং এরা অনেক বিস্তৃত এলাকা জুড়ে পরিবেশের দ্বিমাত্রিক ছবি দেখত। স্কালের দু'পাশে চোখ হওয়ায় এরা একই সাথে নিজেদের দু'পাশের অনেকখানি পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারত।

মোজেসরাসদের রিপ্রোডাকশন সিস্টেম নিয়ে খুব নিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও তাদের কঙ্কালের গঠন এবং অন্যান্য বিষয়ের গবেষণা থেকে ধারণা করা হয় এরা স্তন্যপায়ীদের মতো প্রজনন ঘটাত। অর্থাৎ দেহের ভিতরে ভ্রূণ গঠিত হত এবং সন্তান প্রসব অবধি দেহের ভিতরেই বেড়ে উঠত। এর স্বপক্ষে জোরালো প্রমাণ হিসেবে গবেষকদের হাতে রয়েছে মোজেসরয়েড পরিবারের গর্ভবতী এক সদস্যের ফসিল যার সাথে দু'টি মোজেসর প্রাণীর ভ্রূণ ফসিলও পাওয়া যায়।

আমরা এর আগেই মোজেসরাসদের খাদ্যাভ্যাস দেখেছি। মোজেসর প্রাণীদের এত শক্তি-সামর্থ্য থাকার পরও একটা দুর্বলতা ছিল। সেটা তাদের ঘ্রাণশক্তি। এই ঘ্রাণশক্তির দুর্বলতা খুব কম দেখা যায় শিকারি প্রাণীদের মধ্যে। এই দুর্বলতা থাকার পরও মোজেসরাসরা এত শক্তিশালী ও ভয়ঙ্কর শিকারি হয়েছিল তাদের দ্বিমাত্রিক দৃষ্টিশক্তির কারণে, তারা প্রকৃতপক্ষে বেশিরভাগ সময়ই সমুদ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি অবস্থানে শিকার করত যার ফলে তারা শিকারকে সহজে শনাক্ত করতে পারত।

মোজেসরাসদের শিকারের ব্যাপারে আরেকটি ইন্টারেস্টিং তথ্য রয়েছে। একটি বৃহৎ আকৃতির নওটিলয়েড (Nautiloid) (বৃহৎ আকৃতির সেফালোপডস) এর ফসিল পাওয়া গেছে। তার দেহে দুই ধরনের কামড়ের চিহ্ন ছিল, একটি কামড়ের বাইট - ফোর্স তুলনামূলক কম, আরেকটির বেশি; দুটোই মোজেসরাস প্রাণীর। এই তথ্যের ভিত্তিতে দুটো সম্ভাব্য হাইপোথিসিস দাঁড় করানো যায়।

১) নওটিলয়েড টিকে কাবু করার জন্য প্রথমে তাকে হালকা কামড় বসিয়েছে একটি মোজেসরাস। কিন্তু কামড় সহ্য করেও নওটিলয়েডটি মোজেসরাসের চোয়াল থেকে কোনোভাবে ছাড়া পেয়েছে। তাই পুনরায় আরও শক্তিশালী কামড় বসিয়েছে।

২) দুটো পৃথক মোজেসরাস। একটা প্রাপ্তবয়স্ক, শক্তিশালী। অপরটা ইয়ং, বালক। কম বয়সী মোজেসরাসটির বাইট ফোর্স অনেক কম। আর প্রাপ্তবয়স্ক মোজেসরাসটির বাইট ফোর্স বেশি।

প্রথম হাইপোথিসিসটির ভিত্তি নাই তেমন। কারণ কামড় দুটি থেকে সৃষ্ট চিহ্ন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, চোয়ালের আকারে ভিন্নতা রয়েছে। কম বাইট ফোর্সের কামড় অপেক্ষাকৃত তরুণ মোজেসরাসের চোয়ালের। তাহলে দ্বিতীয় হাইপোথিসিসের পক্ষে বেশ জোরালো প্রমাণ আর যুক্তি আসলো। কিন্তু এখান থেকে আরেকটি অনুসিদ্ধান্ত তথা আরেকটি হাইপোথিসিস গবেষকদের নাড়া দিলো। আসলে প্রাপ্তবয়স্ক মোজেসরাসটি মাতা আর তরুণ মোজেসরাসটি তার সন্তান। মা তার সন্তানকে শেখাচ্ছে কীভাবে শিকার করতে হয়। মা যেন তার সন্তানকে শেখাচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি অঞ্চলে পাওয়া টারটল বা বনি ফিশই নয় শুধু,

প্রয়োজনে বিকল্প খাবার হিসেবে সেফালোপডসও শিকার করা যাবে।
এই হাইপোথিসিসের পক্ষে আরও জোরালো যুক্তি হতে পারে এমন- আগেই দেখেছি মোজেসর প্রাণীরা অন্য মোজেসর প্রাণীদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। সম্ভাবনা ছিল তরুণ, দুর্বল মোজেসরাসটির প্রাপ্তবয়স্ক, সবল মোজেসরাসের খাদ্যে পরিণত হওয়ার, তা হয়নি। তবে তারা হয়তো একই প্রজাতির, একই প্রজাতির মোজেসরাস একে অপরকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে না। তাহলে অন্তত এমন হওয়া উচিত খাদ্য নিয়ে ধস্তাধস্তি, কারণ আপনি আর আরেকজন যখন একই শিকারের পিছনে লাগবেন তখন বিবাদ হবে স্বাভাবিক। কিন্তু এমন কোনো আলামত পাওয়া যায়নি। তাই গবেষকরা এই বিষয়টাকে "প্যারেন্টাল কেয়ার" হিসেবে দেখছেন, সকল যুক্তি-প্রমাণ এই হাইপোথিসিসকে সমর্থনও করছে। সামনে হয়তো আরও আলামত পাওয়া যাবে যা এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করবে আমাদের।
যেহেতু খাদ্য নিয়ে প্রতিযোগিতার কথা তুললাম, সেহেতু মোজেসরাসদের আরও দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেই। টাইলোসরাস (tylosaurus) এবং প্রগন্যাথোডন (prognathodon). এই দুইটি প্রাণীও মোজেসর প্রাণী। আকার-আকৃতি এবং শিকারের দিক থেকে এদের অবস্থান মোজেসরাসদের পরেই। টাইলোসরাস আকারে প্রায় ৪০ ফিট এবং প্রগন্যাথোডন আকারে প্রায় ৩৯ ফিট লম্বা হতে পারত। তাদের খাদ্য তালিকাও ছিল মোজেসরাসদের মতোই বিভিন্ন সামুদ্রিক সরীসৃপ, প্রাণী। খাদ্য তালিকা একই হওয়ায় এই তিন গণের প্রাণীদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা চলবে সেটাই স্বাভাবিক; এই প্রতিযোগিতার প্রমাণও মেলে ফসিলে প্রাপ্ত বিভিন্ন সংঘর্ষের চিহ্ন দেখে।

এবার একটু ভিন্ন টপিকে কথা বলা যাক। কীভাবে বুঝলাম তাদের খাদ্য তালিকা একই রকম ছিল বা কোন মোজেসরের কী খাদ্য তালিকা-
১) বিভিন্ন ফসিল বিভিন্ন সময়ে পাওয়া যায় যেগুলো হয়তো মোজেসররা শিকার করেছে, মেরে ফেলেছে, কিন্তু খায়নি বা আংশিক খেয়েছে। সেগুলোর উপর দাঁতের চিহ্ন দেখে।
২) মোজেসরদের ফসিলের সাথেই অনেক সময় বিভিন্ন প্রাণীর স্কাল পাওয়া যেতে পারে। এরকম একটাই উদাহরণ আছে জানা। ৭৫ মিলিয়ন বছর আগের একটা মোজেসরাসের ফসিল পাওয়া গিয়েছে যার সাথে প্রাণীটির পাকস্থলীর বিভিন্ন খাদ্য উপাদান, খাদ্যাবশেষও ফসিল হয়ে গিয়েছে। এই খাদ্য উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করে প্রায় ১ মিটার লম্বা মাছের দেহাবশেষ শনাক্ত করা হয় যা ঐ খাদক মোজেসরাসটির স্কাল থেকেও লম্বা। মোজেসরাসটি আকারে ছোট ছিল, ৬৬ সে.মি'র মতো দৈর্ঘ্য তার। এই বিশ্লেষণ থেকে মোজেসরাসের খাদ্যাভ্যাসের পাশাপাশি আরেকটা বিষয় জানা যায়- তারা ম্যাক্রোফ্যাগাস। নিজেদের শরীরের থেকেও বড় আকৃতির খাদ্য ভক্ষণে সক্ষম।
৩) এবার আসি মোজেসরদের খাদ্যাভ্যাস জানার সবচেয়ে উপযোগী পন্থায়। কার্বন-১৩ ডেটিং। উচ্চ পরিমাণে লিপিড থাকে এমন খাদ্য খাদকের শরীরে কার্বন-১৩ আইসোটোপের পরিমাণ কমায়। অর্থাৎ কোনো খাদকের ট্রপিক লেভেল অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাদ্য গ্রহণের ব্যাস্তানুপাতিক। মোজেসরদের ফসিলে এই কার্বন-১৩ আইসোটোপের পরিমাণ অনেক কম। যা প্রমাণ করে মোজেসররা বিভিন্ন সামুদ্রিক টারটল, বনি ফিশ আর সরীসৃপকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করত। এইসব খাদ্যে লিপিডের পরিমাণ অনেক বেশি।
মোজেসরাস সর্বকালের সর্ববৃহৎ সামুদ্রিক সরীসৃপ ছিল না। তার থেকে বৃহৎ সামুদ্রিক সরীসৃপ শাসট্যাসরাস (Shastasaurus)। কিন্তু শাসট্যাসরাস মোজেসরাসের মতো এত ভয়ঙ্কর শিকারি ছিল না। তাই তারা সমুদ্রে ত্রাস সৃষ্টি করতে পারেনি মোজেসরাসের মতো। এই মোজেসরাসের বাসস্থান উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা হতে শুরু করে এশিয়া, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়ায় বিস্তৃত ছিল। হাঙ্গেরীতে স্বচ্ছ পানির মোজেসরাসও বাস করত।
মোজেসরাসদের বিলুপ্তি ঘটে K-Pg ইভেন্টে যা K-T ইভেন্ট নামেও পরিচিত। K-Pg দ্বারা বুঝায় ক্রিটেসিয়াস-প্যালিওজিন সীমা এবং K-T দ্বারা বুঝায় ক্রিটেসিয়াস-টারশিয়ারি সীমা। এই সময়ে শুধু সমুদ্রের বাদশাহ মোজেসরই না, পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল সেই সময়ের পৃথিবীতে রাজত্ব করা সব প্রাণীরা। এই লিস্টে রয়েছে ডাইনোসর, নানারকমের স্তন্যপায়ী, টেরোসর, পাখি, উদ্ভিদ প্রভৃতি। কী হয়েছিল এই সময়কালে? কী কারণে পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে গেল এত প্রাণ?
এই নিয়ে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব হলো, "আলভারেজ তত্ত্ব"। পিতা লুই আলভারেজ ও পুত্র ওয়াল্টার আলভারেজ এই তত্ত্ব প্রদান করেন। তারা বলেন ঐ ইভেন্টে ১০-১৫ কি..মি ব্যাসের একটি উল্কা বা গ্রহাণু পৃথিবীতে আঘাত হানে, হতে পারে সেটা কোনো ধুমকেতু। ফলে পৃথিবীর পরিবেশের ভারসাম্য পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীতে ৯০ এর দশকে মেক্সিকো সাগরের উপদ্বীপ ইউকাটানে ১৮০ কি..মি ও উল্কাখাদ আবিষ্কৃত হয়, চিক্সুলাবউল্কাখাদ। এছাড়া

ঐ সময়ের আগ্নেয়োচ্ছ্বাস, জলবায়ু পরিবর্তন, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিও কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মোজেসরাস ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে অনেক প্রিয় তার প্রধান কারণ এরা সামুদ্রিক। সমুদ্রের নিচে টিকে থাকা, বাস করা, রাজত্ব করা প্রাণীগুলো মিলিয়ন বছর আগের হোক বা বর্তমানের, আমার কাছে তারা রহস্যময়। সমুদ্রের নিচে রাজত্ব করা এই গিরগিটি সম্পর্কে জানার পর আপনার বাসায় হেঁটে বেড়ানো গিরগিটি বা বাগানে থাকা মনিটর লিজার্ডের প্রতি হয়তো আকর্ষণ বাড়বে। মোজেসরাস নিয়ে আর্টিকেলের এই তথ্যবহুল অংশ শেষ করব একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে।

মোজেসরাস গণের মধ্যে বৃহত্তম আকৃতির মোজেসর পাওয়া গেছে Mosasaurus hoffmanni প্রজাতির।

What if?

আর্টিকেলের এই অংশে একটু নিজের চিন্তা প্রকাশ করব। এই অংশের ধারণা জনপ্রিয় ইউটিউব চ্যানেল “What if” থেকে মাথায় এসেছে। ঐ চ্যানেলে উল্লিখিত একটি ইন্টারেস্টিং মতামতের সাথে আমার নিজস্ব কিছু আইডিয়া তুলে ধরলাম এই অংশে-

১) আমরা জেনেছি মোজেসরাসদের মধ্যে প্যারেন্টাল কেয়ারিং এর বিষয় ছিল। কেমন হতো যদি প্যারেন্টাল কেয়ারিং ছাড়াও মোজেসরাস দল বেঁধে আক্রমণ করত? ওয়ান ভার্সেস ওয়ান যুদ্ধে মোজেসরাস মেগালোডন শার্কের তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ঠিক; কিন্তু ৫০-৫৮ ফুট লম্বা সদস্যবিশিষ্ট এক দল মোজেসরাস ইতিহাসের যেকোনো ভয়ানক বা বৃহত্তম সামুদ্রিক প্রাণীকেই হারাতে পারত সহজে।

২) What if এর থিওরি অনুসারে, মোজেসরাস প্রাণীরা যদি কোনোভাবে K-Pg ইভেন্ট সার্ভাইভ করতে পারত তবে মেগালোডন শার্ক হয়তো সমুদ্রের রাজত্ব পেতো না। কারণ, মোজেসরাসদের অন্যতম খাদ্য ছিল শার্ক। মেগালোডন শার্ক তরুণ অবস্থাতেই মোজেসরাসদের খাদ্যে পরিণত হয়ে অচিরে নিজেদের অস্তিত্ব হারাতো।

৩) ঘ্রাণশক্তি প্রখর হলে আরও অনেক প্রজাতির প্রাণী মোজেসরাসদের খাদ্য তালিকায় সামিল হতো। তাদের শিকারের দক্ষতা বৃদ্ধি পেতো।

৪) প্রথম পয়েন্টে বলেছি মেগালোডন শার্ক আর মোজেসরাসের ওয়ান ভার্সেস ওয়ান যুদ্ধে মেগালোডন জিতবে। এর অন্যতম কারণ মেগালোডনের দাঁত পাঁচ সারি যেখানে মোজেসরাসের দাঁত দুই সারি। আবার মেগালোডন শার্ক সাইজে এত বড় যে মোজেসরাস তার চোয়ালে কখনোই মেগালোডনকে তেমনভাবে আটকাতে পারবে না। এজন্য মেগালোডনকে আহত করা কঠিন। হয়তো পাখনা বা প্যাডেলের মতো কোনো অংশকে ভেঙে ফেলতে পারবে মোজেসরাস যেখানে মেগালোডন শার্ক একটা মোজেসরাসের অবস্থা দফারফা করতে পারে।

কিন্তু একটা মজার বিষয় এই দুই প্রাণীর সামর্থ্য তুলনা করার সময় সবখানে উপেক্ষা করা হয়েছে - মেগালোডন শার্কের সাঁতারের গতি ১৮ কি.মি প্রতি ঘণ্টা যেখানে মোজেসরাসের গতি ৩০ মাইল প্রতি ঘন্টা (তথ্যসূত্রঃ উইকিপিডিয়া)। অর্থাৎ, মোজেসরাসের গতি প্রায় ২.৬৮ গুণ। এবার ভাবুন। কেউ আপনার তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারল না, তবে আপনার আঙুলের একটা নখ উপড়ে দিয়ে বা আঙুল ভেঙে দিয়ে ভোঁ দৌড় দিল, আপনি তাকে ধরতেই পারলেন না। কে জিতবে?

দেখেন ভাই, অপু ভাইয়ের ভাষায়, “মোজেসরাস জিতলে কি আমি ফাচ টাকা পাব?” তবু স্পিডের বিষয়টা মাথায় রেখে যতবার আমি মেগালোডন শার্ক আর মোজেসরাসের যুদ্ধের কথা কল্পনা করেছি, মোজেসরাস জিতেছে শুধু তার এই স্পিডের জন্য।

যাহোক, K-Pg বিলুপ্তির সময়কাল মোজেসরদের জন্য সার্ভাইভ করা সম্ভব ছিল না। কিছু সামুদ্রিক লেদ্যারব্যাক কচ্ছপ আর কুমির ছাড়া ঐ সময়ের রাজত্ব করা তেমন কোনো প্রাণী টিকে থাকতে পারেনি। পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে নাম লিখিয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

তথ্যসূত্র:
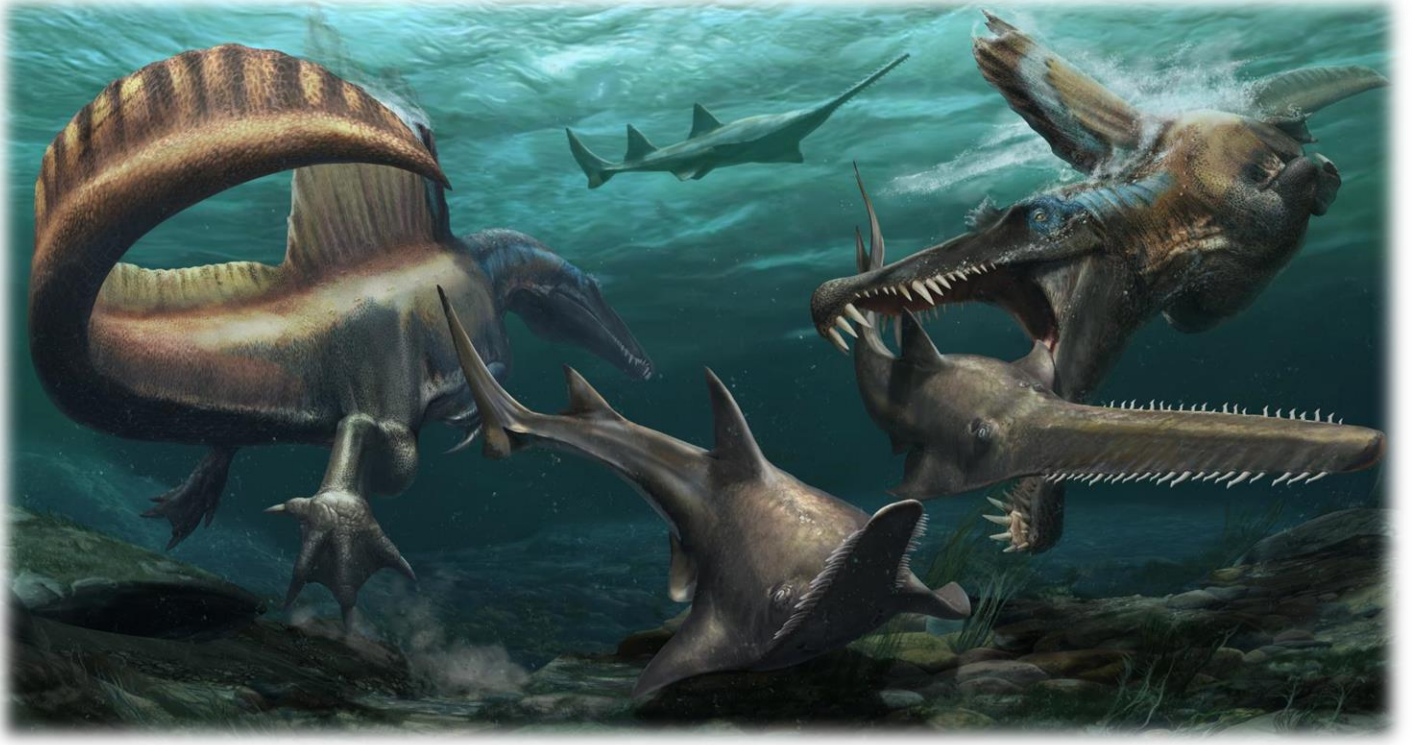
স্পাইনোসরাসের নতুন রূপ!

সমুদ্র জিত সাহা

মর্ত্যের সর্বকালের সবচেয়ে বড় হেঁটে চলা শিকারী প্রানী, টি-রেক্সের চেয়েও বড়, লম্বা কুমিড়ের মতো মুখ, ধারালো দাঁত ভরা, পিঠে বিশাল স্পাইন, আর কী লাগে একটা প্রানী কে ক্যুল হতে!?

এত কিছুর পরেও স্পাইনোসরাসের অঙ্ক ঠিক মিলছিলো না। এরা দু পায়ে হাঁটে? নাকি চার পায়ে? এ নিয়ে তর্কের তো শেষ নেই, এদের দেখতে কেমন তা নিয়েও ছিলো কনফিউশন। স্কাল পার্ফেক্টলি জলজ প্রানী শিকারে উপযুক্ত, লম্বা মুখ, উপরের দিকে নাসারন্ধ্র, নাকের সামনে প্রেশার ডিটেক্ট করার মতো সেন্সর, কুমিরের বৈশিষ্ট্য গুলো আরকি। কিন্তু দেহের গঠন অনুযায়ী পানিতে চলার অনুপোযুক্ত। এত কনফিউশনের একটাই কারণ, স্পাইনোসরাসের একমাত্র ভালো ফসিল যেটা ২য় বিশ্বযুদ্ধের বম্বিং এ নষ্ট হয়ে গেছে!!

স্পাইনোসরাস নিয়ে এত রহস্যের সমাধান পাওয়া গেল কয়েক মাস আগে, মরক্কোর সাহারা মরুভূমিতে পাওয়া গেল স্পাইনোসরাসের প্রায় পূর্ণাঙ্গ ফসিল। সেই ফসিলকে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি সাজিয়ে তৈরি করলো পরিপূর্ণ

স্পাইনোসরাসের মডেল। পাওয়া গেল এর আসল রুপ এবং সমাধান হলো সব কনফিউশনের। বলা বাহুল্য, জুরাসিক পার্ক সহ যাবতীয় জায়গায় এতোদিন “ভুল” স্পাইনোসরাস দেখানো হয়েছে।

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে সাজিয়ে পাওয়া স্পাইনোসরাসের লেজ।
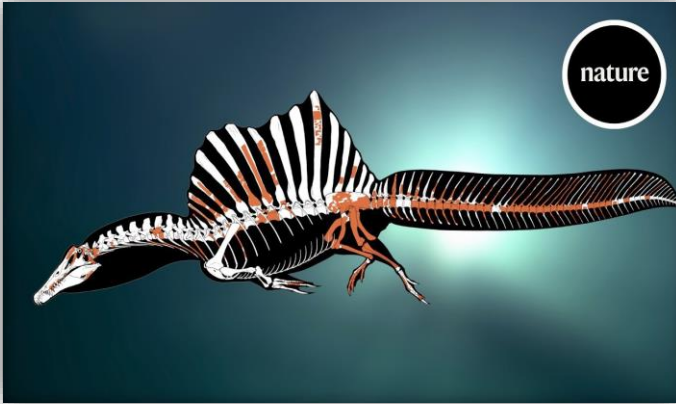
স্পাইনোসরের নতুন ফসিল থেকে রিকন্সট্রাকশন।

এবার আসি এই ফসিল কীভাবে সব সমস্যার সমাধান করল সেই আলাপে। হার্ভার্ডের বিজ্ঞানীরা এই লেজের মডেল সহ বিভিন্ন প্রকার লেজের মডেল বানিয়ে পানিতে সিম্যুলেট করে দেখলো কোনটা বেশি কাজের। ফলাফল, স্পাইনসরাসের এই অদ্ভুতদর্শন লেজ আর কুমিরের লেজ পানিতে সবচেয়ে এফিসিয়েন্ট।

হিসেব করে বোঝা গেল এই লেজ স্পাইনোসরাস কে পানিতে ভাসিয়ে, এমনকি দিব্যি সাঁতার কাটতে এবং মাছের মতো ফ্লেক্সিবিলিটি নিয়ে চলতে সাহায্য করতো।

আগে ভাবা হতো অগভীর পানিতে বা জলাশয়ের তীরে দাঁড়িয়ে জলজ প্রানী শিকার করে খেতো এরা। এখন বোঝা গেল গভীর পানিতে ঘন্টার পড় ঘন্টা সাঁতার কেটে শিকার করতেও কোন অসুবিধা হতোনা এদের।

আবার, কয় পায়ে চলতো এ নিয়েও রহস্যের সমাধান পাওয়া গেল। লেজের ওজন অনেক বেশি হওয়ায় পার্ফেক্টলি ব্যালান্স করে দুইপায়ে চলতে কোন সমস্যাই আর থাকল না।
সব শেষে পাওয়া গেল স্পাইনোসরাসের নতুন রুপঃ

কল্পনা করুন, পিঠের বিশাল সেইল আর ফ্লেক্সিবল লেজ দিয়ে সাঁতার কেটে পানির নিচে শিকার করছে এই সুবিশাল দানব!! এর চেয়ে ক্যুল জিনিস আর কিছু আছে নাকি!

বিবর্তন

নাঈম হোসেন ফারুকী

"এই লেখাটা বিবর্তন নিয়ে বিজ্ঞান কী ভাবে-তার উপর। আশা করি যাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার না তাদের আরেকটু ক্লিয়ার হবে।"
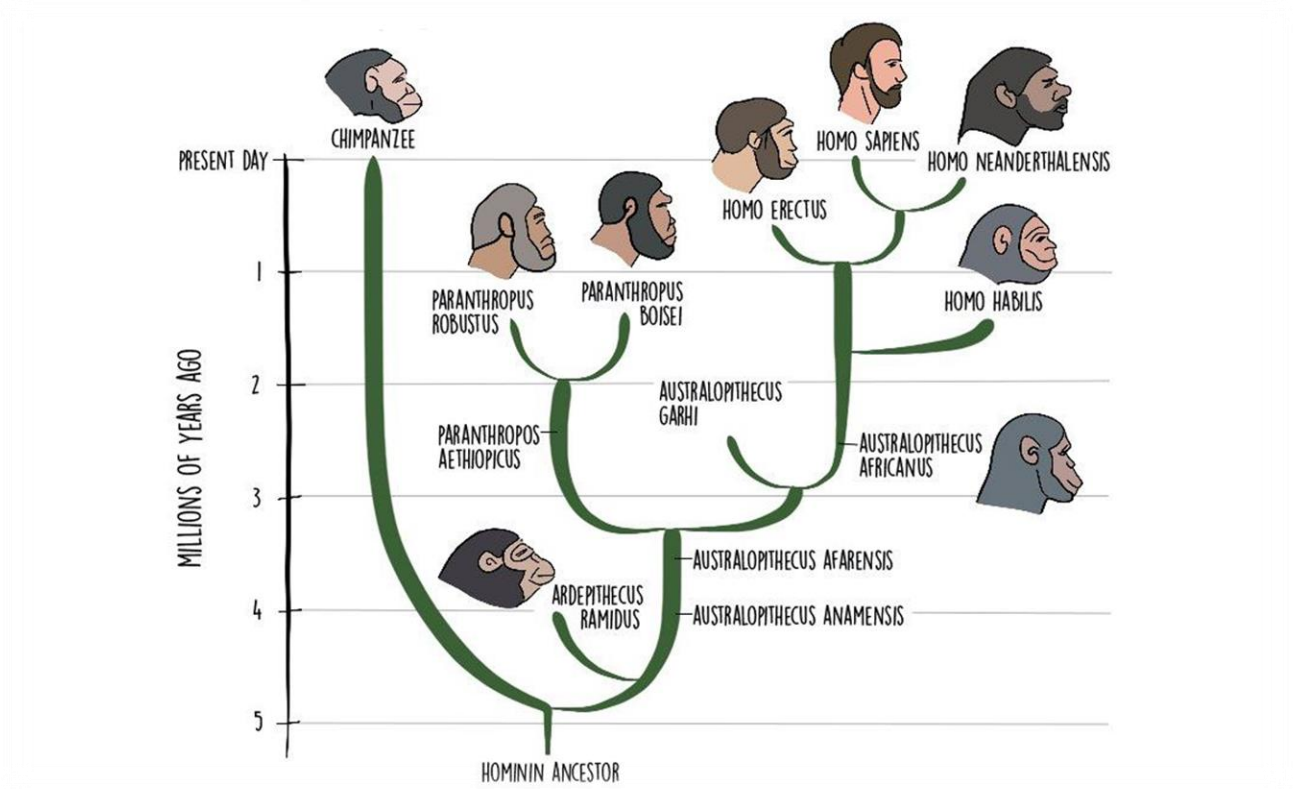
২-৪ কথায় বেসিক:

DNA নামে একটা জিনিস আছে শরীরের কোষে কোষে। ওইটায় A T C G এই ৪টা অক্ষরে লেখা আছে আপনার হাইট কেমন হবে, কালার কী হবে থেকে শুরু করে হাত কয়টা থাকবে, পা কয়টা থাকবে, চেহারা মানুষের মতো হবে নাকি বান্দরের মতো হবে-সবকিছু। আপনার DNA নিয়ে জিন এডিটিং যন্ত্রে এডিট করে যদি হাতের জায়গায় পাখার জিন ঢুকিয়ে দেই, আর লোমের পরিমাণ বাড়িয়ে দেই, তারপর সেই DNA দিয়ে বাচ্চা ফুটানোর চেষ্টা করি, সেই বাচ্চা দেখতে শুনতে পাখনাওয়ালা বান্দর টাইপ হবে।

যখন একটা থেকে আরেকটা DNA হয়, তখন DNA তে একটু একটু চেইঞ্জ হয়, একে Mutation বলে। আপনার শরীরের DNA চেইঞ্জ হয়ে লাভ হবে না, Already আপনার হাত গজিয়ে গেছে, চাইলেও পাখনা গজাতে পারবেন না এখন, পাখনা গজাতে হলে আপনার Sperm/Ovum কোষে অথবা Zygote- এ চেইঞ্জ করতে হবে।

মিউটেশন রেগুলার হচ্ছে, সব জায়গায় হচ্ছে, যেই মিউটেশনগুলো হাত-পা গজানোর আগেই হয় সেগুলো বাচ্চার কাজে লাগে।

আসেন চেইঞ্জ দেখি :

ধরি, হাত-পা এর জন্য জিন AATTCCGG, পাখনার জন্য জিন AACCTTGG ।

যদি এই Sequence এ চেইঞ্জ হয়

AATTCCGG > AATCCCGG > AACCCCGG > AACCTTGG

BINGO! পাখনাওয়ালা বাচ্চা পাওয়া গেছে। ।

ওয়েট, ব্যাপারটা যদি এতই সহজ হয় পাখনাওয়ালা বাচ্চা হচ্ছে না কেন? আসেন কাজের কথায় আসি।

প্রকৃতিতে মিউটেশন জিনিসটা পুরোপুরি র‍্যান্ডম। চেইঞ্জ করে কী হবে তার উপর এমনিতে কারো হাত নেই। তবে জিন এডিট করে ল্যাবরেটরিতে মিউটেশন ঘটানো যায়- একে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলে। আলো দেওয়া তামাক গাছ, অসংখ্য ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়া জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে প্রতি বছর তৈরি হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হলো, জিন এডিট না করে, র‍্যান্ডম চেইঞ্জ হয়ে প্রকৃতিতে আলো দেওয়া তামাক গাছ হওয়া সম্ভব কি না?

দুইটা কেস স্টাডিতে আসি :-

১. ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা। এই ধান জিনিসটা পুরোপুরি মানুষের হাতে তৈরি, আগে এই জিনিস ছিলই না। সারাদিন কাজ করে এসে মানুষ বসে বসে ঘাসের চিকন চিকন দানা চিবাতো। তো, ব্যাপার হচ্ছে কী, মানুষ বরাবরই একটু ক্লেভার, যাকে বলে চালাক আর কী। মানুষ দেখল কী, মাঝে মাঝে কিছু ধান হয় যেগুলোর দানা অন্য ধানের চেয়ে একটু বেশি মোটা। সে করলকী, এই মোটাসোটা ধানগুলোর মধ্যে ব্রিডিং করালো। হাজার হাজার বছর ধরে ধান একটু একটু করে মোটা হলো, টেস্টি হলো, তারপর অবশেষে আসলো নাজিরাবাজারের হাজির বিরিয়ানি (খুব একটা মজা না, তেল অনেক)। এই প্রক্রিয়ার নাম হিউম্যান অ্যাসিস্টেড ইভোল্যুশন। এর সিলেকশনের ক্রাইটেরিয়া : মোটা টেস্টি ধান।

২.৬৫ কোটি বছর আগের কথা, বড় বড় ডাইনোসরদের জ্বালায় ছোট ছোট অনেক ডাইনোসর টিকতে পারছিল না, খুব দুঃখে কষ্টে দিন কাটাচ্ছিল। তো হলো কী, একদিন এদের কোনো একটা বাচ্চার হাত একটু চওড়া হলো। ব্যাপারটা পুরোপুরি র‍্যান্ডম, হাত-পা ছাড়া বাচ্চাও মাঝে মাঝে হয়, এরা টিকতে পারে না, শিকার হয়ে যায়, তাই এদের DNA পরের জেনারেশনে আসতে পারে না। এই প্রবলেম আমাদের চওড়া হাতওয়ালা বাচ্চাটার নেই। সে টিকে গেল, মেবি ছোটবেলায় ক্লাসমেটদের একটু টিটকারি সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু বড় হয়ে ভালো GF ও পেয়ে গেল। এর জিন নেক্সট জেনারেশনে পৌঁছে গেল । ডট ডট ডট, ডট ডট ডট, লাখ লাখ বছর পরের কথা। পাখনা ওয়ালা ডাইনোসর- হাল আমলের ক্রেইজ। পাখা না থাকলে কেউ দাম দেয় না, ভালো গফ মিলে না, অনেক কষ্ট।

জন্ম হলো ARCHEOPTERIX এর। এই প্রক্রিয়ার নাম: Natural selection. ক্রাইটেরিয়া : বাচ্চা না দেওয়া পর্যন্ত বাঁচতে হবে ; Survive until you breed.

বুঝা গেল কিছু?

পারমিউটেশন এবং বিবর্তন:

ইদানীং বিবর্তন নিয়ে কিছু গণিতবিদ পার্মিউটেশনের কচকচানি দিচ্ছে, তার জবাবে কিছু কথা-

মনে করো, তোমার কাছে ৬০০ অংকের একটা লকার আছে। শুধুমাত্র ৬০০টা ৭ হলেই ওই লকারটা খোলে। র‍্যান্ডম সংখ্যা থেকে শুরু করে প্রতিবার যদি দুইটা অংক চেইঞ্জ করি, ৬০০ টা সাত আসবে কোনোদিন? মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে, তবু আসবে না।

এইবার ধরুন, এই সিস্টেমে একটু চেইঞ্জ করি। আমরা শুরুতে একটা ইচ্ছামতো সংখ্যা নেব। সেটার দশটা করে কপি করব।

যেই কপিতে সাতের সংখ্যা অরিজিনাল কপির চেয়ে বেশি হবে শুধু সেগুলো রাখব। বাকিগুলো ফেলে দেবো।

এবার দেখবেন, ৬০০ টা সাত আসতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

বিবর্তন হয় মিউটেশন থেকে। মিউটেশন র‍্যান্ডম। ভালো বাচ্চা হবে, কানা- খোঁড়া- ল্যাংড়া- সব বাচ্চাই হবে। যাদের জিন উল্টা-পাল্টা, সম্ভাবনা আছে তারা শীঘ্রই মারা পবে।

মেরু অঞ্চলে মিউটেশন হয়ে যে ভাল্লুকের কালো লোম হবে সে হয়তো না খেয়ে মরবে, শিকার ধরার আগেই বহুদূর থেকে শিকার তাকে দেখে পালাবে। যে ভাল্লুকের লোম খুব কম হবে সে মরবে ঠাণ্ডায় জমে। টিকবে খালি হালকা রঙের পুরু লোম যাদের- তারা।

কোনো ফিল্টার না থাকলে বিবর্তন আসলেই অসম্ভব হতো, কিন্তু ফিল্টার আছে একটা। সেটা হচ্ছে, বাচ্চা দেওয়া পর্যন্ত বাঁচতে হবে।

FAQ

1. এতকিছুর প্রমাণ কী?

উ: আরেকদিন লিখব, লিঙ্ক দিচ্ছি পড়ে দেখতে পারেন।

2. মানুষ বান্দর থেকে এসেছে?

উ: না ভাই, এগুলো অনেকে ইন্টারনেট মিম পড়ে বই লিখে ফেলেছে, সেই বই থেকে বাকিরা শিখেছে। বিবর্তন মতে, মানুষ আর বান্দরের কমন পূর্বপুরুষ ছিল। একজাতের বনমানুষ থেকে এসেছে বলা যায়।

3. এখন বিবর্তন হয় না কেন?

উ: কে বলেছে হয় না? বিবর্তন পুরোপুরি র‍্যান্ডম আর খুব স্লো, এখনকার মানুষের সাথে ৬ লাখ বছর আগের মানুষ কম্পেয়ার করেন, টের পাবেন চেইঞ্জ হচ্ছে কিনা।

4. বনমানুষ থেকে আর মানুষ হয় না কেন ?

উ: মানুষ হতে হবে কে বলেছে? সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে টিকতে হবে, ব্যাস। নিয়মিত র‍্যান্ডম চেইঞ্জ হচ্ছে, যে বনমানুষ থেকে মানুষ হয়েছে সে নিজেও এখন বিলুপ্ত, একই চেইঞ্জ আরেকবার হওয়ার কোনো চান্সই নেই।

কেন চান্স নেই বুঝিয়ে বলি। ধরেন, অনেক লম্বা একটা কোড আছে মানুষের, এক কোটি লেটারের। ধরলাম সব মানুষ খুব কাছাকাছি, 4^10000000 পারমিউটেশনের খুব অল্প কিছু পারমিউটেশনে মানুষ হয়। যে বনমানুষ থেকে চেইঞ্জ হয়ে মানুষ হয়েছে সে আর নেই, একই চেইঞ্জ হয়ে আবার মানুষ তৈরি হওয়া খুবই খুবই অসম্ভব। আবার বুঝেন, আমি কিন্তু বলিনি আর বুদ্ধিমান প্রাণী হবে না, মানুষের চেয়েও বুদ্ধিমান প্রাণী হতে পারে, কিন্তু মানুষ একবার হারিয়ে গেলে প্রাকৃতিকভাবে আর ফিরে আসবে না (৭ বিলিয়ন মানুষ আছে, এত চিন্তা না করলেও হবে, বাঘ নিয়ে চিন্তা করেন)।

5. প্রথম মানুষ কে ছিল?

উ: নিচের ছবিটা দেখুন।

ঠিক কোন পয়েন্টে আপনি “প্রথম কালো” বলবেন? নদীর মতো জিনিস। ৮ নম্বরটি পড়ুন।

6. গলা লম্বা করতে থাকলে কি কয়েক জেনারেশন পরে লম্বা গলা হয়ে যাবে?

উ: না। Lamark মিউটেশন সম্পর্কে জানত না।

7. এত কমপ্লেক্স জিনিস তৈরি হয় কীভাবে? মানুষের চক্ষু কর্ণ মস্তিষ্কের Complexity জানেন?

উ: চোখের কথায় আসি। অনেক অনেক দিন আগে, কোনো একটা এককোষী প্রাণীতে ছিল ছোট্ট একটা লাইট সেন্সর। এই জিনিসটা দিয়ে সে শিকার করত, চলত, ফিরত। রঙ বুঝত না, শেপ চিনত না, Just আলো অন্ধকারের পার্থক্য বুঝত। তার বাচ্চা হলো। বাচ্চা হওয়ার সময় কী হলো বলেন তো?

ঠিক ধরেছেন, Mutation হলো। Mutation হয়ে কানা বাচ্চা জন্ম হলো। এই বাচ্চাটা আর কোনো বাচ্চা দেওয়ার আগেই মারা পড়ল। গুড নিউজ হলো, কানা বাচ্চার জিন নেক্সট জেনারেশনে আসতে পারল না।

বুঝতে পারছেন কিছু? ডট ডট ডট, ডট ডট ডট, খারাপ বাচ্চা হয়, মারা পরে। আরেকটু ভালো চোখওয়ালা বাচ্চা হয়, টিকে যায়। লেন্স ওয়ালা বাচ্চা? Chance কম। ধরলাম ৬ লক্ষ জেনারেশনে একটা হয়। হয়ে গেলে পরে? লেন্স ছাড়া ভাইবোন টিকতে পারবে ওর সাথে? GF মিলবে?

লেন্স আসলো, রেটিনায় তৈরি হলো কালার সেন্সর, সরল চোখ আস্তে আস্তে জটিল হলো।

সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া একটাই : SURVIVE UNTIL YOU BREED.

Human Evolution
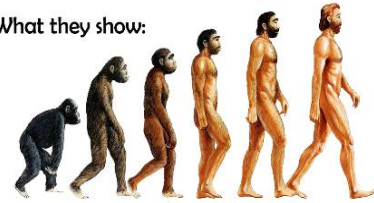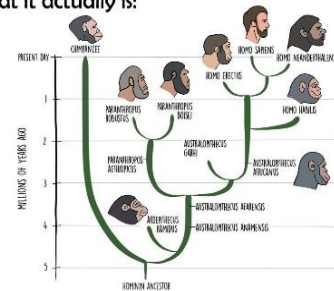
সমুদ্র জিত সাহা

8. নতুন প্রজাতি কখন হয়? হওয়া দেখি না কেন? এখন কেন নতুন প্রজাতি হচ্ছে না?

উ: এই অংশটুকু Dawkins এর Magic of Reality বই থেকে নেওয়া।

শুরু করিঃ

একটা হাইপোথেটিক্যাল ছবির অ্যালবামের গল্প। এই অ্যালবামে ছবি stack করা থাকে। সবচেয়ে নিচে আপনার ছবি, তার উপরে আপনার বাবার ছবি, তার উপরে তার বাবা কিংবা মায়ের, So on and on. এই অ্যালবামের যেকোনো একটা ছবি তুলে নিন। তার উপরের, নিচের, আগের পরের ছবিগুলো মোটামুটি একই রকমের হবে। মানুষের বাচ্চা মানুষ, বানরের বাচ্চা বানর। থুক্কু বনমানুষের বাচ্চা বনমানুষ। তাহলে বিবর্তন হচ্ছে কোথায়?

ব্যাখ্যা করি : আপনার সাথে আপনার বাবার চেহারার মিল অনেক, ২ জনই মানুষ, কোনোই সন্দেহ নেই। আরও আগে আসি, আপনার দাদা, তার দাদা- এভাবে যেতে যেতে আপনার ৪০০০ তম পরদাদার ছবিটা বের করেন। ২৫ বছরে এক জেনারেশন হলে এই ভদ্রলোক বাস করতেন এক লক্ষ বছর আগে। এই ভদ্রলোকও কি মানুষ? খুলিটা তার একটু মোটা, চোখের ভ্রুগুলো বেশ Different, কিন্তু এই ভদ্রলোককে এনে এখনকার মানুষের সাথে বিয়ে দেন, যে বাচ্চা হবে সেই বাচ্চারও বাচ্চা হওয়ার ভালো Chance আছে। ইনিও মানুষ।

আরও আগে যাই। আপনার ৫০০০০ তম পরদাদার দেশে। এই লোক, ইয়েতি হতে পারে, বিগফুট হতে পারে-/, কিন্তু আর যাই হোক,/- মানুষ না। এর সাথে আধুনিক মানুষের বিয়ে হলে যে বাচ্চা হবে তার বাচ্চা হবে না। এই লোকের প্রজাতি Different. এর নাম *Homo Erectus*.

এই কথা অর্থহীন যে, আস্তে আস্তে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ মানুষ বলে কিছু নেই। নদীর মতো ব্যাপার।

9. যদি মাছ থেকে অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী এসে থাকে তাহলে এখনও মাছ আছে কীভাবে?

উ: এমন কোনো শর্ত নাই যে, মানুষ বাঁচতে হলে মাছকে মরতে হবে। Mr. ফিশ এর ২টা বাচ্চা ছিল। একটার পা গজিয়েমাটিতে গেল, আরেকটা বংশের ঐতিহ্য বজায় রেখে পানিতে বাস করতে থাকল।

10. মিসিং লিঙ্ক কোথায়?

উ: আট নম্বর পয়েন্টে বলেছি। ফাঁকে ফাঁকে অনেক ফসিল আছে। নদীর মতো জিনিস।

রেফারেন্স

ঘুমন্ত ইতিহাস

মো. এ আর মুবিন

৪৫৪.৩ কোটি বছরের প্রাচীন এই পৃথিবীটা। আমাদের হোমো স্যাপিয়েন্সদের উদ্ভব যেখানে মাত্র ২ লক্ষ বছর আগে। মহাকালের স্কেলে চোখের একটা পলক ফেলার মতো সময়ও তো এটা না। এর আগে কোটি কোটি বছর ধরে কত কত দানব জল স্থল কাঁপিয়ে পৃথিবীতে রাজত্ব করে গেছেন। আর রেখে গেছেন পৃথিবীর পরতে পরতে ঘুমিয়ে থাকা শতকোটি বছরের রোমাঞ্চকর ইতিহাস।

কালের মহাপ্রলয়ে সেই ইতিহাসের অধিকাংশই আজ বিস্মৃত। তবুও মাঝেমধ্যে মহাকালের চাদর ফুঁড়ে কিছু বুদবুদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, আর আমরা সেগুলোকে জিগস্ পাজলের মতো সাজিয়ে সেই পুরাকাহিনী উদ্ধারের চেষ্টা করে যাই। আমাদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি এবং মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে আমরা যেটুকু জানছি সেটাও নেহাত কম কিছু তো নয়।

এই ইতিহাসের বিশাল একটা অংশ জুড়ে রয়েছেন ডাইনোসরেরা। পৃথিবীতে বৈচিত্র্য আনয়নে এবং আমাদের অস্তিত্বের পেছনেও উনাদের অবদান অনস্বীকার্য। তাই আজ আমি পার্সোনালি উনাদের রেস্পেক্ট করে কথা বলব, আশা করি এতে কেউ মাইন্ড করবেন না।

ডাইনোসর-

আজ থেকে প্রায় ২০ কোটি বছর আগে পৃথিবীটা বৈরী হয়ে ওঠে। শুরু হয় ট্রায়াসিক-জুরাসিক ধ্বংসযজ্ঞ। এর নির্দিষ্ট কারণ নিয়ে মতভেদ আছে। তবে কেউ কেউ মনে করেন বাইরে থেকে ছুটে আসা বিশাল কিছু অ্যাস্ট্রয়েড এর টুকরা এই ধ্বংসলীলার কারণ। তখন প্রায় ৮০% প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ট্রায়াসিক-জুরাসিক এক্সটিঙ্কশন-

সেই সময় কোনোভাবে সার্ভাইভ করে কিছু আর্কোসর টিকে যান। উনারা হলেন কুমির, আকাশ দানব টেরোসর এবং ডাঙায় বাস করা ডাইনোসর। পৃথিবীতে শুরু হয় উনাদের রাজত্ব। ট্রায়াসিক-জুরাসিক ধ্বংসস্তূপ ভেদ করে মাথা উঁচু করেন আর্কোসরের এই উত্তরাধিকারীরা। উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে থাকেন, সাথে বাড়তে থাকে শরীরের আকার। ক্রমে হয়ে উঠেন "ডাইনোসর"।
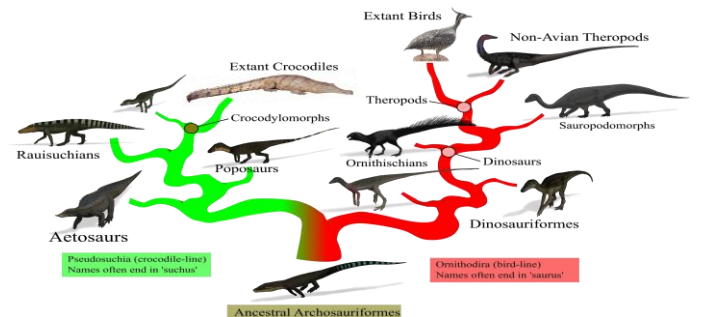
আর্কোসরদের বিভিন্ন ক্যাটাগরি-

পরবর্তীতে এই ডাইনোসরগণ দুটি প্রধান ক্যাটাগরিতে ভাগ হয়ে যান। উনাদের মধ্যে লম্বা গলার ডাইনোসরদের ডাকা হয় সরোপড। আর খাটো গলার ডাইনোসরদের ডাকা হয় থেরোপড। সরোপড থেরোপড ছাড়াও আরো অনেক "গণ" এর ডাইনোসর ছিলেন। আজকের লেখাটা শুধু সরোপডদের নিয়ে। যাদের এখন পর্যন্ত ২৭২ টি ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি পাওয়া গেছে।

সরোপড "গণ" এর একজন আর্জেন্টিনোসরাস ডাইনোসর-

থেরোপড "গণ" এর একজন টি-রেক্স ডাইনোসর-

শারীরিক গঠন:
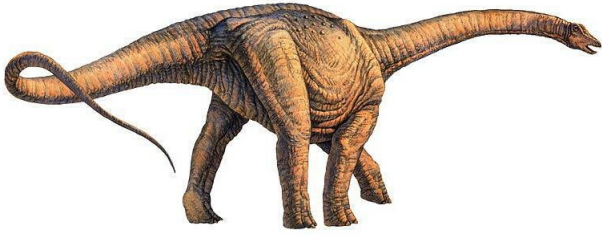
সরোপডগণ ছিলেন আজ পর্যন্ত ডাঙায় বিচরণ করা প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা, সবচেয়ে উঁচু এবং সবচেয়ে ভারী। প্রজাতিভেদে লম্বায় ১৩০ ফুট পর্যন্ত বাড়তেন। যেখানে বর্তমানে জীবিত দীর্ঘতম স্থলচারী রেটিকুলেটেড অজগর লম্বা হয় মাত্র ২২.৮ ফুট! সরোপডগণের উচ্চতা ছিল ৬০ ফুট পর্যন্ত। এবং ওজনে ১২০ মেট্রিক টন পর্যন্ত ভারী ছিলেন। যেখানে এখনকার সবচেয়ে বড় স্থলচারী প্রাণী বুশ এলিফেন্টের ওজন ১০.৪ মেট্রিক টন এর বেশি নয়!

একজন মানুষের সাথে বিখ্যাত সরোপডগণের দৈহিক তুলনা-

উনাদের গলা ছিল সবচেয়ে উঁচু গাছগুলোর চাইতেও উঁচু যা ৪৯ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতো। যেখানে আজকের জিরাফের গলার উচ্চতা সর্বোচ্চ ১৬-১৮ ফুট। লম্বা গলা হওয়ার কারণে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য লেজটাও অনেক লম্বা হতো। লেজে অতিরিক্ত এক থেকে তিনটি পুচ্ছ কশেরুকা ছিল। শত্রুকে নিরস্ত করতে উনারা লেজকে চাবুকের মতো ব্যবহার করতেন।
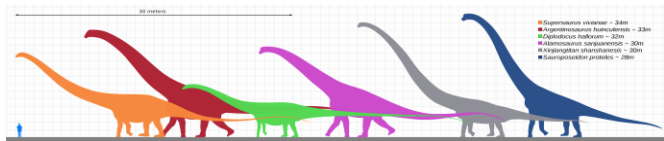
কিছু সরোপডগণের ঘাড়ে ১৯ টি পর্যন্ত গ্রীবা কশেরুকা ছিল, যেখানে প্রায় সব স্তন্যপায়ীদের গ্রীবা কশেরুকা মাত্র ৭ টি। ঘাড়ের ওজন কমানোর জন্য কশেরুকাগুলো দীর্ঘ ও ফাঁপা ছিল। ফলে উনারা শ্বাসনালী দিয়ে প্রচুর অক্সিজেন নিতে পারতেন। কশেরুকাগুলোর সারি নীল তিমির চেয়েও লম্বা ছিল। আর ছিল কয়েকটা পাঁজর। উরু থেকে পা ছিল পাঁচ ফুট লম্বা। সরোপডগণ ঘাড় বাঁকাতে পারতেন কি না জানা যায়নি।
জিরাফ ও অন্যান্য বর্তমান প্রাণীর কশেরুকা (বামে)।
এবং সরোপডগণের কশেরুকা (ডানে)
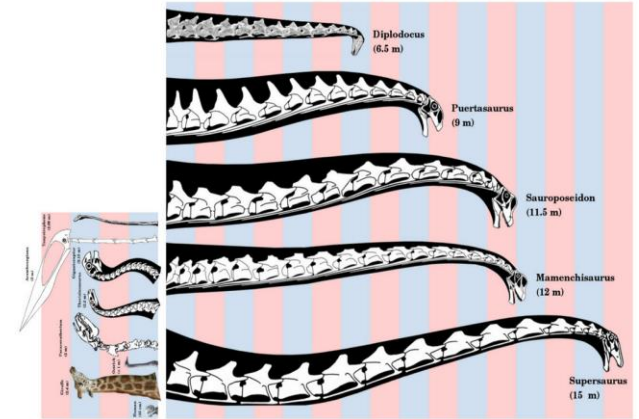
বড় দেহ থেকে বিপাক ক্রিয়ায় উৎপন্ন তাপ বিকিরণ করার জন্যে লম্বা ঘাড় রেডিয়েটরের মতো কাজ করত। আবার দীর্ঘ ঘাড়ের কারণে ধমনী ও শিরার মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছার আগে রক্তও যথেষ্ট শীতল হয়ে যেত। মাথা ছিল শরীরের তুলনায় অনেক ছোট। মাথার দুপাশে দুটো চোখ ছিল। অনেক সরোপডদের বড় নাক ছিল, এর ডগায় একটা করে শিং থাকত, অনেকটা গণ্ডারের শিং এর মতো যা শত্রুর থেকে আত্মরক্ষায় কাজ দিত। অবশ্য সরোপডদের আত্মরক্ষার প্রধান সুবিধা ছিল উনাদের বিশাল আয়তন। উনাদের মুখের উপরের দিকটা সামনে ঝুঁকে এসে চঞ্চুর মতো আকৃতি নিয়েছিল।

সরোপডদের মধ্যে দুই ধরণের দাঁত দেখা যায়। পেন্সিলের মতো সূচালো শেইপ (peg-like tooth)।
এবং পাতার মতো শেইপ (spatulate tooth)। একে চমসাকার শেইপও বলা যায়।

উনাদের দাঁত খুব একটা শক্তিশালী ছিল না।
দাঁত পড়ে গেলে প্রজাতিভেদে ১৪ থেকে ৬২ দিনের মধ্যে নতুন দাঁত গজাত।

সরোপডদের সূচালো দাঁত-

(peg-like tooth)

সরোপডদের চমসাকার দাঁত-

(spatulate tooth)

সরোপডরা মোটা খাম্বার মতো চারটি পা দিয়ে ঘণ্টায় ৭ কিলোমিটার বেগে চলতে পারতেন। পেছনের পা দুটো ছিল ভারী এবং শক্তিশালী। বেশিরভাগ প্রজাতির পেছনের পায়ের তিনটি আঙুলে নখর ছিল। সে তুলনায় সামনের পা ছোট ছিল এবং আঙ্গুলের হাড়গুলোও চিকন ছিল।

একটি সরোপডের পেছনের পায়ের হাড়-

প্রাথমিকভাবে দুপেয়ে হলেও দেহের ভর বেড়ে ওঠার সাথে সাথে সরোপডরা হাতির মতো অভিকর্ষানুবর্তী চতুষ্পদ দেহগঠন লাভ করেন, অর্থাৎ গমনের সময় উনাদের চারটে পা-ই সব সময় দেহের ঠিক নিচে অবস্থান করে অল্প অল্প করে সামনে এগিয়ে যেত। ফলে উনারা স্থায়ীভাবে অত্যন্ত ধীর হয়ে যান। অস্ট্রেলিয়ার কিম্বার্লি অঞ্চলের ওয়ালমাদানিতে সরোপডের প্রায় ৫.৫ ফুট দীর্ঘ পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে যা এখন পর্যন্ত যেকোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ।

ওয়ালমাদানিতে পাওয়া সরোপডের পায়ের ছাপ-

ট্রায়াসিক যুগ চলছে। বর্তমান আর্জেন্টিনার আউকা মাহুয়েভোর বালিতে পা দিয়ে গর্ত খুঁড়ে ৪০ টি ডিম পেড়েছেন এক স্ত্রী সরোপড। তারপর ডিমগুলো গাছপালা আর আবর্জনা দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। ডিমগুলো উটপাখির ডিমের চেয়ে একটু বড়। ভেতরে ৫.৫ লিটার মালমশলা আছে। এই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুতে ৬৫ থেকে ৮২ দিন অপেক্ষা করতে হবে। সময় কেটে যায়। ডিম ফুটে বেরিয়ে আসে এক মিটারের মতো লম্বা আর পাঁচ কেজি ওজনের সমান বাচ্চা সরোপড।
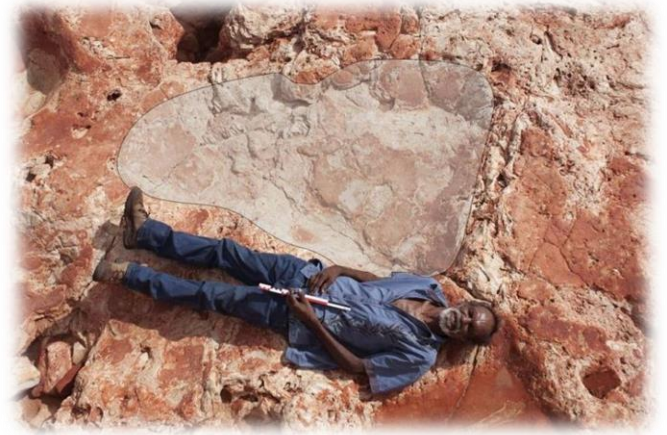
সরোপডের ডিম-

ওদের জন্য অপেক্ষা করছে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর এক পৃথিবী। আকাশে বিশাল ডানা মেলে উড়তে থাকা চতুর টেরোসরদের লোভাতুর দৃষ্টি বাচ্চা সরোপডগুলির দিকে। মাটিতে চল্লিশ ফুট লম্বা ম্যাপাসুরাস মাঝেমধ্যেই উঁকি মারে, সে জানে, সরোপডের বাচ্চার রোস্ট কত টেস্টি। মা সরোপড সন্তানদের বুকে আগলে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু লাভ হয় না, মাটিতে শত্রু, আকাশে শত্রু। কয়টাকে ঠেকাবেন তিনি? এরকম নানা প্রতিকূলতা জয় করে ভাগ্যের ফেরে শেষমেশ গড়ে একটা বাচ্চা টিকে থাকে। দেখা যাক তার বেঁচে থাকার জন্য কী কী মৌলিক চাহিদা লাগবে...

সরোপডদের মৌলিক চাহিদা:

খাদ্যঃ

বেঁচে থাকার জন্য প্রধান মৌলিক চাহিদা হলো খাদ্য। পাঁচ কেজি সাইজের একটা বাচ্চা থেকে মাত্র ত্রিশ বছর বয়সেই ৬ হাজার গুণ বেড়ে একেকটা সরোপড প্রকাণ্ড হয়ে যেতেন। ইতিহাসে কখনো অন্য কোনো প্রাণীর শরীরে এত দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেনি। প্রথম ২০ বছর প্রতি বছর অন্তর উনাদের শরীর ২ টন করে বৃদ্ধি পেত। প্রাপ্তবয়স্ক হতে হতেই চল্লিশ বছর কেটে যেত। ভাবা যায়?

সরোপডরা মূলত ছিলেন তৃণভোজী। শেকড় থেকে শুরু করে উঁচু মগডালের পাতা, কোমল তৃণলতা থেকে শুরু করে শক্ত গাছ, কোনোকিছুই উনাদের খাদ্যতালিকা থেকে বাদ যেত না। প্রধান খাদ্য ছিল কনিফার। ছিল ক্লাব মস নামের একধরনের শ্যাওলা, গিঙ্গোর ঝোপ। নানান জাতের আর রঙের ফার্ন যেমন ট্রি ফার্ন, লতানো ফার্ন, আগাছার মতো সাইকাসের গা বেয়ে গজিয়ে ওঠা ফার্ন। ঘোড়ার লেজের মতো দেখতে হর্সটেইলস। শেষ ক্রেটাসিয়াস পিরিয়ডে প্রথম গাছেরা ফুল ফল দিতে শুরু করে। তখন ফুলগাছ, মনিরাজ গাছ, বেনেট্টিট্যালস নামের একধরনের বীজওয়ালা উদ্ভিদ এগুলো উনাদের খাদ্যতালিকায় যোগ হয়।

সরোপডদের কিছু খাদ্য-

সরোপডদের প্রতিদিন এক লক্ষ ক্যালরি প্রয়োজন হতো। যা ৫০ টা চকোলেট কেক বা ২,৬২৭ টা আপেলের সমান। জীবাশ্মবিদরা মনে করেন উনারা গাছপালা না চিবিয়ে পুরোটা গিলে ফেলতেন, তারপর পেটের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এগুলো হজম হত।

পেষক দাঁতের বদলে উনাদের পাকস্থলীতে থাকত গ্যাস্ট্রোলিথ জাতীয় পাথর, যা আজকের যুগের পাখি ও কুমিরদের গিজার্ড পাথরের মতোই। খাদ্যকে পরিপাকের উপযোগী করে তোলাই ছিল এগুলোর কাজ।

গ্যাস্ট্রোলিথ জাতীয় পাথর-

প্রথমদিকের সরোপডরা খুব সম্ভবত সর্বভুক ছিলেন। তৃণভোজী খাদ্যাভ্যাসের বিবর্তন উনাদের লম্বা গলা ও দেহের আয়তনের বিবর্তনের সাথে তাল

মিলিয়ে চলছিল। সরোপডরা সমসাময়িক অন্যান্য তৃণভোজীদের চেয়ে বেশি উঁচুতে গলা বাড়িয়ে গাছের পাতা চিবোতে পারতেন।

বস্ত্রঃ

সরোপডদের বর্মের মতো শক্ত চামড়া ছিল। শুকনো এবং উষ্ণ চামড়ায় কোনো ঘামগ্রন্থি ছিল না। তার মানে উনারা ঘামতেন না। অনেকের চামড়ায় ছোট ছোট আঁশ ছিল যা উনাদের দেহকে সুরক্ষিত রাখত এবং ভেতর থেকে পানি বাষ্প হওয়া রোধ করত। এখনকার কুমিরের মতো পিঠের চামড়ার ভিতর হাড়ের মতো শক্ত পাত ছিল যাকে বলে অস্টিওডার্মস। এগুলো ছিল বিশাল আকারের হাড়গোড়কে রক্ষা করার জন্য এবং ডিম উৎপাদন করতে প্রয়োজনীয় খনিজ সংরক্ষণের জন্য। উনারা লেজের মধ্যেও চর্বি জমা রাখতেন।
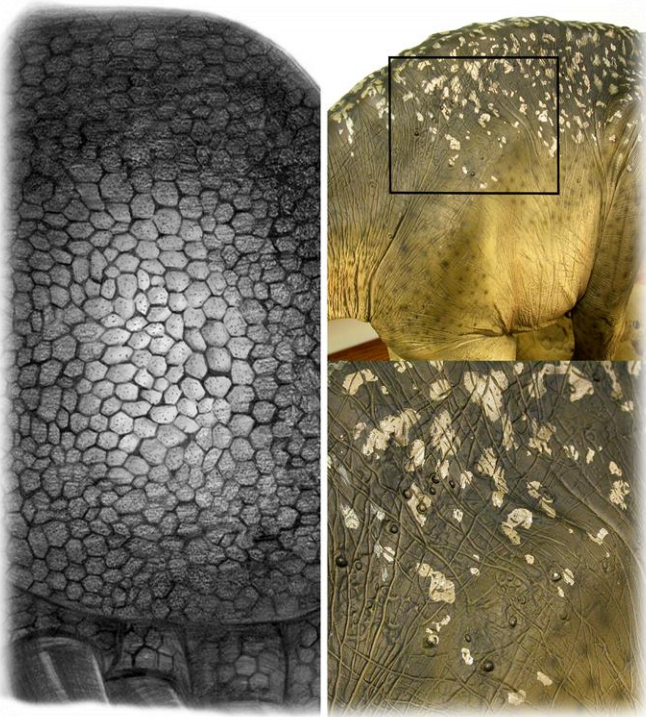
সরোপডদের বস্ত্র (চামড়া)-

বাসস্থানঃ

উনাদের আদি নিবাস ছিল প্রাচীন মহাদেশ প্যাঞ্জিয়ায়। সরোপডরা শুষ্ক অঞ্চলে থাকতেন। বাসা বানিয়ে সবাই মিলেমিশে একসাথে বাস করতেন। প্রায় ১৭ কোটি বছর আগে জুরাসিক যুগে প্যাঞ্জিয়া মহাদেশ ভেঙে লরেশিয়া ও গন্ডোয়ানা মহাদেশের জন্ম হয়। আর ক্রেটাসিয়াস যুগে সরোপডরা সারা পৃথিবীর স্থলভাগে ছড়িয়ে পড়েন। তাই আজও অ্যান্টার্কটিকা সহ পৃথিবীর প্রতিটি মহাদেশে উনাদের ফসিল পাওয়া যায়।

সরোপডগণ যেসব মহাদেশে বিচরণ করতেন-

শিক্ষাঃ
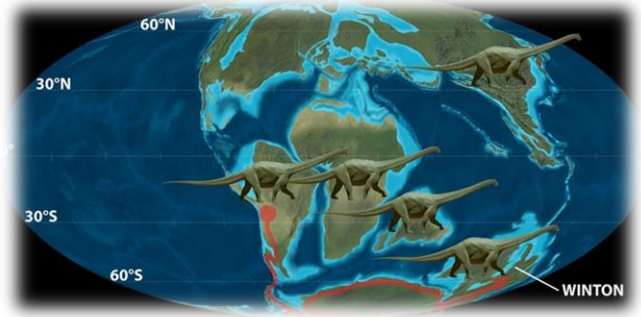
সরোপডেরা একতা, শৃঙ্খলা ও সহমর্মিতায় শিক্ষিত ছিলেন। সবসময় দল বেঁধে বনের মাঝে চষে বেড়াতেন। শত শত, এমনকি হাজার হাজার পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে যা প্রমাণ করে সরোপডেরা আধুনিক আমেরিকান বাইসন বা আফ্রিকান স্প্রিংবক হরিণের মতো বিশাল বিশাল দল নিয়ে চলাফেরা করতেন। সরোপডদের পায়ের ছাপের নিদর্শন প্রমাণ করে উনাদের একাধিক প্রজাতির সদস্যরা কখনও কখনও একই দলের অন্তর্ভুক্ত থাকতেন!

দলবদ্ধ জীবনযাত্রার কারণ হতে পারে আত্মরক্ষা, লম্বা জার্নি (পরিযায়ী পাখিদের মতো) অথবা শাবকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। অল্পবয়স্ক ডাইনোসরেরা যে অনেক ক্ষেত্রে আলাদা দল তৈরি করে থাকতেন তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। উদাহরণ হিসেবে মঙ্গোলিয়ায় প্রাপ্ত ২০ টি ১ থেকে ৭ বছর বয়স্ক সিনর্নিথোমিমাসের জীবাশ্মের কথা বলা যায়। উনারা কাদায় আটকা পড়ে মারা গিয়েছিলেন বলে ধারণা করা হয়।

টিম এডাল্ট সরোপডস এন্ড বেবি সরোপডস-

চিকিৎসাঃ
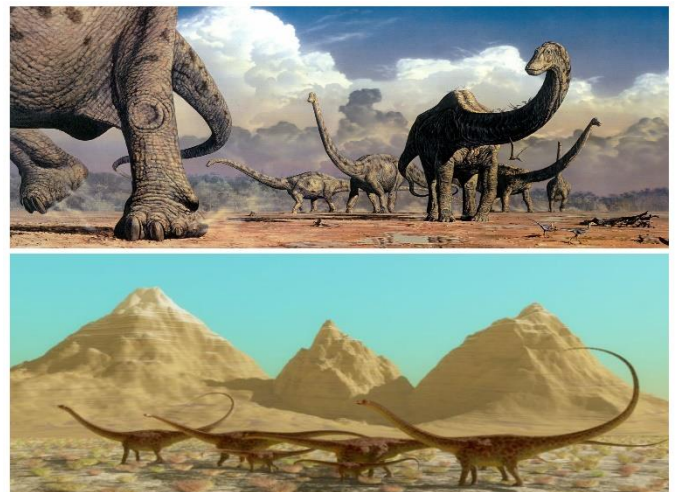
দুর্ভাগ্যবশত, সরোপডরা উনাদের ইমিউন সিস্টেমের যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল সেটা ছাড়া আর অন্য কোনো ট্রিটমেন্ট পাননি। উপরন্তু উনাদের উপর নানা রকম বিপদ আপদ এসে হানা দিচ্ছিল। ক্রেটাসিয়াস পিরিয়ডে মহাদেশগুলো বেশ কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বিচ্ছিন্ন মহাদেশগুলোর আবহাওয়ায় পরিবর্তন ঘটে। পৃথিবীর মহাদেশগুলো বিচ্ছিন্ন হওয়ার সাথে সাথে উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলও বিভক্ত হয়েছিল। ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশের আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্যও একই রকম ছিল না।

সাধারণ পরিবেশে যখন সুস্থ-সবল সরোপডরা বিচরণ করতেন, তখন উনাদের উপর ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসগুলো ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কিন্তু বৈরী পরিবেশের কারণে উনাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে গিয়েছিল।

তাছাড়া আবহাওয়াগত পরিবর্তনের কারণে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসদের আক্রমণ করার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সব মিলিয়ে সরোপডগণ দ্রুত রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ছিলেন।

তারপরও সরোপডদের বংশের প্রদীপ নিভুনিভু করে জ্বলছিল। কিন্তু প্রায় ৬ কোটি বছর আগে চিক্সুলাব নামের ১১ থেকে ৮১ কিলোমিটার ব্যাসের একটি উল্কা একশটা আণবিক বোমার সমান শক্তি নিয়ে পৃথিবীতে আঘাত করে। সেই আঘাতে মেক্সিকোর চিক্সুলাব অঞ্চলে ১৮০ কিলোমিটার চওড়া গর্ত তৈরি হয়। উল্কার ধ্বংসাবশেষে বায়ুমণ্ডল ছেয়ে যায়। সূর্যের আলো বাঁধা পড়ে যায় সেই কালো ছাইমেঘে। ফটোসিন্থেসিস এর অভাবে গাছগুলো মারা যায়। ফলে না খেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মারা যান তৃণভোজী সরোপডরা।
চিক্সুলাব তাণ্ডব
এবং মেক্সিকোতে ১৮০ কি.মি ব্যাসের সেই ক্ষত-

শেষে একটা ভালো খবর দেই, হাঁটু মোড়া অবস্থায় কিছু সরোপডের ফসিল পেয়ে এবং বর্তমান প্রাণীগুলির অভ্যাস পর্যালোচনা করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে সরোপডরা হাঁটু মুড়ে ঘুমাতেন। এভাবেই হাঁটু মুড়ে ঘুমন্ত ইতিহাসের বাঁকে অনন্তকাল শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকুক বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া সব জীববৈচিত্র্য। বিবর্তনের জোয়ার-ভাটায় প্রাণ হয়ে উঠুক আরো বৈচিত্র্যম। পৃথিবী হোক সমৃদ্ধ।

ছবি ও তথ্যের সোর্সসমূহ:

সমুদ্র জিত সাহা

বিবর্তন

বিবর্তনবাদের অ আ ক খ

প্রজেশ দত্ত, শাওন গুপ্ত

আমরা কীভাবে এলাম? মানুষ কীভাবে এসেছে? এসব অতি পুরাতন দার্শনিক প্রশ্ন। এইসব প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য আদিমযুগ থেকেই মানুষ চেষ্টা করে চলেছে। আগের দিনে দার্শনিকগণ বিভিন্ন মতামত উপস্থাপন করে যুক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করতেন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-পদ্ধতি আসার পর থেকে দার্শনিকগণের মনগড়া মতামত প্রদানের পথে বিজ্ঞান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিছু কিছু দার্শনিক শূন্য থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রাণ সৃষ্টির মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। লুই পাস্তুর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এই মতাদর্শকে ভুল প্রমাণ করেন; প্রাণের উৎপত্তি নিয়ে চর্চায় শুরু হয় বিজ্ঞানের প্রথম হস্তক্ষেপ। সেই সময় থেকে এখন অবধি প্রাণের উৎপত্তি নিয়ে প্রচুর চিন্তাভাবনা-গবেষণা হয়েছে, চলছে। আমরা আজ যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা প্রথম প্রাণের উৎপত্তি নিয়ে না। বরং প্রথম উৎপন্ন প্রাণ থেকে কিভাবে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে প্রাণবৈচিত্র্য পৃথিবীর বুকে প্রকাশিত হয়েছে তাই নিয়ে। পৃথিবীর বুকে এই প্রাণবৈচিত্র্যের বিকশিত হওয়া বিজ্ঞান যে তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখা করেছে সেটা হলো "বিবর্তন তত্ত্ব।" বিবর্তন নিয়ে কথা বলা শুরুর আগে একটা ভুল ধারণা দূর করা দরকার। তত্ত্ব কি প্রমাণিত?

তত্ত্বের দুইটা বৈশিষ্ট্য থাকে।

১) বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত সকল ঘটনা, তথ্য যা বর্তমানে ঘটছে, অতীতে ঘটেছে তা সফলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২) তত্ত্বের এমন কোনো ভবিষ্যৎবাণী থাকবে, যা খুঁজে পাওয়া যাবে অর্থাৎ সত্য প্রমাণিত হবে অথবা তত্ত্ব থেকে এমন কোনো উপায় বেরিয়ে আসবে যেনো গবেষণাগারে তা যাচাই করা যায়।
অন্তত এটা তো পরিষ্কার, তত্ত্ব মানে তার পক্ষে প্রমাণ আছে?

আমরা এইটুকু বলতে দ্বিধা করবো না যে, বিজ্ঞানের ইতিহাসে কোনো কনসেপ্টকে তত্ত্ব প্রমাণিত হওয়ার জন্য যত পরীক্ষা নিরীক্ষার জাল ছেদ করতে হয়েছে তাদের যে কোনো তত্ত্বের তুলনায় বিবর্তন কয়েকগুণ বেশি প্রমাণের জাল ছেদ করেছে। যদিও এখনো এই তত্ত্ব নিয়ে মানুষের মাঝে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। তাই বিজ্ঞানের জগতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও

মানুষের মাঝে আজও একটি বিতর্কিত তত্ত্ব এই বিবর্তনবাদ। বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী ও প্রজননবিদ্যা বিশেষজ্ঞ থেওডোসিয়াস ডবঝানস্কির মতে,
"Nothing in biology makes sense except the light of evolution."
বিবর্তন তত্ত্ব একটি মনমুগ্ধকর তত্ত্ব; কারণ এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে সক্ষম আমাদের সকলের মাথায় ঘুরপাক খাওয়া সেই প্রশ্নগুলো- "আমরা কে? আমরা কোথা থেকে এলাম? কিভাবে এলাম?" বিবর্তন তত্ত্ব বলে যে, পৃথিবীতে মানুষের উদ্ভব কোনো আচমকা ঘটনা নয় বরং প্রাকৃতিকভাবেই ঘটেছে পুরো ঘটনা। ঠিক এই কারণেই অনেকের কাছেই হয়তো এই তত্ত্বটি পছন্দনীয় নয়।

এই আর্টিকেলে আমরা সেটাই জানব কীভাবে আমরা প্রাকৃতিকভাবে এসেছি। সেটা জানার আগে আমরা জেনে নিই বিবর্তন আসলে কী। বিবর্তন হলো- প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে গাঠনিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে; এই পরিবর্তনগুলো আমরা প্রকৃতিতে দেখি তার অন্যতম প্রধান কারণ ন্যাচারাল সিলেকশন। আর যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দিয়ে এই বিবর্তন নামক বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হয় তাকে বিবর্তন তত্ত্ব বা Theory of Evolution বলে
তাহলে এবার প্রশ্ন- ন্যাচারাল সিলেকশন আদতে কী? ন্যাচারাল সিলেকশন হলো একটা চলমান প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো তার পপুলেশন তথা

জনগোষ্ঠীতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। একটা উদাহরণের মাধ্যমে ন্যাচারাল সিলেকশনের বিষয়টা ক্লিয়ার করা যাক।
একটা ছোট দ্বীপ। ভাসে-ডোবে। দিনে ১৫-১৬ ঘণ্টা পুরো দ্বীপ পানির নিচে ২ ফুট ডুবে থাকে। ফলে এই দ্বীপে থাকা গাছপালার মধ্যে দুটো বৈশিষ্ট্য থাকতেই হবে।

- গাছগুলো লবণাক্ত সহিষ্ণু হবে। সমুদ্রের পানির লবণ সহ্য করতে পারবে।
- একটু লম্বা হবে। যেন কাণ্ড, পাতা সমুদ্রের পানির উপরে বের হয়ে থাকে।

এই দুই বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ না হলে উদ্ভিদ টিকতে পারবে না ঐ দ্বীপে। অর্থাৎ উদ্ভিদগুলো বেশ লম্বা লম্বা, পাতা একটু উপরে।

একটা কচ্ছপ একগুচ্ছ ডিম পাড়ল। কিছু কিছু প্রজাতির কচ্ছপ ৩০ টা অবদি ডিম পাড়ে এক সাথে। তবে গড়ে ৬-১০ টা ডিম পাড়ে।

ধরে নিলাম, কচ্ছপটা ১০ টা
ডিম পাড়ল। জিনোটাইপের কারণে তিনটা ডিম থেকে জন্ম নেওয়া বাচ্চার গলা লম্বা। আর সাতটা বাচ্চার গলা খাটো। যে তিনটা বাচ্চার গলা লম্বা তারা সহজেই উঁচু, লম্বা গাছ থেকে পাতা খেতে পারবে। পুষ্টি পাবে, বেঁচে থাকবে। যে সাতটা বাচ্চার গলা খাটো তারা খেতে পারবে না- মরে যাবে। এভাবে চলতে থাকলে কী হবে? ঐ দ্বীপে একসময় লম্বা গলার কচ্ছপই দেখা যাবে শুধু। এরপর আস্তে আস্তে লম্বা গলার কচ্ছপের জিনোটাইপ বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত হবে। ফলে আরও কিছুদিন পর ঐ দ্বীপে জন্ম নেওয়া সব কচ্ছপের বাচ্চাই হবে লম্বা গলার। নতুন প্রজাতি। লম্বা গলার বড় কচ্ছপ।

ঐ ছোট্ট দ্বীপ থেকে কিছু দূরে আরেকটা দ্বীপ। ঐ দ্বীপ ৩০০ বছর ধরে জেগে আছে। পুরো দ্বীপ কখনোই সমুদ্রের নিচে তলিয়ে যায় না। ফলে এখানে ছোট বড় সব ধরনের উদ্ভিদই সমান তালে দেখা যায়, পাওয়া যায়। এখানে একটা কচ্ছপের সব বাচ্চাই খাদ্য পায়, টিকে থাকে।

তাহলে বিষয়টা কী হলো? প্রকৃতির হেঁয়ালির কারণে যখন এক দ্বীপে লম্বা গলার বড় কচ্ছপ প্রজাতি রাজত্ব করছে ঠিক তখনই অন্য দ্বীপে তাদের নিকটতম আত্মীয় খাটো গলার ছোট কচ্ছপগুলো খেলা করছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটা ডারউইনের সেই ন্যাচারাল সিলেকশন।

Fit enough to survive until breeding.
ঐ প্রথম দ্বীপের সকল কচ্ছপই মারা যেতে পারত খাদ্যাভাবে। কিন্তু পিতা-মাতার জিনোটাইপ থেকে সন্তানের জিনোটাইপে হঠাৎ এমন কী পরিবর্তন আসলো যে কচ্ছপের গাঠনিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হলো? লম্বা গলার বাচ্চা উৎপন্ন হলো? এর পেছনে কাজ করে মিউটেশন। মিউটেশন হয় তিন ধরণের:

- হার্মফুল মিউটেশন
- নিউট্রাল মিউটেশন
- বেনিফিশিয়াল মিউটেশন।

মিউটেশন ঘটে জিনপুলে যার ফলে একটি প্রাণী নতুন একটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। এটাকে বলে অভিযোজন (Adaption)। এই বৈশিষ্ট্য যদি পরবর্তী প্রজন্মে যাওয়ার পর তারাও সফল ভাবে তাদের পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত করাতে পারে তবে সেটা বেনিফিশিয়াল মিউটেশন বলে গণ্য হবে। এরকম নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে অনেকগুলো প্রজন্ম পার হয়ে গেলে তারা তাদের পূর্বসূরীদের থেকে আলাদা হয়ে নতুন গাঠনিক বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটাবে। এই যে নতুন বৈশিষ্ট্য লাভ করল- এটা যদি তাদের প্রকৃতিতে বেঁচে থাকতে, খাদ্য খুঁজতে, বিভিন্ন রোগবালাই থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে অন্যদের থেকে বেশি কার্যকর হয় আর এই বৈশিষ্ট্য যদি সে আর তার পরবর্তী প্রজন্মগুলো সফলভাবে তাদের পরবর্তী প্রজন্মগুলোতে প্রবাহিত করতে পারে- তখন তারাই প্রকৃতিতে তার পূর্ববতী প্রজন্মের থেকে অধিক যোগ্য বলে গণ্য হবে, অধিক যোগ্য বলে তাদের প্রকৃতির

সাথে খাপ খাওয়াতে সুবিধা হবে। অর্থাৎ তারা প্রাকৃতিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে গণ্য হবে।
আর মিউটেশনের ফলে নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির পর যদি সেটা পরবর্তী প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত করাতে না পারে তাহলে সেটাকে নিউট্রাল মিউটেশন হিসেবে গণ্য করা হয়। আর প্রাণীর মধ্যে মিউটেশনের কারণে বিভিন্ন জেনেটিক ডিসঅর্ডার ঘটে থাকে, যেমন- ক্যান্সার। এটা হার্মফুল মিউটেশনের উদাহরণ।

তাহলে বিবর্তনের প্রাথমিক ধাপ কী?

আগেই বলেছি, একটা প্রাণীর ডিএনএ তে মিউটেশনের কারণে তার বাহ্যিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটতে পারে। এই পরিবর্তন টা নিউট্রাল, হার্মফুল, বেনিফিশিয়াল হতে পারে প্রাণীর জন্য। যদি এই পরিবর্তন প্রাণীটি তার পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত করাতে পারে কিন্তু তার পরবর্তী প্রজন্ম যদি নিজের সন্তানের মাঝে প্রবাহিত না করতে পারে তাহলে সেটা নিউট্রাল মিউটেশন হয়ে থাকবে। আর যদি তার পরবর্তী প্রজন্মও সফলভাবে তাদের পরবর্তী প্রজন্মে পাস করাতে পারে তাহলে একটা লম্বা সময় পর তারা তাদের পূর্বপুরুষদের তুলনায় সম্পূর্ণ নতুন একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলাদা হয়ে যাবে এবং নতুন প্রজাতি হিসেবে গণ্য হবে।

এভাবেই বেনিফিশিয়াল মিউটেশন ন্যাচারাল সিলেকশনের জন্য নতুন প্রজাতি তৈরির কাজ করে। যেমন: ঐ কচ্ছপের উদাহরণটা মনে করুন আবার, যদি দ্বিতীয় প্রজন্মে জন্ম নেওয়া লম্বা গলার বাচ্চাগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগে মারা পড়ত? তাহলে ঐ দ্বীপে ঐ কচ্ছপ প্রজাতির আর কেউ টিকেই থাকত না। ফলে নতুন প্রজাতি সৃষ্টির প্রশ্নই আসে না। সুতরাং, এখানে মিউটেশন হয়েছে ঠিকই; কিন্তু প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এই বৈশিষ্ট্য প্রবাহ ব্যর্থ হওয়ায় এই মিউটেশনকে বেনিফিশিয়াল মিউটেশন বলা যাবে না। চাইলে নিউট্রাল মিউটেশন বলতে পারেন। বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবীতে প্রজাতির বৈচিত্র্য এভাবেই ঘটে চলেছে।

Every living things share a single common ancestor.

Natural selection, in a nutshell:

Green beetles have been selected against, and brown beetles have flourished.
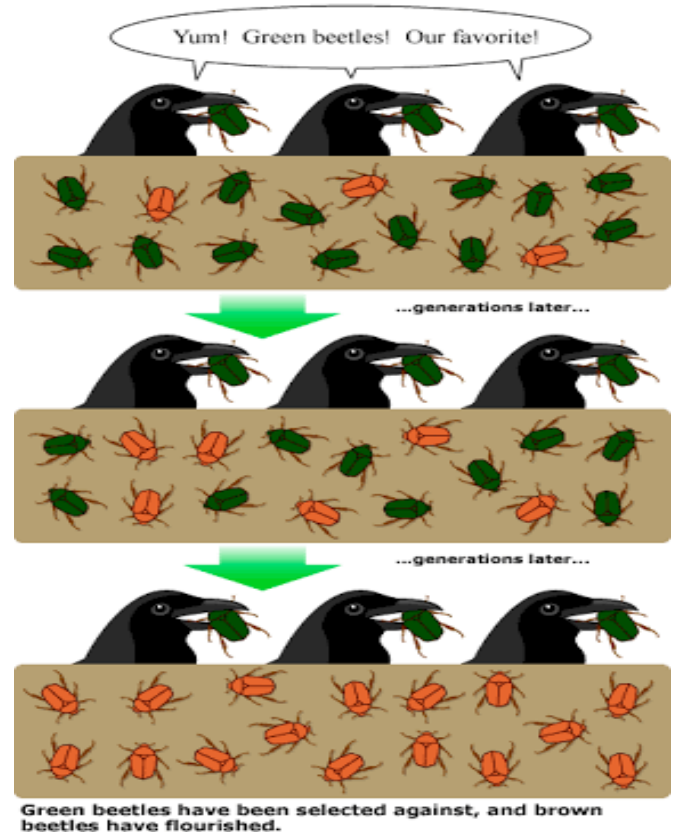
জেনেটিক ড্রিফট ও বিবর্তনীয় কলকাঠি:

আমরা এতক্ষণ মিউটেশন এবং ন্যাচারাল সিলেকশন নিয়ে কথা বলেছি। ন্যাচারাল সিলেকশনের বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে গেলে বিবর্তনের পিছনে কলকাঠি নাড়ানো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক সম্পর্কে আলোচনায় চলে আসতেই পারি।

আমরা প্রথমে কোনো প্রজাতির অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি পরিমাপ করা শিখবো। একটা ক্রোমোজোম দুইটি ক্রোমাটিড নিয়ে গঠিত। আমরা জানি, ক্রোমোজোমে জিন থাকে। জিনের সহজ সংজ্ঞা হলো, ডিএনএ'র যে অংশ বা পলিনিউক্লিওটাইড সিকোয়েন্সের যে অংশ প্রোটিন কোডিংয়ে সক্ষম সেই অংশই জিন। ক্রোমোজোমের যে অংশে জিন অবস্থান করে তাকে বলে লোকাস।

এখন একটা ক্রোমাটিডের কোনো অংশে ধরি T অ্যালিল অবস্থান করছে। ঠিক তার হোমোলোগাস ক্রোমোজোমে রয়েছে t অ্যালিল। এই দুইটা মিলে একসাথে Tt জিনোটাইপ। আর এর বাহ্যিক (দৈহিক বা মানসিক) বৈশিষ্ট্য হলো ফিনোটাইপ। উল্লেখ্য TT, tt

জিনোটাইপও অবশ্যই থাকে। উদাহরণ হিসেবে শুধু Tt দিয়েই ঘটনাটা ব্যাখা করব, বুঝতে সহজ হবে।

যেসব প্রাণী যৌন মিলন ঘটিয়ে সন্তান উৎপাদন করে তাদের ক্রোমোজোমের একটা ক্রোমাটিড পিতা থেকে, অপরটি মাতা থেকে আসে। ধরি, মাতা থেকে আগত ক্রোমাটিডে T অ্যালিল রয়েছে। এই T অ্যালিল ডমিন্যান্ট, ডমিন্যান্ট অ্যালিল সর্বদা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। এখানে T অ্যালিলকে মূলত প্রাণীর উচ্চতা বেশি হওয়ার জন্য দায়ী অ্যালিল হিসেবে চিহ্নিত করলাম। অপরদিকে t অ্যালিল প্রাণীর উচ্চতা কম হওয়ার জন্য দায়ী। T ডমিন্যান্ট অ্যালিল হওয়ায় TT, Tt এই সকল কম্বিনেশনে T প্রকট বৈশিষ্ট্য লাভ করবে এবং t প্রচ্ছন্ন রূপে ক্রোমোজোমে থেকে যাবে। অর্থাৎ T থাকলেই প্রাণীর উচ্চতা বেশি।

এই কম্বিনেশনের উপর ভিত্তি করে আমরা জিনোটাইপকে কয়েকভাবে ভাগ করতে পারি।

- ১) হোমোজাইগাস অ্যালিল: TT, tt হোমোজাইগাস অ্যালিল। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই একই টাইপ অ্যালিল নিয়ে জিনোটাইপ গঠিত।

  এখানে TT হলো হোমোজাইগাস ডমিন্যান্ট। এই জিনোটাইপধারী প্রাণীর উচ্চতা বেশি হবে। অপরদিকে, tt হলো হোমোজাইগাস রেসিসিভ।
  এই জিনোটাইপধারী প্রাণী খাটো হবে।

- ২) হেটেরোজাইগাস অ্যালিল:

  Tt একমাত্র কম্বিনেশন এখানে হেটেরোজাইগাস অ্যালিলের। ফলে, কোনো প্রাণীতে হেটেরোজাইগাস অ্যালিল থাকা মানেই তার উচ্চতা বেশি, Tএর উপস্থিতির জন্য।

তাহলে আমরা অ্যালিল সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পেয়ে গেলাম। এবার আমরা শিখব পপুলেশন পর্যায়ে অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি কীভাবে পরিমাপ করা যায় সেটা নিয়ে।

অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি ও পপুলেশন জেনেটিক্সের আগমন:

আমরা এতক্ষণ জিন সম্পর্কিত যা কিছু দেখেছি তা মোটামুটি নির্দিষ্ট প্রাণী বা ব্যক্তির উদাহরণ দিয়ে বুঝানো সম্ভব হলেও এবার নির্দিষ্ট প্রাণীর গণ্ডি থেকে বেরিয়ে চিন্তা করতে হবে। গণ্ডি থেকে বেরিয়ে পপুলেশন তথা গোষ্ঠী পর্যায়ে যাওয়া বাধ্যতামূলক।
সহজ কথায় পপুলেশন কী জিনিস?
কোনো প্রজাতির একটা অংশ যা কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় অবস্থান করে এবং নিজেদের মধ্যে যৌনমিলনের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদনে সক্ষম।

ধরি, কোনো একটি দ্বীপে ১০০০ জন মানুষ বাস
করছেন বংশ পরম্পরায়। ঐ ১০০০ জন মানুষ নিয়ে একটি জাতিগোষ্ঠী বা পপুলেশন। তাদের উচ্চতার জন্য দায়ী জিনোটাইপ পরিমাপ করে জানা গেল:

- ১) TT জিনোটাইপধারী মানুষ ৫০০ জন।
- ২) Tt জিনোটাইপ ধারী মানুষ ২০০ জন।
- ৩) tt জিনোটাইপ ধারী মানুষ ৩০০ জন।

তাহলে T অ্যালিল ১০০০+২০০=১২০০ টি।
এবং t অ্যালিল ৬০০+২০০=৮০০ টি।

তাহলে ঐ পপুলেশনে T অ্যালিলের ফ্রিকোয়েন্সি হবে ১২০০/২০০০=০.৬। আবার t অ্যালিলের ফ্রিকোয়েন্সি হবে ৮০০/২০০০=০.৪।

তাহলে মোট অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি ০.৬+০.৪=১। কোনো অ্যালিলের ফ্রিকোয়েন্সি নির্ণয় করলে আমরা সর্বদা তা ০ থেকে ১ এর মধ্যেই পাব। আশা করি অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সির বিষয়টা এখন পরিষ্কার।

হার্ডি-ওয়াইনবার্গ নীতি:
নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে এই নীতি বিজ্ঞানী হার্ডি এবং ওয়াইনবার্গ প্রদান করেছেন। তাদের নীতি অনুসারে, কোনো পপুলেশনে অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি সর্বদা একই থাকবে। এর জন্য বিশেষ কিছু শর্তও রয়েছে।

১) পপুলেশনে কোনো প্রকার বিবর্তন ঘটবে না (Non evolving population).
২) পপুলেশনের কোনো সদস্যের জিন সিকোয়েন্সে কোনো প্রকার মিউটেশন ঘটবে না।
৩) সিলেক্টিভ ব্রিডিং হবে না, র‍্যান্ডমলি ব্রিডিং চলবে।
৪) বড় কোনো দুর্যোগ বা মাইগ্রেশনের কারণে পপুলেশনের সদস্য সংখ্যায় হঠাৎ পরিবর্তন আসবে না।
৫) পপুলেশন বা গোষ্ঠীর আকৃতি বড় হতে হবে, সদস্য সংখ্যা বেশি হবে।

হার্ডি-ওয়াইনবার্গ নীতি থেকেই প্রতিপাদন করা যায় কোনো পপুলেশনের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রকাশকারী অ্যালিলের ফ্রিকোয়েন্সি মোট ১ হবে। অর্থাৎ যদি ধরি p এবং q অ্যালিল নির্দিষ্ট জিনোটাইপ বহন করে তবে আমরা নিম্নোক্ত তিন ধরনের কম্বিনেশন পাব:

অ্যালিল	p	q
p	p^2	pq
q	pq	q^2

তাহলে আগের অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সির মতো এখানে জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সি বের করে ফেলা যাক।
মোট কম্বিনেশন সংখ্যা=৪
p^2 এর জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সি ১/৪=০.২৫
pq এর জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সি ২/৪=০.৫
q^2 এর জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সি ১/৪=০.২৫

তাহলে পপুলেশনের মোট জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সি
$p^2+2pq+q^2 = 1$
বা, $(p+q)^2=1$
বা, $p+q=1$

তাহলে সমাধান পেয়ে গেলাম আমরা। পপুলেশনের মোট অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি সর্বদা ১ ই হবে যে কোনো অ্যালিলকে বিবেচনায় আনলে।

কিন্তু আসলে হার্ডি-ওয়াইনবার্গ নীতি প্রকৃতিতে খাটে না। মিউটেশন ঘটতে থাকে, ন্যাচারাল সিলেকশন চলতে থাকে, যে প্রজাতি যত বেশি ফিট হয় প্রকৃতিতে সে তত বেশি টিকে থাকার সুবিধা পায়। যদি মানুষের উদাহরণ টানি তবে, র‍্যান্ডম ব্রিডিং হয় না, কিছুটা সিলেক্টিভ ব্রিডিং ঘটেই। লম্বা পুরুষেরা তুলনামূলক লম্বা সঙ্গী চায়, খাটো পুরুষেরা নিজের তুলনায় খাটো সঙ্গী পছন্দ করে। অন্য প্রাণীতে হয়তো এমন সিলেক্টিভ ব্রিডিং তেমন দেখা যায় না।

যদি এই প্রভাবগুলো প্রকৃতিতে না-ও থাকে তবু অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি ধ্রুব থাকবে না। আগের ঐ চেকার বক্সটা লক্ষ্য করুন। তিন ধরনের কম্বিনেশন দেখেছিলাম। কিন্তু এই তিন ধরনের জিনোটাইপ সম্পন্ন বংশধর পৃথিবীর মুখ দেখে না। TT, Tt, tt এই তিন ধরনের মধ্যে যে কোনো ধরনের এক বা একাধিক বাচ্চার জন্ম হতে পারে। ফলে সম্ভাব্য সকল জিনোটাইপ প্রকৃতিতে আসে না। এটাই কারণ কোনো প্রকার বিবর্তনীয় প্রভাব (মিউটেশন, সিলেকশন) ছাড়াই অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তনের।

আমরা তাহলে দেখলাম, হার্ডি-ওয়াইনবার্গের নীতি, যেখানে বলা হয়, কোনো বৃহৎ পপুলেশনের অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি সর্বদা নির্দিষ্ট থাকবে - এর জন্য প্রয়োজনীয় সব শর্তই লঙ্ঘিত হয়।
আবার, এমন কিছু না হলেও হার্ডি-ওয়াইনবার্গ নীতি জেনেটিক ড্রিফটের কারণে সঠিক হবে না। ড্রিফটের কারণও দেখালাম। সম্ভাব্য সকল প্রকরণের বাচ্চা উৎপাদিত হয় না। বরং জিনোটাইপ যখন প্যারেন্টস থেকে সন্তানে যায় সেই সময়ই ফ্রিকোয়েন্সির তারতম্য ঘটে। কোনো কোনো জিনোটাইপের সন্তান প্রকৃতিতে আসে, কোনো কোনো জিনোটাইপের আসে না। অ্যালিলের পরিমাণ কম বেশি হয় সন্তান জন্মদানের সময়।

নিচে কিছু গ্রাফ দেখানো হলো:

উপরের গ্রাফে পপুলেশন খুব ছোট। মাত্র দশজন সদস্য। ঐ পপুলেশনের প্রাণীদের কোনো বৈশিষ্ট্য A এবং a অ্যালিল নিয়ন্ত্রণ করে।

পাঁচজনের জিনোটাইপ AA.

তিনজনের জিনোটাইপ Aa.

দুইজনের জিনোটাইপ aa.

তাহলে A অ্যালিলের ফ্রিকোয়েন্সি (১০+৩)÷২০= ০.৬৫।

এবং a অ্যালিলের ফ্রিকোয়েন্সি (৪+৩)÷২০= ০.৩৫।

গ্রাফের পপুলেশন কলামের পাশে একটা কলাম "Violation of equilibrium." এখানে পাঁচটি পয়েন্ট রয়েছে। হার্ডি-ওয়াইনবার্গ নীতিতে যে পাঁচটি শর্ত ছিলো সেই পাঁচটি শর্ত দেখা যাচ্ছে। সব ঠিক থাকলেও একটা বিষয় নীতির পূর্বশর্তের সাথে মেলেনি। বৃহৎ গোষ্ঠীর বদলে আমরা নিয়েছি খুব ছোট দশ সদস্যের গোষ্ঠী।

গ্রাফের স্টার্টিং পয়েন্ট আমরা দেখছি p (০.৬৫) যা A অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সির শুরু এবং q (০.৩৫) যা a অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সির শুরু।

(p,q) বনাম F(জেনারেশন) গ্রাফে আমরা প্রতিটা অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সির ওঠা নামা দেখতে পাচ্ছি। এবার দেখব জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সি।

আমি যে সিম্যুলেটর ব্যবহার করেছি সেখানে পপুলেশনের সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ একশতের জন্য ফলাফল প্রদর্শন করে। এবার একশত জনের জন্য ফলাফল দেখে নেব।

পপুলেশনের সদস্য সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সির উঠা নামা অনেক কমে গেছে। A এবং a এর অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সির রেখা একটা মসৃণ বক্ররেখায় পরিণত হচ্ছে আস্তে আস্তে যেখানে আগের কেসে অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সির কার্ভ ছিলো অনেক বেশি খাঁজকাটা। এভাবে পপুলেশনের সদস্য আরও বাড়তে থাকলে অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সির কার্ভ আরও মসৃণ হতে থাকবে, তারপর আরও বাড়তে থাকলে কার্ভ আস্তে আস্তে x অক্ষের সমান্তরাল হতে থাকবে। তবে মজার বিষয়, সম্পূর্ণ মসৃণ আর x অক্ষের সমান্তরাল হতে পপুলেশনের সদস্য সংখ্যা অসীম হওয়া প্রয়োজন। যদিও খুব বড় জনগোষ্ঠীর জন্য খালি চোখে গ্রাফকে যতই নিখুঁত, মসৃণ আর x অক্ষের সমান্তরাল মনে হোক না কেনো খুব সূক্ষ্ম স্কেলে পরীক্ষা করলে আমরা জেনেটিক ড্রিফটের প্রভাব

দেখতে পাব। একই বিষয় ঘটবে জিনোটাইপিক ফ্রিকোয়েন্সির ক্ষেত্রেও।

জেনেটিক ড্রিফট ও ফিক্সেশন:

তাহলে জেনেটিক ড্রিফট কী সেটা হয়তো পরিষ্কার। ড্রিফট শব্দের অর্থ পথবিচ্যুতি। উদাহরণ টানা যাক।

ক) কোনো পপুলেশনে মোট ৫০ টি T অ্যালিল এবং ৫০ টি t অ্যালিল রয়েছে। T_f = ০.৫, t_f = ০.৫। উভয় অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি সমান।

খ) কয়েক প্রজন্ম পর পপুলেশনে T এর সংখ্যা ২৫০ টি, t এর সংখ্যা ৭০ টি। T_f = ০.৭৮, t_f =০.২২।

গ) আরও কয়েক প্রজন্ম পর পপুলেশনে T এর সংখ্যা ৬০০, t এর সংখ্যা ৯২০ টি। T_f = ০.৮৩, t_f = ০.৯৭

এভাবে চলতে থাকলে একসময় T অ্যালিলের ফ্রিকোয়েন্সি ৯ হয়ে যাবে আর t অ্যালিলের ফ্রিকোয়েন্সি হবে ০। একে বলে ফিক্সেশন।
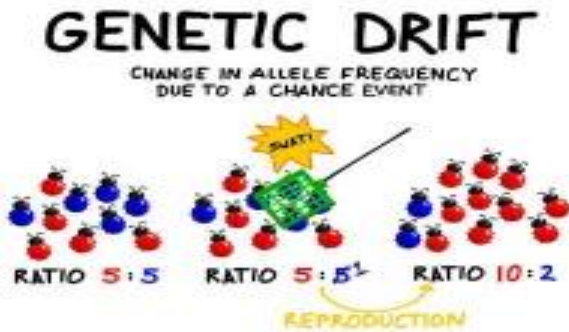
ফিক্সেশন নিয়ে আরও গভীর চিন্তাভাবনায় যাওয়ার আগে এর সাথে রিলেটেড কিছু বিষয় জেনে নেওয়া ভালো।

প্রথমে আসে হেটেরোজাইগাস অ্যাডভান্টেজ। হেটেরোজাইগাস অ্যালিল কী আমরা জেনেছি। বহুল প্রচলিত একটি উদাহরণ আমি এখানে তুলে ধরব।

HbA HbA	• "শিকল সেল অ্যানেমিয়া"-র প্রতিবন্ধক। কোড করা বিটা গ্লোবিন অক্সিজেনের সুপরিবাহক। • ম্যালেরিয়া রোগের পরজীবীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না।
HbS HbS	• " শিকল সেল অ্যানেমিয়া"-র জন্য দায়ী। কোড করা বিটা গ্লোবিন অক্সিজেন পরিবহনে দুর্বল। • ম্যালেরিয়া পরজীবীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।
HbA HbS	• "শিকল সেল অ্যানেমিয়া"-র প্রতিবন্ধক। • ম্যালেরিয়া পরজীবীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

HbA, HbS দুইটি অ্যালিল যাদের উপস্থিতি,অনুপস্থিতি “শিকল সেল অ্যানেমিয়া” রোগের জন্য দায়ী। HbA অ্যালিল HbS এর উপর ডমিন্যান্ট অ্যালিল হিসেবে কাজ করে। তাহলে এদের কম্বিনেশন তিনটি হলো HbA HbS, HbA HbA, HbS HbS।
মজার বিষয় হলো, HbA সাধারণ বিটা গ্লোবিন প্রোটিন কোড করে। ফলে রক্তে অক্সিজেনের ভালো পরিবহন নিশ্চিত হয়। অপরদিকে, HbS অ্যাবনরমাল আকৃতির বিটা গ্লোবিন কোড করে- যা রক্তে অক্সিজেনের সুপরিবহনের পথে প্রতিবন্ধক। কিন্তু HbS অ্যালিলের

উপস্থিতি ম্যালেরিয়া পরজীবীর জন্য হুমকি। এই অ্যালিল ক্রোমোজোমে থাকলে তা ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করে।

তাহলে হিসাব-নিকাশ কী দাঁড়াল? কে বেশি ফিট প্রকৃতিতে টিকে থাকার জন্য? এক কথায় উত্তর, হেটেরোজাইগাস অ্যালিল সমৃদ্ধ প্রাণীটি। এটাই হেটেরোজাইগাস হওয়ার সুবিধা। সিলেকশন সবসময় এক দিকে চলে- ধ্বংসাত্মক বা দুর্বল অ্যালিলকে নির্মূল করা এবং সুবিধাপ্রাপ্ত অ্যালিল টিকে থাকা, বিস্তর অর্থে সুবিধাপ্রাপ্ত অ্যালিলের ফিক্সেশন ঘটা। কিন্তু যখন প্রকৃতিতে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে শুধু হেটেরোজাইগাস অ্যালিলই টিকে থাকার সুবিধা পায় তখন অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি আস্তে আস্তে সমতার দিকে এগোয়। HbA HbA ম্যালেরিয়ায় আর HbS HbS অ্যানেমিয়ায় বিলুপ্ত হয়ে গেলে টিকে থাকে শুধু HbA HbS হেটেরোজাইগাসরা। ফলে কোনো নির্দিষ্ট অ্যালিলের আধিক্য কমতে থাকে। যদিও এরূপ বিরূপ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পর পুনরায় ফিক্সেশনের দিকে অগ্রসর হয়। জেনেটিক ড্রিফট পপুলেশন থেকে হেটেরোজাইগোসিটি হ্রাস করে।

এবার যদি এমন হয় কোনো জনগোষ্ঠীতে ম্যালেরিয়ার কোনো আক্রমণ ঘটলো না। ফলে HbS HbS হোমোজাইগাসরা অ্যানেমিয়ায় মারা যাবে যেখানে HbA হোমোজাইগাসের কিছুই হবে না। ফলে ঐ পপুলেশন হঠাৎ করেই HbA অ্যালিল ফিক্সেশনের দিকে অনেকখানি এগিয়ে যাবে।

এরপর আসে ডারউইনীয় ফিটনেস এবং সিলেকশন কো-অ্যাফিসিয়েন্ট; দুইটা একে অপরের পরিপূরক। ফিটনেস হিসাব করা হয় অপর প্রাণীর সাপেক্ষে। কোনো প্রাণী অপর প্রাণীর তুলনায় কত বেশি ফিট বা টিকে থাকতে সক্ষম সেটাই আপেক্ষিক ফিটনেস। এই হিসাবের মূল চাবিকাঠি হলো উর্বর সন্তান। অর্থাৎ কোনো প্রজন্মের যতজন সদস্যের সন্তান প্রজননের বয়স অতিক্রম করেছে তাদের সংখ্যা দিয়ে হিসাব করা যায়।

ধরি, কোনো প্রজাতির ২০০ জন Aa প্রাণী, ২০০ জন AA প্রাণী, ২০০ জন aa প্রাণী নিয়ে আমরা গবেষণা শুরু করলাম। দীর্ঘসময় পর, ২৫ জন Aa, ১৬০ জন AA প্রাণীর, ২০ জন aa প্রাণীর সন্তান প্রজনন সক্ষম হলো। রিলেটিভ ফিটনেস w হলে,

w_{Aa} = ২৫÷১৬০= ০.১৫৬২৫

w_{AA} = ১৬০÷১৬০= ১

w_{aa} = ২০÷১৬০= ০.১২৫

তাহলে রিলেটিভ ফিটনেস, $w_{AA}>w_{Aa}>w_{aa}$

অপরদিকে, সিলেকশন কো-অ্যাফিসিয়েন্ট হলো আপেক্ষিক হ্রাস, যে প্রজাতির প্রাণীদের প্রজনন সক্ষম সন্তান যত হ্রাস পায় বা কম হয় তত সিলেকশন কো-অ্যাফিসিয়েন্টের মান বাড়ে। রিলেটিভ সিলেকশন কো-অ্যাফিসিয়েন্ট s হলে, s=1-w.
তাহলে,

s_{Aa}= ১-০.১৫৬২৫=০.৮৪৩৭৫

s_{AA}= ১-১= ০

s_{aa}= ১-০.১২৫= ০.৮৭৫

কোনো পপুলেশনের সিলেকশন কো-অ্যাফিসেয়েন্টের মান বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ সেই পপুলেশন ধীরে ধীরে প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। আর মান কম হওয়ার অর্থ প্রকৃতিতে বেশি ফিট হওয়া। এখানে প্রাকৃতিকভাবে বেশি ফিট হওয়ার কারণে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে A অ্যালিলের পরিমাণ বাড়ছে এবং একসময় ফিক্সড হয়ে যাবে। এভাবে সিলেকশনের মাধ্যমে একটা অ্যালিল ফিক্সেশন ঘটে।

মিউটেশন প্রকৃতিতে প্রচুর পরিমাণে বৈচিত্র্যতা আনতে চায়। কিন্তু সব বৈচিত্র্য প্রকৃতিতে রাজত্ব পায় না। সিলেকশন আর জেনেটিক ড্রিফট ছাঁকনি হিসেবে কাজ করে। তারা বৈচিত্র্য কমায়। জেনেটিক ড্রিফট ধীরে ধীরে জিন সিকোয়েন্স থেকে হার্মফুল জিনকে এলিমিনেট করে দেয়। অপরদিকে সিলেকশন শুধু তাদেরই প্রকৃতিতে রাখতে চায় যারা নিজেদের যোগ্য প্রমাণ করতে পারে। কিন্তু কখনো কখনো এমন পরিস্থিতি তৈরী হয় যখন সিলেকশন কাজ করে না, ফলে প্রকৃতিতে হার্মফুল অ্যালিলের ফ্রিকোয়েন্সি অনেক বেশি হয়ে যায়। জেনেটিক ড্রিফট সিলেকশনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেয়।

- ফাউন্ডার ইফেক্ট:

 মাইগ্রেশন তথা স্থানান্তরের বিষয়টা কি মনে আছে? হার্ডি-ওয়াইনবার্গ নীতির একটি পূর্বশর্ত ছিলো জনগোষ্ঠীর কোনো অংশের মাইগ্রেশন হবে না। মাইগ্রেশন হলো মূলত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে বসবাস। ধরি, কোনো পাখির জনগোষ্ঠীতে ৬০০ জন সদস্য। "দেখতে কালো" বলে খোঁচা শুনে শুনে, বর্ণবাদের শিকার হয়ে একদিন ২০ টি পাখি উড়ে চলে গেল অন্য দ্বীপে। শুরু করল নিজেদের রাজত্ব। এখন ঐ ২০ জন সদস্যের সবাই ব্লাক জিনোটাইপধারী হোমোজাইগাস। ফলে তাদের বংশধরেরা সবাই হবে কালো। এভাবে কয়েক প্রজন্ম পর ঐ দ্বীপে গড়ে উঠলো নতুন জনগোষ্ঠী যেখানে কালো হওয়ার জন্য দায়ী অ্যালিল ফিক্সড।

এবার এটাতে টুইস্ট আনি। ধরি, পূর্বের এলাকায় এমন এক শিকারি পাখি রয়েছে যাদের চোখ সহজে কালোর প্রতি সংবেদনশীল ছিল। ফলে কালো পাখিগুলো সহজে তাদের শিকারে পরিণত হতো। ন্যাচারাল সিলেকশনের দৌড়ে কালো পাখিরা হেরে গিয়ে বিলুপ্ত হতো। ফরসা পাখিরা প্রজাতিতে ফিক্সড হয়ে যেত।

কিন্তু মাইগ্রেশন কালো পাখিকে একটা আলাদা জনগোষ্ঠী তৈরীর সুযোগ করে দিলো।

উদাহরণ: আফ্রিকার মানবগোষ্ঠী। মালত ডাচ উপনিবেশের সময় এরা ঐ অঞ্চলে আশ্রয় নেয় এবং পরবর্তীতে জনগোষ্ঠী গড়ে তোলে। ফলে ঐ জনগোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে হান্টিংটন রোগের জন্য দায়ী জিনের উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি লক্ষ্য করা যায় যা জনগোষ্ঠীর প্রাক্কালে ঐ ডাচদের মধ্যে ছিল। এই বৈশিষ্ট্য সহজে চোখে পড়লেও জনগোষ্ঠীর অন্যান্য জিনগত বৈশিষ্ট্যেও এরূপ আনইউজুয়াল প্রভাব চোখে পড়বেই।

- বোটলনেক ইফেক্ট:

আচ্ছা, ন্যাচারাল সিলেকশন মানে কি প্রকৃতির সব বাঁধা অতিক্রম করা? কী সেই বাঁধাগুলো? খাদ্য জোগাড় করা, অন্য শিকারী প্রাণীদের সাথে লড়াই করে টিকে থাকা, নিজের বৈশিষ্ট্য সফলভাবে পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত করা। কিন্তু আচমকা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন: অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি কীভাবে অতিক্রম করবেন? কোন অ্যালিল সাহায্য করবে আপনাকে ভূমিকম্পে টিকে থাকতে?

সহজ কথায়- এমন কোনো অ্যালিল নেই। এই ধরনের দুর্যোগে কোনো পপুলেশনের একটা অংশ হঠাৎ করে বিলুপ্ত হয়ে যায়। বাকি অংশ র‍্যান্ডম চান্সের কারণে টিকে যায়। কোনো প্রাকৃতিক সাপোর্ট কাজ করে না। পুরোটাই চান্স।

ফলে, দুর্যোগের আগে ঐ পপুলেশনের অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি আর দুর্যোগের পরের ফ্রিকোয়েন্সিতে বিশাল পার্থক্য দেখা যায়। এই পথবিচ্যুতি তথা ড্রিফটের পিছনে প্রকৃতির হেঁয়ালিপনা দায়ী। রিলেটিভ ফিটনেস, সিলেকশন কো-অ্যাফিসিয়েন্ট, হেটেরোজাইগাস অ্যাডভান্টেজ সবকিছুই প্রকৃতির এই হেঁয়ালিপনার কাছে অসহায়।

উদাহরণ: অ্যালিফ্যান্ট সিল। নর্দান অ্যালিফ্যান্ট সিল মানুষের শিকারে পরিণত হয়ে ১৯ শতকের শেষে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছিল। ২০ টা মতো বেঁচে ছিল যারা পুনরায় প্রজননের মাধ্যমে ত্রিশ হাজার সদস্যের নতুন জনগোষ্ঠী গড়ে তোলে। কিন্তু তাদের জিনে বোটলনেক প্রভাব রয়ে গেছে। তাদের মধ্যে আগের মতো বৈচিত্র্যতা নেই

তাহলে আমরা দেখলাম এমন অবস্থাও পপুলেশনে তৈরী হতে পারে যার ফলে সুবিধাপ্রাপ্ত (naturally favoured) প্রাণী হারিয়ে গিয়ে সুবিধা না পাওয়া প্রাণীগুলো নিজেদের রাজত্ব কায়েম করে।

"It is not the strongest or the most intelligent who will survive but those who can best manage change."

— Leon C. Megginson

মিসিং লিংক মিসকনসেপশনঃ

আমরা প্রায়শই দৈনন্দিন জীবনে কথোপকথনের সময় এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করি যেগুলো বিজ্ঞানীগণের ব্যবহার করা ফরমাল সেটিং থেকে আলাদা। যেটা অনেক সময় আমাদের কনফিউশানের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যখন আমরা বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করি। ঠিক তেমনই একটা শব্দ হচ্ছে "মিসিং লিংক"।

এই শব্দটা এতো পপুলার হওয়ার কারণ হচ্ছে নিউজ পোর্টালগুলোতে এর অতিরঞ্জিত ব্যবহার। মিসিং লিংকটা আসলে হচ্ছে "ট্র্যানজিশনাল ফসিল" এর একটা অবৈজ্ঞানিক টার্ম। মিসিং লিংক টার্মটা এসেছে একটা ভুল ধারণা থেকে, আগের দিনে গবেষকরা মনে করতো মানুষ এইপ থেকে এসেছে; যেহেতু এইপ মানুষের তুলনায় বেশি প্রিমিটিভ, তাই তাদের থেকে মানুষ এলে মাঝখানে অবশ্যই একটা লিংক রয়েছে। কিন্তু বিষয় টা আসলে তেমন না। কেন না? কারণ বিবর্তন এভাবে কাজ করে না। আমাদের পূর্বপুরুষ ও আমাদের মাঝে কোনো একক অবিচ্ছিন্ন চেইন নেই। বিবর্তন হলো বৈচিত্র্য, কোনো রৈখিক ক্রমবৃদ্ধি নয়।

"Missing link is an outmoded term in biology, which I have to say most of us think should be forgotten and never used."
-John Hawks

পূর্বে কোনো এক সময়, আমরা এবং এইপরা কমন এনসেস্টার শেয়ার করতাম। সেই এনসেস্টারেরই কিছু বংশধর গাছ ছেড়ে মাটিতে হাঁটাচলা করতে শুরু করে আর কিছু গাছেই থেকে যায়। যারা গাছ থেকে মাটিতে নেমে আসে তারা তাদের গাছে থাকা ভাই-ব্রাদারের থেকে বেশি খাদ্যের ও প্রোটিনের যোগান দিতে সক্ষম ছিলো। ধীরে ধীরে তারা বাইপেডাল হয়। কিন্তু তারা যেহেতু পুরোপুরি ভাবে আলাদা ছিল না। তাই তারা তখনও প্রজনন ও জিন অদল-বদল করতে সক্ষম ছিল। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, মডার্ন হিউম্যানরা একসময় হোমো নিয়ান্ডারথাল ও ডেনিসোভান এর সাথে প্রজনন ঘটিয়েছিল। আমরা জানি, নিয়ান্ডারথাল ও ডেনিসোভান আমাদের পূর্বপুরুষ ছিলো না আবার এটাও জানি যে আমরা ও তারা আমাদের কমন পূর্বপুরুষ থেকে বিভক্ত হয়েছি এবং কিছু সময়ের জন্য জিনের অদলবদলও করেছি। যার প্রমাণ হিসেবে আজও তাদের ডিএনএ আমাদের মাঝে খুঁজে পাই।

বিবর্তন জীবের ডিএনএ রিপেয়ার করে এবং এটা গাছের শাখা-প্রশাখার মতো প্রাণীর শাখা-প্রশাখা বা বৈচিত্র্য তৈরি করে, লম্বা চেইনের মতো একটার পর একটা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্রাণীর বিকাশ তৈরি করে না।
এটা প্রাণিজগতের ম্যাপ বা বিবর্তনের ট্রি অফ লাইফের ছবিটা ভালোভাবে খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন। সুতরাং বিবর্তনের প্রমাণ হিসেবে মিসিং লিংক খোঁজাটা বোকামি। কারণ হাফ বানর আর হাফ মানুষ বা হাফ শিম্পাঞ্জি আর হাফ ওরাংওটাং বলে কিছু হয় না আর বিবর্তন যেহেতু লম্বা শিকল তৈরি করে না সেহেতু মিসিং লিংকের কোনো ব্যাপার-স্যাপার নেই এখানে। আর ট্র্যানজিশনাল ফসিল হিসেবে অনেক অনেক ফসিল রয়েছে যা জীববিবর্তন কে ব্যাখ্যা করতে অগ্রণী ভূমিকা রাখে।

মিসিং লিংক নিয়ে বিখ্যাত প্যালিওন্টোলজিস্ট Ian Tattersall এর মন্তব্যটি না লিখে পারলাম না:

"The notion of the 'missing link' dates from the early 20th century, when it was thought that human ancestors formed a sort of single chain receding into the remotest past. We now know that the picture was much more complex than that, with a lot of now-extinct species jostling for ecological space and evolutionary success."

বিবর্তন কী বুঝার জন্য রিচার্ড ডকিন্স তার "দি ম্যাজিক অব রিয়্যালিটি" বইতে একটা সুন্দর উদাহরণ টেনে এনেছেন। আমরা বিবর্তন এবং মিসিং লিংক দুটোই বুঝার জন্য এই উদাহরণের সহায়তা নিতে পারি।
ধরুন, আপনার কাছে একটা অ্যালবাম আছে। তাতে দেড় হাজার ছবি ধরে। আপনি একটা বাচ্চার একদিন বয়স হতে ছবি তুলে ওই অ্যালবামে রাখা শুরু করলেন। এভাবে প্রতিদিন ঐ অ্যালবামে একটি করে বাচ্চাটার ছবি অ্যালবামে রাখতে থাকলেন। এভাবে একদিন অ্যালবামে দেড় হাজার ছবি পূর্ণ হলো। আপনি হঠাৎ এক অবকাশে ঐ অ্যালবামের ছবিগুলো দেখতে বসলেন। একটু খেয়াল করে যদি দেখতে থাকেন পরপর সাজানো ছবিগুলোতে কোনো পার্থক্য পাবেন না। হয়তো ক্রমানুসারে দশ-বিশটা ছবির মধ্যেও পার্থক্য খুঁজে পেতে কষ্ট হবে আপনার।
এবার প্রথম ছবিটার সাথে আড়াইশতম ছবিটার পার্থক্য খুঁজুন। খুব বেশি পার্থক্য না পেলেও কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য পাবেন আপনি। এবার পাঁচশ তম ছবির সাথে প্রথম ছবির পার্থক্য খুঁজলে আরও বেশি পার্থক্য পাবেন। অর্থাৎ দুইটা ছবির মধ্যে সময়ের দূরত্ব যত বাড়বে তত পার্থক্য স্পষ্ট হবে। খুব পাশাপাশি দুটো ছবির মধ্যে পার্থক্য পাবেনই না।
অনেকটা এভাবে কল্পনা করে বিবর্তনকে চিন্তা করা যায়। ধরে নিন, প্রথম ছবিটা মানুষ। আর হাজারতম ছবিটা ভবিষ্যতের কোনো প্রজাতি Momo X, কয়েক মিলিয়ন বছর পরের আমাদের

উত্তরসূরী। দুইটা ছবির মধ্যে যেমন পার্থক্য আমরা স্পষ্ট শনাক্ত করি, তেমন দুইটা প্রজাতির মধ্যেও। মজার বিষয় হলো, আপনাকে যদি না বলা হয় প্রথম ছবি আর হাজারতম ছবির মধ্যে আরও নয়শত আটানব্বইটা ছবি আছে, তাহলে আপনার পক্ষে কখনোই নির্দিষ্টভাবে জানা সম্ভব নয় কয়টি ছবি মাঝ থেকে গায়েব। তেমনিভাবে Homo sapiens আর তাদের উত্তরসূরী Momo X এর মধ্যেও কয়টা প্রজাতি সময়ের প্রবাহে উৎপন্ন হয়েছিল এবং হারিয়ে গিয়েছে তাও আপনি জানেন না। তবে হয়েছিল এটা নিশ্চিত আর তার প্রমাণ হিসেবে আমরা মাঝে মাঝেই দুই প্রজাতির মধ্যবর্তী কোনো প্রজাতির ফসিল খুঁজে পাব। যেমনটা এখন পাচ্ছি। সময়ের বিবর্তনে কত প্রজাতি হারিয়ে গেছে তার ঠিকানা নেই, কেউ জানেনা। কিন্তু এমনটা যে হয়েছে তার প্রমাণ হিসেবে মাঝে মাঝেই আমরা দুইটা প্রজাতির মধ্যবর্তী ফসিলগুলো খুঁজে পাচ্ছি। আশা করি, আপনারা আপনাদের "তথাকথিত" মিসিং লিংকের উত্তর পেয়ে গেছেন।

জীবনের গল্পঃ

তাহলে আমরা জানলাম, বিবর্তন তত্ত্বে ন্যাচারাল সিলেকশনের ব্যাপারে, বেসিক বিবর্তন, কীভাবে বিবর্তন নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটায়। আজ যাব আরেকটু গভীরে। বিবর্তন কীভাবে আমাদের জীবনটাকেই বদলে দিতে পারে। পদার্থ বিজ্ঞানের Chaos theory এর একটা কনসেপ্ট সম্বন্ধে আমরা প্রায় সবাই জানি, সেটা হলো Butterfly Effect । কীভাবে একটি ছোট্ট ঘটনা ভবিষ্যতে গিয়ে একটা বড় প্রভাব ফেলতে পারে। জিনের মিউটেশনটা ঠিক বাটারফ্লাই ইফেক্টের মতোই। একটা ছোট্ট মিউটেশন ভবিষ্যতে একটা সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটানোর ক্ষমতা রাখে। বিবর্তন এর মূল চাবিকাঠি হলো মিউটেশন। মিউটেশন কোথায় ঘটে? জিনে। জিন কোথায় থাকে? ডিএনএ তে। ডিএনএ থাকে কোষের নিউক্লিয়াসে। আর এরকম কোটি কোটি কোষের সমন্বয়ে আমাদের জীবদেহ গঠিত। আমরা কেন জীবিত জানেন? কারণ কোষগুলো জীবিত। আমাদের জীবন নির্ভর করে এই ছোট ছোট কোষগুলোর ওপর। এই কোষগুলো কার্যকর আছে বলে নিজেদের "Alive" বলে দাবী করতে পারি। এরা কাজ করা বন্ধ করে দিলে আমাদের শরীর আর পাথরের মাঝে পার্থক্য থাকবে না। আজ সেই জন্য জানবো, আসলে জীববিজ্ঞানের ভাষায় কী এই জীবন, কীভাবেই আমরা নিজেদের জীবিত বলে দাবী করতে পারছি?

আসলে জীবন কী, জীবনের সংজ্ঞা কী তা নিয়ে বিস্তর মতভেদ যুগে যুগে চলে এসেছে। বর্তমানে জীবনের সবথেকে গৃহীত সংজ্ঞা হলো: "A self-sustaining chemical system capable of Darwinian evolution".

অর্থাৎ জীবনের তিনটা বৈশিষ্ট্য থাকে।

১) নিজের প্রতিলিপি তৈরি র ক্ষমতা।

২) মিউটেশন ঘটানোর ক্ষমতা।

৩) ডারউইনীয় বিবর্তন ঘটা।

তাহলে কী বুঝলাম? ছোট্ট করে বলতে গেলে জীবন আসলে একটা কেমিক্যাল সিস্টেম। শরীরে, কোষের ভেতরে এই কেমিক্যাল রিয়েকশনগুলো ঘটে বলেই আমরা বেঁচে আছি। কোষের ভিতরে কী এমন থাকে যার কারণে এতকিছু ঘটে? কোষের ভিতরে বহু মালপত্র থাকে, বলতে গেলে আরএনএ, ডিএনএ, প্রোটিন,এনজাইম ব্লা ব্লা ইত্যাদি। এগুলো প্রতিটাই একটি কোষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

চলুন জেনে আসি কোষ কীভাবে কাজ করে? উদাহরণ হিসেবে নিই Escherichia coli ব্যাক্টেরিয়াকে। ছোট করে মানুষ একে E. Coli বলে ডাকে। এটি একটি সরল এককোষী জীব। মানবদেহের সাথে এর তুলনা করলে এটি আমাদের একটিমাত্র কোষের মতো, বলতে পারি একটি কোষপ্রাচীর যার মধ্যে বিভিন্ন ধরণের প্রোটিন,এনজাইম, অন্যান্য মলিকিউল ও একটি ডিএনএ এর দণ্ড, সবগুলো যেন পানিতে ভেসে বেড়াচ্ছে। E. Coli এর ডিএনএ এই দণ্ডে প্রায় ৪ মিলিয়ন বেস পেয়ার রয়েছে। এই বেস পেয়ারগুলো প্রায় ৬০০০ জিন গঠন করে। একটি জিন সাধারণত একটি প্রোটিনের টেমপ্লেট হিসেবে কাজ করে আবার মাঝে মাঝে এই প্রোটিনগুলো এনজাইম হিসেবেও কাজ করে। এনজাইম আসলে এক ধরনের প্রোটিন যা একটি নির্দিষ্ট কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনকে গতি দান করে। যেমন- E. Coli এর ডিএনএ এর ৬০০০ এনজাইমের মধ্যে একটি এনজাইমের কাজ একটি Maltose অণুকে ভেঙে দুটো Glucose অণুতে পরিণত করা। এই এনজাইমের কাজ ওটাই। এই এনজাইমের কাজটা তখন গুরুত্বপূর্ণ যখন E. Coli খাদ্যে Maltose গ্রহণ করবে। যখন Maltose Glucose এ পরিণত হবে তখন অন্যান্য এনজাইমগুলো গ্লুকোজকে এনার্জিতে পরিণত করতে কাজ শুরু করে দেয় যাতে কোষ তা ব্যবহার করতে পারে। E. Coli এর ক্ষেত্রে একটি এনজাইম তৈরি করতে কোষের ভেতরে কেমিক্যাল মেকানিজম এর প্রয়োজন যা তার ডিএনএ দণ্ড থেকে

একটি জিনকে কপি করে সেটাকে এনজাইম তৈরি করার টেমপ্লেট হিসেবে ব্যবহার করবে। E. Coli এর ভেতরে কিছু এনজাইমের প্রায় ২০০০ টি কপি থাকতে পারে আর কিছু এনজাইমের কিছু সংখ্যক থাকতে পারে। এই সকল এনজাইমগুলোই কোষের মধ্যে সকল ধরনের কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন ঘটায়। এই কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন গুলোই কোষকে জীবিত ও কার্যকর রাখে। এগুলো E. Coli কে খাদ্য খুঁজতে, চলাফেরা করতে এবং প্রজনন ঘটাতে সাহায্য করে।

তাহলে আমরা কী পেলাম? যে কোনো লিভিং সেলে (কোষ) ডিএনএ এনজাইম তৈরি করে, এনজাইম কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন তৈরি করে। যার কারণে একটি কোষ সক্রিয় থাকে। আর সক্রিয় থাকা কোষটিকেই আমরা জীবিত কোষ বলি। এরকম অসংখ্য কোষ নিয়ে আমাদের দেহ গঠিত আর তাদের কার্যকারিতাই আমাদের জীবন। মানবকোষ ব্যাক্টেরিয়ার কোষের থেকেও অনেক বেশি জটিল। মানবকোষে ডিএনএকে প্রটেক্ট করার জন্য স্পেশাল মেমব্রেন থাকে, এছাড়াও মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজি বডি সহ আরও অনেক জিনিস থাকে যা ব্যাক্টেরিয়ায় থাকে না। E. Coli ব্যাক্টেরিয়ার কোষের বাইরের দিকে ফ্ল্যাজেলা (Flagella) থাকে যা তাকে সামনের দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। মানবকোষে স্পার্ম সেল ছাড়া অন্য কোনো সেল এ ফ্ল্যাজেলা থাকে না। যাইহোক, কিন্তু মূল কাজগুলো মূলত একই থাকে।

প্রজননের সাথে বিবর্তনের সম্পর্কঃ

প্রজনন (Reproduction) বিবর্তনের সবচেয়ে বড় একটি মাধ্যম। কারণ আমরা জানি বিবর্তন ঘটতে হলে জিন কে সফলভাবে পরবর্তী প্রজন্মে পাস করাতে হবে। আর এই জিন পাস করাকরি'র খেলা টা ঘটে প্রজনন বা খোলামেলা ভাবে বললে সেক্সের মাধ্যমেই। এতটুকু থেকেই আমরা হয়তো অনুধাবন করতে পারছি সেক্স কতটা গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তনের জন্য। প্রজনন ছাড়া একটা প্রাণীর জিনের অস্তিত্ব তার মাঝেই শেষ। আমরা জানি প্রজননের জন্য দুজন মেইটের দরকার হয়। কিন্তু ব্যাপারটা সত্য নয় সবক্ষেত্রে। কারণ আমাদের পৃথিবীতে এমনও প্রাণী আমাদের সাথেই বাস করে যাদের বংশবিস্তারের জন্য দুজন মেইটের প্রয়োজন হয় না বরং তারা নিজেদের মধ্য থেকে তাদের ডুপ্লিকেট প্রজন্ম তৈরি করতে সক্ষম, এরা হলো ব্যাক্টেরিয়া ও Archaea। বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী সকল প্রাণীর কমন পূর্বপুরুষ ব্যাকটেরিয়ারাই। তাহলে প্রাণের শুরুতে দুজন মেইট মিলিত হয়ে প্রজনন ঘটানোর পদ্ধতিটা এক্সিস্ট করত না। এই পদ্ধতিটা আমরা অ্যাডাপ্ট করেছি বিবর্তনের হাত ধরে। বায়োলজিতে সেইজন্য একটা সুন্দর কথা রয়েছে- " Sex drives evolution, Evolution drives sex. আজ আমরা জানব- How sex evolved?

আমরা সকলেই জানি প্রজনন প্রধানত দুটো উপায়ে ঘটে থাকে।

১. অযৌনজনন (asexual reproduction)
২. যৌনজনন (sexual reproduction)

অযৌনজনন ঘটিয়ে এককোষী জীবেরা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের উদ্ভব ঘটায়। অযৌনজননটা কী? মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় জনন কোষ বা গ্যামেট তৈরি এবং দুটি ভিন্ন লিঙ্গের গ্যামেটের সংযুক্তি ব্যতিরেকে একটিমাত্র জীবদেহ থেকে স্বতন্ত্র অপত্য তৈরি হওয়ার ঘটনাকে অযৌনজনন বলে। এই প্রজনন প্রক্রিয়ায় একটিমাত্র জীব নিজের অবিকল প্রতিলিপি বা ক্লোন তৈরি করে। ফলে, আগের জীব এবং প্রতিলিপিত নতুন জীবের জিনের গঠন সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকে অর্থাৎ তারা Identical থাকে। ভ্যারাইটি তৈরি হয় জেনেটিক ইনফরমেশন এর কারণে যেহেতু প্রতিলিপিতে নতুন জীবন হুবহু একই জেনেটিক ইনফরমেশন নিয়ে গঠিত হয় তাই তাদের Identical বা Clone বলা হয়। "No extra genetic information, no variation." ব্যাক্টেরিয়া বাদেও প্রাণীদের মধ্যে আমরা Sea Anemones ও Starfishদের মাঝে অযৌনজনন লক্ষ্য করি।

আর যৌনজনন বা Sexual Reproduction এ মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় জনন কোষ বা গ্যামেট গঠিত হওয়ার পর দুটি ভিন্ন লিঙ্গের গ্যামেট সেক্সের ফলে জাইগোট গঠিত করে। পুরুষের স্পার্ম সেল আর নারীর এগ সেল এর মিলনের ফলে জাইগোট গঠিত হয়। যেহেতু এই প্রক্রিয়ায় দুজনের মধ্য থেকেই জেনেটিক ইনফরমেশন আসে তাই জেনেটিক ইনফরমেশনে ভ্যারিয়েশন তৈরি হয়। এই জাইগোট ৫০% জিন পায় বাবা থেকে ৫০% পায় মা থেকে। প্রথম যৌনজনন লক্ষ্য করা যায় Early Eukaryoteদের মাঝে। সকল Eukaryoteদের মাঝে আর কিছু কমন থাক বা না থাক, সেক্সটা কমন।

ঠিক কখন প্রথম থেকে প্রাণীরা অযৌনজনন থেকে যৌনজনন-এ উদ্বুদ্ধ হলো তা বলা কঠিন। প্রায় ২ বিলিয়ন বছর আগে ব্যাক্টেরিয়ারা কনজুগেশন, ট্রান্সফরমেশন, ট্রান্সডাকশন প্রক্রিয়ায় রিপ্রোডাকশন শুরু করেছিল যদিও সেটা আসল সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন প্রসেসের মধ্যে পড়ে না তবে কিছু সাদৃশ্য রয়েছে জিন এক্সচেঞ্জ(আদান-প্রদান) এর ক্ষেত্রে। প্রকৃত কোষী জীবদের মাঝে সেক্স এর উদ্ভব ঘটে LECA এর সময় থেকে। ৫৪০ মিলিয়ন বছর আগের প্রাচীন ছোট্ট ছোট্ট জীবদের মাঝে যেমন ফুনিশিয়া, হাইড্রা এদেরকে সেক্সুয়াল এমনকি এসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের প্রাথমিক প্রমাণ হিসেবে ধরা হয়।

হাইড্রার যখন খাবারের অভাব হয় তখন হাইড্রার দেহের উপরের অংশে শুক্রাশয় তৈরি হয় ও নিচের দিকে ডিম্বাশয় তৈরি হয়। এগুলো হাইড্রার ক্ষেত্রে অস্থায়ী জনন কোষ যা মিয়োসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার ফলে গঠিত হয়। পুংজনন কোষে স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় স্পার্ম বা শুক্রাণু তৈরি হয়। আর স্ত্রী জনন কোষে উওজেনেসিস প্রক্রিয়ার ডিম্বাণু তৈরি হয়। শুক্রাণু আর ডিম্বাণু নিষেকের ফলে জাইগোট তৈরি হয়। পরবর্তীতে এই জাইগোট পরিস্ফুটিত হয়ে নতুন হাইড্রার জন্ম হয়। এভাবেই হাইড্রারা যৌনজনন ঘটিয়ে নতুন হাইড্রার জন্ম দেয়। কিন্তু এটা তারা সর্বদা করে না। তারা নিয়মিত অযৌনজননই ঘটায়। কিন্তু যখন তারা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে পড়ে তখনই তারা বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বন করে এতে তাদের offspring(সন্তান) সেই প্রতিকূল পরিবেশে টিকে যেতে পারে। কারণ তারা তখন Identical বা clone থাকেনা। এভাবেই ধীরে ধীরে পরবর্তীতে যৌনজনন প্রক্রিয়া প্রাণীদের মাঝে প্রিফারেবল (গ্রহণযোগ্য) হয় কারণ এতে পরবর্তী প্রজন্ম প্যারেন্টদের মতো উইক ফাংশনালিটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। যা সবসময় অযৌনজননে ঘটে থাকে। ধীরে ধীরে পরবর্তীতে যৌনাঙ্গ গঠিত হয়। আর প্রথম পেনিস দ্বারা যৌনকর্ম (internal fertilization) করা মেরুদণ্ডী প্রাণী ছিলো শার্ক তথা হাঙর।

শার্কদের শ্রোণিপাখনা (Pelvic Fins) এর নিচে দুটো ক্লাসপার (Clasper) থাকে যা দিয়ে তারা যৌনসঙ্গম ঘটায়। ক্লাসপার গুলোই মূলত শার্কের যৌনাঙ্গ। তবে সব শার্কের ক্লাসপার থাকেনা। যেসব শার্কের ক্লাসপার থাকে তারা পুরুষ আর যাদের থাকে না তারা নারী। নারী হাঙরদের থাকে Cloaca। এদের প্রজননের সময় পুরুষ হাঙর, নারী হাঙরের Cloaca এর ভেতরে নিজের বীর্যপতন ঘটায়। আর স্তন্যপায়ীদের মধ্যে প্রায় সকলেই অন্তঃনিষেকই ঘটায়।

তাহলে কী পেলাম?

বিবর্তনের ক্ষেত্রে অযৌনজনন প্রক্রিয়ার থেকে যৌনজনন প্রক্রিয়া বেশি সুবিধা দেয়। "More Genetic informations make more variation"। আর ভ্যারিয়েশন সাহায্য করে প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে, নিজের বংশধরকে বাঁচিয়ে রাখতে। সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের জেনেটিক ভ্যারিয়েশনের কারণেই একই প্যারেন্ট থেকে জন্ম নেওয়া দুই ভাইয়ের রক্তের গ্রুপ আলাদা, চেহারা, গায়ের রং, চুলের রং আলাদা। আর এই জেনেটিক ভ্যারিয়েশন বিবর্তন ঘটানোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি যা পপুলেশনে থাকা অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাতে পারে। জেনেটিক ভ্যারিয়েশন পপুলেশন এর জন্য উপকারী কারণ এটা পপুলেশনে থাকা কিছু প্রাণীকে প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। এভাবেই মূলত অযৌনজনন ও যৌনজনন প্রক্রিয়া বিবর্তনে ভূমিকা রাখে।
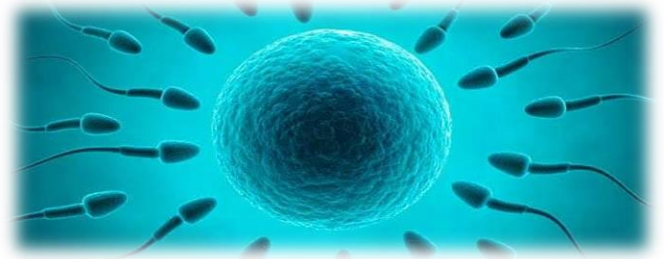
ফ্রেড হয়েল এবং বোয়িং ৭৪৭ ফ্যালাসি:

বিংশ শতাব্দীতে একজন নামকরা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন ফ্রেড হয়েল। তিনি একবার গণনা করে দেখেন আসলে র‍্যান্ডম মিউটেশনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট প্রজাতির জীব উৎপন্ন হওয়াটা অসম্ভব। মূলত এর আগে থেকেই বিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে তার বেশ

সমস্যা ছিল। বিগত শতকের মাঝামাঝি সময়ে যখন গবেষকরা বেশ কিছু আর্কিওপটেরিক্সের ফসিল খুঁজে পেয়েছিলেন তখন হঠাৎ হয়েল দাবী করলেন এই ফসিলগুলো সব জালিয়াতি। ফ্রেড হয়েলের সাথে তখন ছিলেন ভারতীয় গণিতবিদ চন্দ্র বিক্রমসিংহ।

হয়েলের তোলা এই দাবীকে সমাধি দেওয়ার কাজে এগিয়ে আসলেন "ব্রিটিশ ন্যাশনাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম" এর বিজ্ঞানীরা। তারা হয়েলের প্রতিটি সন্দেহের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ১৯৮৬ সালে সায়েন্স জার্নালে প্রকাশ করলেন "Archaeopteryx is not a forgery" শিরোনামে।

হয়েল তার এই অহেতুক দাবীর জন্য পরবর্তীতে সমালোচিত হন। কিন্তু এখানেই থেমে না গিয়ে তিনি অভিযোগ তোলেন বিবর্তন তত্ত্বের উপর। তিনি হিসেব করে দেখেছেন র‍্যান্ডম মিউটেশনের ফলে সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থার জীব সৃষ্টির সম্ভাবনা $১০^{৪০০০০}$ ভাগের ১ ভাগ। অর্থাৎ প্রায় অসম্ভব। তিনি এই ঘটনাকে একটি উপমা দিয়ে ব্যাখা করেন এভাবে:

ধরা যাক, একটি জাঙ্কইয়ার্ডে "বোয়িং ৭৪৭" বিমানের সকল অংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। হঠাৎ একটি টর্নেডো এসে জাঙ্কইয়ার্ডের উপর দিয়ে বয়ে চলে গেলো। সেই টর্নেডোতে পুরো বোয়িং ৭৪৭ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা যেমন ০, বিবর্তনের মাধ্যমে সরল জীব থেকে জটিল জীব সৃষ্টির ব্যাপারটা ঠিক তেমনই অসম্ভব।

হয়েলের এই যুক্তি নিয়ে কাঁটাছেড়া করার আগে একটা মজার বিষয় বলি। কোনো বিবর্তনবাদ বিরোধী যেমন তার যুক্তি, হিসাব, গবেষণা কোনো জার্নালে কখনো পাবলিশ করেনা, হকারের মতো ফেরি করে বেড়ায়, হয়েলও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না।

বিবর্তন র‍্যান্ডম, কথাটা আপাতদৃষ্টিতে যতটা সহজ, এর তাৎপর্য মোটেও ততটা সহজ না। এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতি সৃষ্টির পিছনে অপারেটর হিসেবে কাজ করে এমন অনেকগুলো বিষয় আমরা জেনেছি। মোটা দাগে বিবর্তনে প্রধান ভূমিকা রাখে তিনটি বিষয়।

১) মিউটেশন

২) ন্যাচারাল সিলেকশন

৩) জেনেটিক ড্রিফট

মিউটেশন র‍্যান্ডমলি ঘটে ঠিকই। কিন্তু বিবর্তন কিছুটা ডিটারমিনেস্টিকভাবে চলে। ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রবন্ধ রয়েছে যার শিরোনাম,

"If mutation is random, why does evolution occur at all?"

এই প্রবন্ধে একটা চমৎকার লাইন রয়েছে,

"Mutation was random, but selection provided a direction to the evolution."

শুধু মিউটেশন মানেই কিন্তু বিবর্তন না, মিউটেশন বিবর্তনের প্রধান নিয়ামক। কিন্তু প্রকৃতি মিউটেশনের ফলে সৃষ্ট নদীর অববাহিকায় ছাঁকনি বসিয়েছে। এই ছাঁকনিই হলো সিলেকশন। হয়েলের যুক্তিগুলোর প্রধান সমস্যা ছিল-

ক) বিবর্তন ঘটে একটি জৈবিক সিস্টেম থেকে আরেকটি জৈবিক সিস্টেমের। এই জৈবিক সিস্টেমগুলোর মধ্যে প্রতিনিয়ত ঘটে রাসায়নিক বিক্রিয়া। আমরা এই আর্টিকেলের জীবন সম্পর্কিত অংশে এই বিষয়টা জেনেছি। হয়েলের উপমায় ব্যবহৃত জাঙ্কইয়ার্ডের ঐ বোয়িং বিমানের অংশগুলোকে এইসব জৈবিক সিস্টেমের সাথে তুলনা করাটা মূর্খামি।

খ) টর্নেডোর মতো সাময়িক সময়ের ব্যবধানে বিবর্তন ঘটে না। সরল জীব থেকে জটিল জীবের উৎপত্তি প্রায় ৩.৭৭ বিলিয়ন বছরের পরিক্রমা। এই সময়কাল আপনার কল্পনাতীত। বিবর্তন মোটেও টর্নেডোর মতো আচমকা ঘটনা নয়।

গ) সিলেকশন কীভাবে মিউটেশনকে দিক নির্দেশনা দেয় তা একটু উদাহরণের সাহায্যে আমরা বুঝে নিই। ধরুন, কোনো প্রজাতির প্রাণী একটু দুর্বল। অন্য প্রাণীদের মতো শিকারে সক্ষম না। ফলে খাদ্যাভাবে ভোগে, সাথে সাথে অন্য প্রাণীর সহজ শিকারে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় হঠাৎ ঐ প্রজাতির কোনো মা প্রাণীর দুইজন সন্তান একটু অন্য রকম হয়ে জন্মাল। মা প্রাণীর জনন মিউটেশন ঘটেছে। এই মিউটেশনের ফলে একজনের দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়েছে, অন্ধকারে দেখতে পায়; অপরজনের ঘ্রাণশক্তি প্রখর হয়েছে।

যার ঘ্রাণশক্তি বেশি হয়েছে তার সুবিধা কি? সে শিকারের সময় সহজেই শিকার শনাক্ত করতে পারবে, অন্য শিকারি প্রাণীর শরীরের ঘ্রাণ চিনে রাখবে; ফলে কেউ আক্রমণ করতে এলে আগে থেকে সতর্ক হতে পারবে।

যার দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়েছে সে আস্তে আস্তে দিনের তুলনায় রাতে শিকার বেশি করবে। নিশাচর প্রাণীতে রূপান্তরিত হবে, ফলে জীবনের উপর ঝুঁকি কমবে।

ঐ প্রজাতির অন্য প্রাণীদের তুলনায় এই দুই প্রাণী এগিয়ে, তারা প্রকৃতিতে একটু বেশি সুবিধা পাচ্ছে। তাই ঐ প্রজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এগিয়ে আসবে এই দুই প্রাণীর বংশধরেরা। ধরে নিলাম, যার ঘ্রাণশক্তি প্রখর সে কোনোভাবে মারা পড়ল। তাহলে ঐ প্রজাতির প্রজন্মগুলো তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি থেকে বঞ্চিত হলো। কিন্তু যে প্রাণীটি নিশাচর সে বেঁচে আছে। এবার এখানে আবার দুটো ক্রাইটেরিয়া চলে আসে। ঐ প্রাণীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তির বৈশিষ্ট্য তার সন্তানে প্রবাহিত হবে কি না।

আগের আলোচনা একটু স্মরণ করাই। বেনিফিশিয়াল মিউটেশন মনে আছে? যে মিউটেশনের ফলে সৃষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত হয়ে নতুন প্রজাতি সৃষ্টিকে ত্বরান্বিত করে। তাহলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তির বৈশিষ্ট্যটি প্রবাহিত হতে থাকলে একসময় নতুন নিশাচর প্রজাতি পূর্ববর্তী প্রজাতি থেকে আলাদা হয়ে যাবে।

এই বিষয়টা আসলে প্রখর ঘ্রাণশক্তি বাচ্চাটার ক্ষেত্রেও হতে পারত। কিন্তু আলোচনার সুবিধার্থে তাকে মেরে ফেলে একদিক আলোচনা করলাম। যদি তাদের ক্ষেত্রেও মিউটেশন বেনিফিশিয়াল হতো তবে দুইটা নতুন প্রজাতি আমরা পেতাম। আর তাদের সাধারণ পূর্বপুরুষ সেই দুর্বল শিকারি প্রজাতি।

তাহলে আমরা কী দেখলাম? মিউটেশন যেটা ঘটল সেটা র‍্যান্ডম। কয়েক মিলিয়ন সম্ভাবনা হতে জাস্ট একটা বাস্তবে ঘটল। কিন্তু এত ফিল্টার, প্রাকৃতিক নিয়ম কানুন, বাধা পেরোনোর ফলে যে আল্টিমেট ফলাফল আমরা পেলাম সেটাকে আর র‍্যান্ডম বলার সুযোগ নেই।

প্রকৃতপক্ষে এমন অনেক মিউটেশন ঘটে যার ফলে কোনো প্রাণীতে হয়তো নতুন কোনো বৈশিষ্ট্য আসে। কিন্তু সেগুলো পরবর্তীতে নতুন প্রজন্ম সৃষ্টিতে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। প্রকৃতি তাকে সেই সুযোগই দেয়না।

আবার জেনেটিক ড্রিফট কীভাবে হার্মফুল অ্যালিলকে অপসারণ করে তার ধারণা আমরা দিয়েছি। জেনেটিক ড্রিফটও মিউটেশনের ফলে সৃষ্ট বৈচিত্র্যতাকে কমায়। অর্থাৎ র‍্যান্ডম মিউটেশনে সৃষ্ট বৈচিত্র্যতা জেনেটিক ড্রিফট এবং সিলেকশনের কল্যাণে হ্রাস পায় এবং সিলেকশন কোনো প্রজাতির জিনোটাইপিক বা ফিনোটাইপিক পরিবর্তনকে নতুন প্রজাতি তৈরির দিকে ধাবিত করে।

আজ বিবর্তনের গল্প এখানেই শেষ করছি। বিবর্তন নিয়ে জানার জন্য, বুঝার জন্য আরও বহু বিষয় রয়েছে। চর্চা করুন, জানুন। সুযোগ হলে ফিরে আসব আরও নতুন তথ্য নিয়ে আপনাদের মাঝে।
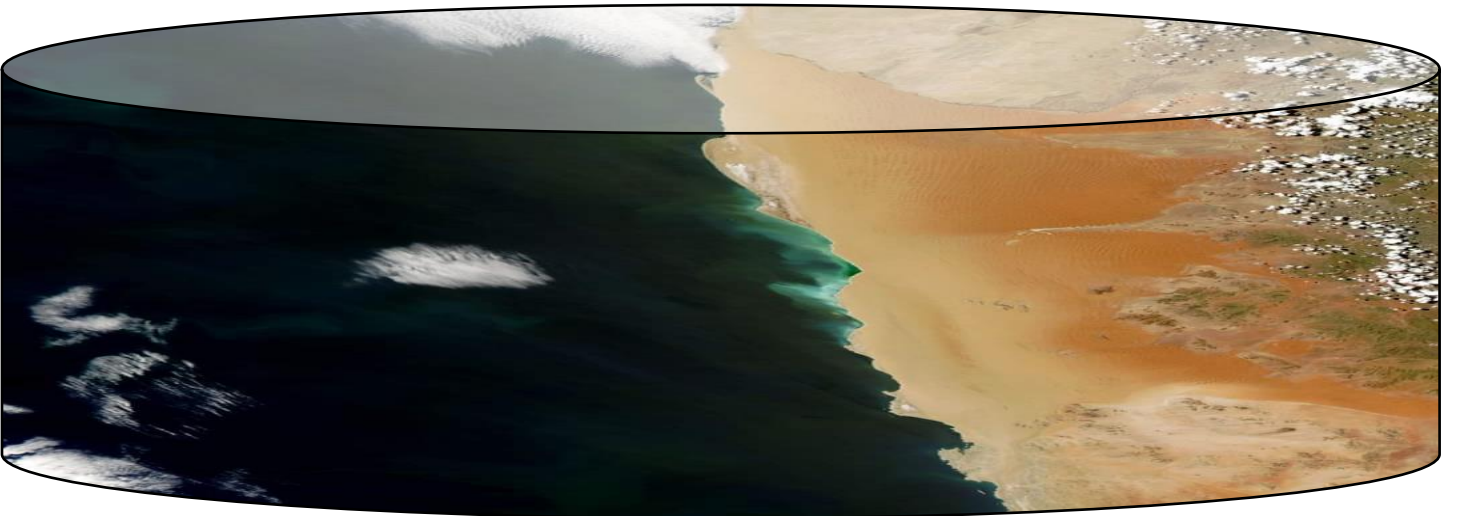
রহিমার মা

নাঈম হোসেন ফারুকী

১.
"কেমন আছো বাজান?
সইল স্বাস্থ্য ভালা তো? খালি তো চাকরি চাকরি কর, পোলাটার খবর রাখসো একডু?
পোলাডা শুকায় একবারে কাঠি হইয়া গেসে। পোলাডার কথা ভাইবা এই হরলিক্সের ডিব্বাটা পাঠাইলাম। দুই বেলা খাইতে দিও।
ইতি,
রহিমার মা"
আকবর সাহেব চিঠিটা আবার পড়লেন। মানিকগঞ্জের কোন এক গ্রাম থেকে এসেছে। হাতের লেখা অস্পষ্ট, প্রচুর বানান ভুল। বুঝা যাচ্ছে লেখিকা বেশি লেখাপড়া জানেন না।
রহিমার মা নামে তাঁর পরিচিত কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই। শাহানাকে চিঠিটা দেখিয়েছিলেন, সেও চিনতে পারেনি। হরলিক্সের কৌটাটা ফেরত দিতে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে নিয়ে গেছিলেন, তারা খোঁজ নিয়ে বলল, প্রেরক ফোন নাম্বার ভুল দিয়েছে, মাল ফেরত পাঠানো যাবে না।
আকবর সাহেবের একটু খারাপ লাগছে। কোথাকার কোন অপরিচিতা বৃদ্ধা, হয়তো শহরে তার ছেলে-মেয়ে বা আত্মীয়-স্বজন থাকে, অনেক শখ করে একটা হরলিক্সের কৌটা পাঠিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ওরা হরলিক্সটা পেলো না।
আরেকটা ব্যাপার আকবর সাহেবের মনে ধরল। তাঁর নিজেরও একটা ছেলে আছে, ৫ বছর বয়স। কাজের চাপে ছেলেটার আসলেই কোনো খোঁজ নেওয়া হচ্ছে না। ছেলেটা নাকি এমনিতে কিছুই খেতে চায় না, কেমন রোগা আর শুকনো হয়ে যাচ্ছে। হরলিক্সটা ফেরত না দিয়ে তাঁর ছেলের জন্য রেখে দেওয়া যায়।

২.
দুই মাস পরের কথা। আকবর সাহেব অফিস যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছেন, শাহানা এসে দাঁড়ালো।
দেখ তো ফেরার পথে হরলিক্সটা আবার আনতে পার কি না। এই জিনিস খেয়ে তো রুদ্রের খাওয়ার রুচি ফিরেছে। সত্যি বলতে কি, হরলিক্সটার পুরোপুরি ডিফরেন্ট স্বাদ, কৌটা খুললে বেলি ফুলের মতো একটা গন্ধ বের হয়। ছেলের দিকে তো একবার তাকানোরও সময় হয় না, শুধু কাজ আর কাজ। একবার দেখেছ ছেলেকে?
আকবর সাহেব লজ্জা পেলেন। আসলেই অনেক চাপ, সেই সাতটায় বাসা থেকে বের হন, ফিরেন রাত ১১টায়। ছেলেটার সাথে একবারও দেখা করা হয় না।
আকবর সাহেব রুদ্রের বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে ছোট একটা ধাক্কার মতো খেলেন। এই দুই মাসে রুদ্র বেশ খানিকটা লম্বা হয়েছে, প্রায় তিন ইঞ্চির মতো। তার রোগা পাতলা ভাবটা পুরোপুরি কেটে গেছে। চেহারায় অনেকটা গোলাপি আভার মতো চলে এসেছে।
হরলিক্সটা আসলেই কাজের। আজকে অফিস থেকে ফেরার পর খোঁজ করতে হবে।

৩.
এক সপ্তাহ পরের কথা।
আকবর সাহেব চিন্তায় অস্থির। বাজার থেকে নানান জাতের হরলিক্স আনা হয়েছে। ছেলে কোনোটাই মুখে তুলছে না। আগের মতোই খাওয়া দাওয়া বন্ধ।
এই মুহূর্তে তিনি বসে আছেন হরলিক্সের কৌটাটা নিয়ে। সাধারণ একটা দেশি হরলিক্স, যেগুলো কিনে এনেছেন তার চেয়ে আলাদা কিছু না। হরলিক্স শেষ, কৌটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে, বুঝতেও পারছেন না সেখানে কী ছিল।
ঠিক এই সময় আবার বাসায় পিওন এলো। সাথে আবার একটা চিঠি আর হরলিক্সের কৌটা।

চিঠিটা এরকমঃ

“সরি বাজান,
আসলেই একটু দেরি হয়ে গেল। এলাকার অবস্থা ভালো না তো, সব দিক খেয়াল রাখা কঠিন। সবাই বলছে, দুর্ভিক্ষ লাগবে এবার।
রুদ্রের জন্য হরলিক্সটা পাঠালাম। ভালো করে খাওয়াবে। ও বাঁচলে, আমরা বাঁচব।
ইতি,
রহিমার মা।”

আকবর সাহেব এইবার বেশ চিন্তিত হলেন।
রহিমার মা'র গ্রাম্য উচ্চারণ কোথায় গেল? ভাষা একেবারে শুদ্ধ হয়ে গেল কীভাবে?
তার হাতের লেখা এই পরিমাণ চেইঞ্জ কীভাবে হলো?
তার ঠিকানা মানিকগঞ্জ থেকে চেইঞ্জ হয়ে চট্টগ্রামের হাটহাজারী কীভাবে হলো?
তাঁর ছেলের নাম রহিমার মা জানল কীভাবে?
সবচেয়ে বড় কথা, কে এই রহিমার মা?

৪.
আকবর সাহেব হরলিক্সটা খুলে একটু মুখে দিলেন। অপূর্ব স্বাদ। সাথে বেলি ফুলের একটা গন্ধ।
তাঁর কেমন জানি একটা খটকা লাগল। এটা ছেলেকে খাওয়ানো ঠিক হবে কি না ভাবতে হবে। আগে ল্যাব টেস্টে পাঠানো দরকার।
সাত-পাঁচ ভাবছেন, রুমে শাহানা এসে হাজির। তার চোখ মুখ কাঁদতে কাঁদতে ফুলে গেছে। রুদ্র নাকি ২ দিন ধরে কিচ্ছু মুখে দেয় নি। একটা ভাতও না।
আকবর সাহেব কিছু বলার সুযোগ পর্যন্ত পেলেন না। শাহানা হাত থেকে ছোঁ মেরে হরলিক্সের কৌটাটা নিয়ে গেল।
আকবর সাহেব চিন্তিত মুখে তাকিয়ে থাকলেন। রুদ্রকে খুব শীঘ্রই ডাক্তারের কাছে নিতে হবে। হরলিক্সটাও ল্যাব টেস্টে পাঠানো খুব দরকার।

৫.
সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে খোঁজ নিয়ে লাভ হলো না। হাটহাজারী থেকে হরলিক্সের কৌটাটা রহিমার মা'র পক্ষ থেকে পার্সেল করেছে অল্পবয়সী একটা ছেলে। এবারও ভুল ফোন নাম্বার দেওয়া হয়েছে।
হরলিক্সের স্যাম্পল ল্যাব টেস্টে পাঠানো হয়েছিল। ডাক্তাররা এখন পর্যন্ত ক্ষতিকর কিছু খুঁজে পাননি, বরং বেশ পুষ্টিকর জিনিস। তারপরও তাঁরা অপরিচিত কিছু কেমিক্যাল খুঁজে পেয়েছেন, আরও কিছু পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছেন। আপাতত হরলিক্সটা না খাওয়ালেই ভালো হয় বলে মত দিয়েছেন।
রুদ্রর মধ্যে কেমন জানি একটা পরিবর্তন এসেছে। হাসিখুশি ছেলেটা কেমন জানি চুপচাপ হয়ে গেছে। এই কয়েকদিনে কি আরও একটু লম্বা হয়েছে? শরীরে আবার রঙ ফিরেছে তার, নিয়মিত খাওয়া দাওয়া করছে, স্বাস্থ্যও হয়েছে বেশ। আসলে স্বাস্থ্যটা একটু বেশিই ভালো বলতে হবে, ঠিক স্বাস্থ্যবান না, কেমন জানি থলথলে একটা ভাব চলে এসেছে। কিসের সাথে জানি মিল আছে, ঠিক বুঝতে পারছেন না। রুদ্রকে খুব তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে নেওয়া দরকার। কিছু একটা ঠিক নেই।

৬.
পরের ক'টা দিন আবার অনেক ব্যস্ততার মধ্যে কাটল আকবর সাহেবের। রুদ্রকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো না। এই এলাকায় নতুন এসেছেন, শাহানা রাস্তাঘাট খুব একটা চেনে না, একা ছেলেকে নিয়ে বের হতে পারবে না বলে দিল। শাহানা ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝছে না, রুদ্র খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে কোনো সমস্যা টের পাচ্ছে না।
ঠিক এই সময় সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস থেকে তৃতীয় চিঠিটা আসলো। সাথে হরলিক্স। রহিমার মা এবার চিঠি লিখেছে হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ থেকে। আগের মতোই, হাতের লেখা আবারও আলাদা।
“বাজান,
তোমরা তো ভালোই আছ, কষ্টে আছি আমরা। এলাকায় দুর্ভিক্ষ লেগেছে। রহিমা না খেতে খেতে শুকিয়ে গেছে। কি করব বলো বাবা, গরুর খাবার হলো ঘাস, আর মানুষের খাবার হলো গরু, এটাই প্রকৃতির নিয়ম।
খুব ক্ষুধা বাবা, খুব ক্ষুধা। আমাদের অনেকেই তোমাদের ওদিকে চলে আসছে। আমিও রহিমাকে নিয়ে চলে আসব।
বহু দূরের পথ বাজান। খুব কষ্ট।
খাবার রেডি রেখ।
ইতি,
রহিমার মা।”

আকবর সাহেব চিঠিটা পড়ে কেমন জানি একটা ধাক্কা খেলেন। আগের হরলিক্সটা শেষ হয় নি এখনো, এটা লুকিয়ে ফেলতে হবে। কালকে দরকার হলে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে রুদ্রকে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে। চিঠির কথাগুলো এখনো তাঁর চোখে ভাসছে।

“গরুর খাবার হলো ঘাস, আর মানুষের খাবার হলো গরু, এটাই প্রকৃতির নিয়ম।”

কিছু একটা ঠিক নেই। রহিমার মা নিজে মেয়েকে খাওয়াতে পারছে না, অথচ তাঁর ছেলের জন্য হরলিক্স পাঠাচ্ছে।

Something is Definitely Wrong.

৭.

আকবর সাহেব বেশিক্ষণ চিন্তা করতে পারলেন না। অফিসের গাড়ি চলে এসেছে, ছুটতে হবে। যাওয়ার আগে শাহানাকে বলে গেলেন রুদ্রকে চোখে চোখে রাখতে। মেয়েটা বুঝল কি না কে জানে। আকবর সাহেবের সাথে শাহানার বয়সের বিশ বছরের গ্যাপ, মেন্টালিটি ঠিক ম্যাচ না।

দুপুরে ভাত খেতে বসেছেন, মুরগির মাংস আর ডাল দিয়ে, তখন বুঝতে পারলেন রুদ্রের শরীরটা কীসের মতো হয়েছে। ফার্মের মুরগির মতো।

একটু পর শাহানার ফোন আসলো। রুদ্রকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শাহানা গোসল করতে গিয়েছিল, রুদ্র দরজা খুলে বের হয়ে গেছে। আশেপাশে সবাই খোঁজ লাগানো, পুলিশকেও ফোন দেওয়া হয়েছে।

আকবর সাহেব কাঁপতে কাঁপতে তৎক্ষণাৎ বাসায় রওনা দিলেন।

৮.

পরিশিষ্ট

অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখে মিজান ঘুম থেকে উঠল। বহু দূরের এক পৃথিবী থেকে কেউ একজন যোগাযোগের চেষ্টা করছে তার সাথে। সে দুনিয়াবাসীর কাছে উপহার পাঠাতে চায়, প্রথমে উন্নত জাতের খাবার, পরে আরও অনেক কিছু।

মিজানের বিছানার পাশে একটা হরলিক্সের কৌটা। এই হরলিক্সের কৌটাটা তাকে একজনের কাছে পাঠাতে হবে। পাঠানো খুব দরকার। সাথে একটা চিঠিও লিখতে হবে।

মিজান কেমন জানি একটা ঘোরের মধ্যে আছে। সে ঘুম থেকে উঠেই চিঠি লিখতে বসল।

আশেপাশে মিজানের মা চিল্লাচি ল্লিকরছে, “মিজান, আর কত ঘুমাবি? কলেজে যাবি না? আজকে নিউজ দেখেছিস? মহাখালী রেলগেটের কাছে রেল লাইনের ধারে একটা ছেলের লাশ পাওয়া গেছে। দৃশ্য, কেউ নাকি শরীর থেকে হাড় মাংস কেটে খেয়ে নিয়েছে, পড়ে আছে কঙ্কালটা।

কই গেলি মিজান? দরজা খোল...”

দরজা খোলার টাইম নেই, চিঠিটা শেষ করতে হবে। দরদ দিয়ে, মমতা ঢেলে একটা চিঠি লিখতে হবে। হরলিক্সটা খাওয়ানো খুব দরকার। খুব কনভিন্সিং চিঠি হতে হবে।

শেষে নাম লিখতে হবে, রহিমার মা!

মজার তথ্য

ব্যাকগ্রাউন্ডে বিশাল কমোডো ড্রাগন টাইপ সরীসৃপদের নাম মেগালেনিয়া। আজ থেকে মাত্র পঞ্চাশ হাজার বছর আগে এরা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ধারণা করা হয় অস্ট্রেলিয়ার প্রথম আদিবাসীরা এদের দেখেছিল, এদের সাথে লড়াই করেছিল আর এদের বিলুপ্ত করেছিল।

এরা লম্বায় ছিল সাত মিটারের মতো, একটা আড়াই তলা বিল্ডিংকে শোয়ালে যত বড় হয়। একটু ভাবো, আদিম মানুষের গুহায় বা তাঁবুতে গভীর রাতে আচমকা মেগালেনিয়ার আক্রমণ!

তথ্যসূত্র

শার্কের বিবর্তনীয় ইতিহাস

ইমতিয়াজ হোসেন সৈকত

আপনি যখন একটা শার্ককে কল্পনা করেন তখন কি দেখেন? সাধারনত টর্পেডোর মত আকার, পিঠে পাখনা,বড় একটা মুখ, ত্রিভুজাকার দাঁত এবং অর্ধচন্দ্রের মতো লম্বা লেজ।
শার্ক ৪৫০ মিলিয়ন বছরের পুরনো, অন্যান্য অনেক প্রাণীর থেকে এর বসবাসের সময়কাল অনেক বেশি। এরা প্রত্যকটা বড় বড় মাস এক্সটিঙ্কশন থেকে বেঁচে গিয়েছে।
তাদের বির্বতনিয় ইতিহাস জানার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারব তারা কীভাবে বর্তমান রূপে এসেছে।

সিলুরিয়ান যুগ- প্রথম শার্ক

৪৫০ মিলিয়ন বছর আগে সিলুরিয়ান পিরিয়ডে, প্রথম শার্ক একক প্রজাতি হিসেবে বাস করা শুরু করে। এই সময়ে সমুদ্র ভর্তি ছিল বিভিন্ন ধরনের বোনি ফিস (যেসব মাছের কঙ্কাল তরুণাস্থি নয় অস্থি দিয়ে তৈরি) দিয়ে। এরকমই একটা হলো একানথোডিয়ান (Acanthodian) যা ছিল বর্তমান শার্কের পূর্বপুরুষ। এদের আবার স্পাইনি শার্কও বলে, কারণ এদের দেহের পাখনা (লেজ বাদে) হাড় দিয়ে তৈরি। এদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য শুধু শার্কের মতো ছিল না বরং এদের দেহের কঙ্কাল ছিল তরুণাস্থি দিয়ে তৈরি যা দ্বারা শার্ককে চিহ্নিত করা হয়। বর্তমানে যেসকল শার্ক রয়েছে তারা এই মাছ থেকেই বিবর্তিত হয়েছে।

ডেভোনিয়ান যুগের শুরু-

শুরু হয় শার্কের বির্বতন
সিলুরিয়ান যুগের ৫০ মিলিয়ন বছর পরে ডেভোনিয়ান যুগ শুরু হয়। এই সময় প্রথম শার্কের বিবর্তন শুরু হয়। নাম হলো লিওডেনাস শার্ক। খুব কমই জানা গিয়েছে লিওডোনাস শার্ক সম্পর্কে। এদের ফসিলে দ্বিগুন দাঁত থেকে সাইনটিস্টরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে এরা ছিল ২৬ ইঞ্চি লম্বা, দেহের আকার ছিল ইল(eel fish) মাছের মত, স্বাদুপানিতে বাস করত। এই সময়েরই আরেকটি স্বাদুপানির শার্ক হলো অ্যান্টার্কটিলামনা (Antarctilamna)। এই শার্কের আকারও ইল (eel) মাছের মতো তবে এদের মাথার পিছনে একটি ছোট পাখনা ছিল। এই দুই ধরনের

শার্ক xenacanthus গণের অন্তর্ভুক্ত xenacanthus প্রাগৈতিহাসিক শার্কের গণ। এই গণের প্রথম প্রজাতি ডেভোনিয়ান পিরিয়ডের শেষের দিক হতে ট্রায়াসিক পিরিয়ডের শেষ পর্যন্ত বেঁচে ছিল।

ডেভোনিয়ান যুগের শেষের দিকে-

প্রথম আধুনিক শার্কের আবির্ভাব ডেভোনিয়ান যুগের শেষের দিকে, ক্লাডোসিলাক (Cladoselache) বর্তমান শার্কের রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়। ক্লাডোসিলাক তার ইল এর মতো পূর্বপুরুষের তুলনায় ভিন্ন ছিল। কারণ এর বডি মডার্ন শার্কের মতো। এরা ছয় ফিট লম্বা হতে পারে। এদের স্ট্রিমলাইন শেপের বডি, ৫-৭টি ফুলকা, পিঠের উপর পাখনা। ক্লাডোসিলাক আর মর্ডান শার্কের মধ্য পার্থক্য হলো তাদের গোলাকার নাক, ক্লাসপারের অভাব, এদের চোয়াল এদের মাথার সাথে যুক্ত ছিল।

কার্বনিফেরাসের যুগ-

শার্কদের স্বর্ণযুগ

কার্বনিফেরাসের যুগ শুরু হয় ৩৬০ মিলিয়ন বছর আগে। এটা সেই সময় যখন শার্করা সমুদ্রে রাজত্ব করছিল। অর্থাৎ তখন তারা প্রভাবশালী ছিল।

শার্করা তখন বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভক্ত হতে শুরু করে যেমন: রে, স্কেটস, চিমেরা। এই সময়ে শার্কদের বাহ্যিক গঠনে বিচিত্র পরিবর্তন আসে। অদ্ভুত প্রজাতির শার্ক যেগুলো একসময় ছিল তারা এই যুগেই বাস করত। অদ্ভুত প্রজাতির শার্ক যেমন: স্ট্যাথাকেনথাস, ইউজিনিওডোনটিডা যার নিচের চোয়ালের সামনের দিকে দাঁত ছিল এবং ফ্যালাকেটাস যার সাধারণ নাম ইউনিকর্ন শার্ক। এই শার্কের মাথার উপর লম্বা, ধারালো শিং ছিল যা সময়ের সাথে সাথে বির্বতিত হয়। কার্বনিফেরাসের যুগে ৪৫টি ভিন্ন গোত্রের শার্ক ছিল রে (Ray fish) বাদে।

পৃথিবীর ইতিহাসে এই যুগই বিচিত্র ধরনের শার্কের স্বর্গরাজ্য ছিল।

জুরাসিক যুগ-

আধুনিক শার্কের উৎপত্তি

জুরাসিক যুগ প্রায় ২০০ মিলিয়ন বছর আগে শুরু হয়। এই সময়ে ৯২ টি নতুন গোত্রের শার্ক দেখা যায়। এই শার্কগুলো আধুনিক শার্কদের পূর্বপুরুষ। এই সময়ে শার্কদের বির্বতনের মাধ্যমে তাদের চোয়াল বড় হতে থাকে যাতে তারা আরো বড় বড় শিকার ধরতে পারে এবং তাদের লেজের পাখনাও উন্নত হয়, যাতে তারা আরো দ্রুত সাঁতার এবং সহজে সাঁতার কাটতে পারে। কিছু কিছু শার্কের মুখের উন্নতি হয়। কিছু কিছু শার্ক সমুদ্রের গভীরে থাকার কারণে তাদের দেহের অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে। এই সময়ের সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় হলো শিং যুক্ত হাইবোডাস শার্কের উপস্থিতি।

ক্রেটাশিয়াস যুগ-

নানারকমের শার্ক

ক্রেটাশিয়াস পিরিয়ডের সময়, ১৪৫ থেকে ৬৫ মিলিয়ন বছর আগে। বর্তমানে বেঁচে যাওয়া শার্কগুলো আরো উন্নত হয়। গভীর সমুদ্রের শার্কগুলো যেমন: গবলিন শার্ক, ফ্রিলড শার্ক এই ক্রেটাশিয়াস যুগেই উৎপত্তি হয়। এই সময়েই হোয়েল শার্ক, বাস্কিং শার্ক, মেগামাউথ শার্কের প্রথম আবির্ভাব হয়। আবার লেমিনাইড শার্ক যাকে সাধারনত হোয়াইট শার্ক বলা হয়- তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন আজকে যেসব শার্ক দেখা যায় তার মতোই। লেমিনাইড হলো আধুনিক শার্ক যেমন: গ্রেট হোয়াইট, মাকো শার্ক, এবং বুল শার্ক।

সেনোজোয়িক যুগের শুরু-

মেগালোডনের প্রবেশ

সেনোজোয়িক যুগে প্রায় ৬০ মিলিয়ন বছর আগে প্রাগৈতিহাসিক শার্কের আবির্ভাব হয়। এই শার্ক ছিল নির্দয় ও শিকার ধরতে দক্ষ - নাম তার মেগালোডন। মেগালোডন ছিল সবচেয়ে বড় সামুদ্রিক শিকারী যা এক সময় ছিল। মেগালোডন শার্কের তথ্যগুলো অসাধারণ। এরা ৬৫ ফিট লম্বা হতো এবং ভর ৩০ টনের বেশি হতো। ভয়ানক শিকারী যার ৭ ইঞ্চি লম্বা দাঁত দিয়ে তিমি মাছ খেতো। সেনোজোয়িক যুগে ভয়ানক শিকারী হিসেবে শুধুমাত্র

মেগালোডন ছিল না আরও একজন ছিল। নাম হলো অটোডাস। এ হলো মেগালোডনের পূর্বপুরুষ। এরা ৩৯ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতো যা প্রায় দুটো বিরাট গ্রেট হোয়াইট শার্কের সমান।

মডার্ন সেনোজোয়িক-

বর্তমান শার্ক

বেশিরভাগ শার্ক যারা বর্তমান পৃথিবীতে বাস করে তাদের অনেকেই সেনোজোয়িক যুগে ডেভেলপড হয়েছে শুধু ক্রেটাশিয়াস যুগের প্রাচীন শার্ক বাদে। এখনকার শার্কদের মধ্যে নতুন হলো হ্যামারহেড শার্ক। এই শার্কের বির্বতন মাত্র ২০ মিলিয়ন বছর আগে হয়েছে। বর্তমানে সমুদ্রে ৪৪০ প্রজাতির শার্ক রয়েছে। প্রতি বছর নতুন নতুন প্রজাতি আবিষ্কৃত হচ্ছে তাই আমরা বলতে পারব না কোন ইউনিক প্রজাতির শার্ক আমরা নেক্সট খুঁজে পাব।

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ -

শার্ক আমাদের পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে চারশ মিলিয়ন বছর ধরে রয়েছে এবং বড় বড় ৫ টা মাস এক্সটিঙ্কশান থেকে সারভাইভ করেছে। সব মানে ৪৪০ প্রজাতির শার্ক মানুষের কারণে হুমকির মুখে রয়েছে। প্রতি বছর ১০০ মিলিয়ন শার্ক মানুষের কারণে মারা যাচ্ছে। আমরা যদি গণহারে শার্ক হত্যা বন্ধ না করি তাহলে ভবিষ্যতে কোন শার্ক থাকবে না।

রেফারেন্স

Jurassic Park (1993)

রিভিউয়ার: শুভ সালাউদ্দিন

জুরাসিক পার্ক সিরিজের এটাই প্রথম মুভি। মুভিটা প্রকাশ হবার সাথে সাথেই যেন দেখার হিড়িক লেগে যায়। তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে সফল মুভি বনে যায়। সালটা দেখে অনেকেই নিরাশ হতে পারেন, এই ভেবে যে পুরোনো মুভির ভিজ্যুয়ালাইজেশন কেমনই বা হবে! তাহলে বলতেই হয় অনেক কিছুই আপনি মিস করেছেন। দেখুন তারপর ভাবুন।

মিলিয়নিয়ার এক বৃদ্ধ এই পার্ক তৈরি করেছেন যেখানে প্রি-হিস্টোরিক DNA থেকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে ডাইনোসর তৈরি করা হয়েছে। কাহিনী শুরু হয় একটা ভয়ংকর ডাইনোসরকে নিয়ে যেটাকে খাঁচায় বন্দী করতে গিয়ে একজন মারা যায়। সবকিছু ঠিকঠাক আছে কি না তা দেখতে দুইজন জীবাশ্মবিদ ও একজন গণিতবিদকে ডাকা হয়। পার্কে ডাইনোসর দেখার যাত্রায় মিলিয়নিয়ার বৃদ্ধের সাথে তার নাতি-নাতনিও যোগদান করে সাথে একজন আইনজীবীও থাকে। এভাবে ঘটনা এগোতে থাকে।

ডাইনোসরের চারপাশে তার দ্বারা ঘেরা থাকে এবং তারের মধ্য দিয়ে ১০,০০০ ভোল্টের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। এরপরে দেখা যায় পার্কের এক কর্মী ডাইনোসরের ভ্রূণ চুরি করে। সে যাতে ধরা না পরে সেজন্য কম্পিউটার ভাইরাস রান (Run) করায় , যেটা বিদ্যুৎ সাপ্লাই বন্ধ করে দেয়। ফলে একটা বিপদজনক ঘটনা ঘটে যায়। ডাইনোসরেরা যখন বাইরে আসতে চায় তখন বিদ্যুৎ সাপ্লাই না থাকায় তারা তা করতে সক্ষমও হয়। এরপরই শুরু হয় আসল কাহিনী।

হ্যাপি জার্নি।

কেমোসিনথেসিস

পার্থিব রায়

১.

আমাদের বেঁচে থাকতে শক্তি প্রয়োজন। এ শক্তি আসে খাবারের মাঝে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি থেকে। সকল জীবই খাবারের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। কিন্তু এ খাবার আমরা পাবো কোথায়? আমরা কি খাবার তৈরি করতে পারি? কেউ কেউ হয়তো ভাবতে পারে যে বাড়িতে তো মা রান্না করে খাবার তৈরি করছে, কিন্তু ভেবে দেখেছ কি বাড়িতে যে খাবার রান্না করা হচ্ছে তা কেমন করে আসে। আসলে বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদক হিসেবে যারা দায়িত্ব পালন করে তারাই এগিয়ে আসে এক্ষেত্রে। তারা বিশেষ প্রক্রিয়ায় নিজ দেহে খাদ্য তৈরি করে, প্রয়োজন মতো ব্যবহার করে। আর বাস্তুতন্ত্রের খাদকেরা এ খাবারে ভাগ বসায়। আমাদের সবার পরিচিত এই উৎপাদক শ্রেণির আওতায় আসে সবুজ উদ্ভিদ, কিছু শৈবাল ও ব্যাকটেরিয়া যাদের দেহকোষে ক্লোরোফিল থাকে। এসব জীব পরিবেশ থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) ,জল (H_2O) সূর্যের উপস্থিতিতে গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$), জল (H_2O) এবং অক্সিজেন(O_2) গ্যাস তৈরি করে। এ প্রক্রিয়াটির নাম সালোকসংশ্লেষণ তথা ফটোসিনথেসিস (Photosynthesis)। মাটির উপর, বরফের মধ্যে বা নিচে, জলের নিচে- যেখানেই পর্যাপ্ত আলোকশক্তি পাওয়া যায় সেখানেই ফটোসিনথেটিক অর্গানিজমে ফটোসিনথেসিস ঘটে। যেহেতু এ প্রক্রিয়ায় আলোকশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়, তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে ফটোসিনথেসিস। তবে কেউ যদি ভেবে থাকো ফটোসিনথেসিসই শক্তি রূপান্তরিত করে খাদ্য তৈরির একমাত্র উপায়,তাহলে তুমি ভুল ভাবছো। কারণ ফটোসিনথেসিস এর পূর্বসূরী কেমোসিনথেসিস এখনো বেঁচে আছে।

২.

১৮৯০ সাল। রাশিয়ান অণুজীববিজ্ঞানী সার্জেই উইনোগ্রাডস্কি (Sergei Winogradsky) ভাবছেন একটি নতুন বিষয়ে তত্ত্ব প্রকাশ করবেন । আগের বছরগুলোতে সালফার, আয়রন ও নাইট্রোজেন জারণকারী জারণকারী ব্যাকটেরিয়া নিয়ে গবেষণা করার সময় তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে এসব অনুজীব সালোকসংশ্লেষণের চেয়ে ভিন্ন উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন অজৈব অণু ব্যবহার করে শক্তি তৈরি

করতে পারে। তিনি এ শক্তি উৎপাদী প্রক্রিয়ার নাম দিলেন 'অ্যানোরগক্সিড্যান্ট' (Anorgoxydant)। ৭ বছর পরে জার্মান বিজ্ঞানী উইলহেম পেফার(Wilhelm Pfeffer) এ প্রক্রিয়াকে 'কেমোসিনথেসিস' নামে পুনঃনামকরন করলেন। কিন্তু পরবর্তী প্রায় ৯০ বছর কেউ এই তত্ত্বকে আমলে নেয়নি। কিন্তু এ তত্ত্বের ধোঁয়াশা কাটায় অ্যালভিন, বিশ্বের প্রথম সাবমার্সিবল। ১৯৭৭ সালে গ্যালাপ্যাগোস রিফটে (খাদে) নামে অ্যালভিন । বিজ্ঞানীরা প্রায় ধরেই নিয়েছিলেন গভীর সমুদ্রে প্রচন্ড চাপ-তাপমাত্রা সহ্য আলোর অনুপস্থিতিতে জীবনের অস্তিত্ব থাকতেই পারে না। বিজ্ঞানীদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। সেখানে বিচিত্র জীবের দেখা পেল অ্যালভিন। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বুঝে উঠতে পারছিলেন না এমন পরিবেশে কী করে এসব জীব বেঁচে থাকে। এ সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলেন বিজ্ঞানী কলিন ক্যাভানাফ (Colleen Cavanaugh)। তিনি তখন স্নাতক শ্রেণির ছাত্র। তিনি অনেকটা ধারণা করে বললেন কেমোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়ারা যে খাবার তৈরি করে ,সেই খাবার ব্যবহার করেই টিউব ওয়ার্মসহ অন্য জীব বেঁচে থাকে। কিন্তু বললেই সবাই মানবে কেন? পরবর্তীতে তিনি এ প্রক্রিয়াটি প্রমাণ করতে সফল হন। তাই কলিন ক্যাভানাফকেই কেমোসিনথেসিস এর আবিষ্কারক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অনেক তো ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি হলো। এখনো আমাদের কেমোসিনথেসিস কী সেটাই তো বোঝা বাকি।

৩.

ফটোসিনথেসিসের মতো কেমোসিনথেসিসও একটি জৈবরাসায়নিক বিক্রিয়া এবং বিক্রিয়কসমূহের জারণ-বিজারণের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়াটি ঘটে। সহজ করে বলতে, কেমোসিনথেসিস (Chemosynthesis) হলো খাবার তৈরির সেই প্রক্রিয়া যা আলোকশক্তির উপর নয়,নির্ভর করে রাসায়নিক শক্তির উপর। যেসব জীব কেমোসিনথেসিস প্রক্রিয়ায় খাবার তৈরি করতে পারে তাদের বলে কেমোসিনথেটিক অর্গানিজম বা জীব। এ ধরনের অর্গানিজমগুলো সাধারণত গভীর সমুদ্রে হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট, মিথেন ক্লাথরেট, অন্ধকার গুহায় পাওয়া যায়।

এসব কেমোসিনথেটিক অর্গানিজমগুলো যে এলাকায় বাস করে সেখানকার মৌলের প্রাচুর্যের উপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে কেমোসিনথেসিস ঘটায়। তবুও এর মধ্যে দুধরণের পদ্ধতি বেশি দেখা যায়। প্রথম পদ্ধতিতে হাইড্রোজেন (H_2) অণু কার্বন-ডাই-অক্সাইডের (CO_2) সাথে বিক্রিয়া করে মিথেন (CH_4) তৈরি করে। কিন্তু এ পদ্ধতি খুব কমই দেখা যায়। কারণ সব স্থানে হাইড্রোজেন অণু বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় না। অন্য পদ্ধতিতে হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) বা অ্যামোনিয়া (NH_3) জারিত হয়ে কেমোসিনথেসিস ঘটে। তবে এ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন এর উপস্থিতি – অনুপস্থিতি কোনোটাই বাধা প্রদান করে না।

কোনো একটা জীবে কেমোসিনথেসিস এর বিক্রিয়াটা কেমন করে হয় তা রাসায়নিক সমীকরণ আকারে দেখলে মনে হয় সবারই বুঝতে সুবিধা হবে। জায়ান্ট টিউব ওয়ার্মের ট্রোফোজমে থাকা ব্যাকটেরিয়া কেমোসিনথেসিস ঘটায়। হাইড্রোজেন সালফাইড কেমোসিনথেসিস। হাইড্রোজেন সালফাইড,কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেন বিক্রিয়া করে গ্লুকোজ,জল ও সালফার তৈরি করে।

$$18H_2S+6CO_2+3O_2= C_6H_{12}O_6+12H_2O+18S$$
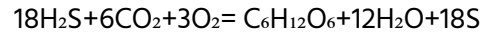
এভাবে ব্যাকটেরিয়াটি খাবার তৈরি করে নিজের অস্তিত্ব নিশ্চিত করার পাশাপাশি জায়ান্ট টিউব ওয়ার্মের অস্তিত্ব বজায় রাখে।

বিক্রিয়াটিতে কিন্তু দেখার মতো একটি বিষয় আছে। আশা করি সকলেই সেটি লক্ষ্য করেছেন। ফটোসিনথেসিসের বেলায় বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে আমরা সবসময় অক্সিজেন পাচ্ছি। কেমোসিনথেসিসে সে নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। এক্ষেত্রে বাইপ্রোডাক্ট মিথেন, সালফার ইত্যাদি হতে পারে। সমুদ্রের আলোকিত স্তরে ফটোসিনথেটিক অর্গানিজমগুলো ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে খাবার তৈরি করে যা খেয়ে বেঁচে থাকে খাদকেরা। তেমনি গভীর,অন্ধকার সমুদ্রে কেমোসিনথেটিক অর্গানিজমগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে যে খাবার(গ্লুকোজ) তৈরি করে তা ব্যবহার করেই বেঁচে থাকে। আর এদের উপর নির্ভর করে ওই অন্ধকার বাস্তুতন্ত্রের খাদকেরা। কেউ কেউ এই কেমোসিনথেটিক অর্গানিজমদেরই খেয়ে নেয়,কেউ কেউ এদের নিজ দেহে বসতি গড়তে দেয়,বদলে এদের তৈরি করা খাবার নিজ দেহে শোষণ করে নেয়।

৪.

আজ থেকে প্রায় ২.৫ থেকে ৩.৫ বিলিয়ন বছর আগে গভীর সমুদ্রে কোনো এক হাইড্রোথার্মাল ভেন্টে শোনা গিয়েছিল প্রাণের প্রথম স্পন্দন। সেই আদিম প্রাণের খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়া ফটোসিনথেসিস হতে পারে না। কারণ সেখানে আলো তো পৌঁছায় না। খাবার তৈরির তাই একমাত্র পথ ছিল এই কেমোসিনথেসিস। জীবন বিবর্তনের

ধারায় গভীর সমুদ্র ছেড়ে চলে আসে অগভীর সমুদ্রে। দেখা পায় আলোর । আলো পেয়ে বিবর্তনের ধারায় কেমোসিনথেসিসও রূপ নেয় ফটোসিনথেসিসে। তাই বলে কেমোসিনথেসিস হারিয়ে যায় নি। সে চুপচাপ গভীর সমুদ্রকে ভালোবেসে সেখানেই থেকে গিয়েছে। যুগে যুগে পৃথিবীতে উল্কাপাত,অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি কারণে অগভীর সমুদ্রে,স্থলে জীবন ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু টিকে যায় গভীর সমুদ্রের এই বিষ্ময়কর জীবেরা। এরাই জীবনকে,বিবর্তনের ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কেমোসিনথেসিস ঘটতে অক্সিজেনের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয়। তাই অ্যানিরোবিক(অবাত) কেমোসিনথেসিসের কারণে মঙ্গলপৃষ্ঠে, বৃহস্পতির চাঁদ ইউরোপায় কিংবা অন্য গ্রহ-উপগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব কিছু নয়। এসবই অবশ্য হাইপোথিসিসের কথা,তাই বলে ফেলনা নয়। তবে অদূর ভবিষ্যতে মহাকাশে সরল প্রাণের দেখা যে পেতে পারে ,সে সম্ভাবনাকে আর উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ফিফটি-ফিফটি প্রবাবিলিটি স্বীকার করতেই হয়।

সহায়ক তথ্যসূত্রঃ [1]

BBC Planet Dinosaur (2011)

রিভিউয়ার: সমুদ্র জিত সাহা

ডাইনোসরের উপর আমার মতে সেরা ডকুমেন্টারি সিরিজ এটা। কারণএখানে শুধু ডাইনোসর বা সমসাময়িক সামুদ্রিক প্রাণীও টেরোসরদের ব্যাপারে বোরিং তথ্য ঢেলে দেয়নি। কীভাবে আমরা এসব তথ্য জানলাম এবং কেন এরকম হয়েছে তারা এসবও বলেছে। তাছাড়াও ২০১১ সাল বিবেচনায় গ্রাফিক্স, ব্যাকগ্রাউন্ড এবং মিউজিকও মোটামুটি ভালো।
৬ পর্বের এই সিরিজে কালের বিবর্তনে টি-রেক্স, স্পাইনোসরাস, জাইগানোটোসরাস থেকে শুরু করে আর্জেন্টিনোসরাস, ভেলোসিরেপ্টর সহ টেরোসরদের নিয়েও বিস্তারিত দেখানো হয়েছে।

কীভাবে বুঝলাম কিছু ডাইনোসর প্রজাতি নিয়মিত মাইগ্রেট করত?
টেরোসররা কীভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে মারা পড়ত?
স্পাইনোসরাসরা জলজ প্রাণী খেতো , এটা কীভাবে জানলাম ?
কীভাবে জানলাম কারকারোডোন্টোসরাস ,
মাজুঙ্গাসরাসরা নিজ প্রজাতির মধ্যে মারামারি করত ?
ফসিলের অবস্থান দেখে, হাড়ে নিজ প্রজাতির দাঁতের তৈরি ক্ষত দেখে, ফসিলের আকার আকৃতি অ্যানালাইজ করে কীভাবে এসব জানতে পারি তা বলা হয়েছে এখানে।
এভাবে, কীভাবে আমরা জানলাম ডাইনোসরদের বৈশিষ্ট্যগুলো , তার একটা ভালো ধারণা পাবেন, মনকে তৃপ্ত করতে পারবেন।

তবে, ২০১১ সালের পরও আমরা ডাইনোসরদের ব্যাপারে অনেককিছু জেনেছি। যেমন কয়েক সপ্তাহ আগেই আমরা জানতে পারলাম স্পাইনোসরাসের স্পাইন লেজের ওপরেও থাকে। এরকম সামান্য অশুদ্ধ তথ্য থাকা সত্ত্বেও এই সিরিজটা হাইলি রেকমেন্ডেড।

ম্যামথের প্রত্যাবর্তন

সাগ্নিক সিংহমহাপাত্র

এক গুরুগম্ভীর সমস্যা:

ঘরের এককোণে আনমনা হয়ে বসেছিলেন হার্ভার্ডের প্রবীণ অধ্যাপক জর্জ চার্চ (George Church)। ভাবছিলেন পৃথিবীর এক জ্বলন্ত সমস্যার কথা। গ্লোবাল ওয়ার্মিং। এ এমন এক সমস্যা যা ধীরে ধীরে পৃথিবীকে ঠেলে দিচ্ছে এক ভয়াবহ ভবিষ্যতের দিকে। আজ থেকে প্রায় এগারো হাজার সাতশত বছর (11,700 years) আগে পৃথিবীতে শেষ হয়েছে প্লিস্টোসিন যুগ (Pleistocene epoch) বা বরফ যুগ (Ice Age)। তারপর ধীরে ধীরে পৃথিবীর উষ্ণতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের সভ্যতা যত উন্নত হয়েছে, তার সাথে তাল মিলিয়ে বেড়েছে পৃথিবীর উষ্ণতা। প্লিস্টোসিন যুগের অবসান প্রাকৃতিক কারণে হলেও আজকের উষ্ণতা বৃদ্ধির পেছনে আছে কৃত্রিম হস্তক্ষেপ। কিন্তু এভাবেই যদি চলতে থাকে তাহলে পৃথিবীতে আর কতদিন প্রাণ থাকবে? ক্রমাগত বেড়ে চলা উষ্ণতার কারণে ধীরে ধীরে সমস্ত জীব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এই বিলুপ্ত প্রাণীর তালিকায় একদিন যুক্ত হবে মানুষও।

এসব ভাবতে ভাবতে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল জর্জের। এই যে এত গবেষণা, উদয়াস্ত পরিশ্রম, ল্যাবরেটরিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নানা এক্সপেরিমেন্ট - এসবের মানেই বা কী, যদি না এই সংকটের কোনো সমাধান বের করা যায়? মানব সভ্যতা কী তবে এভাবেই একদিন শেষ হয়ে যাবে? কিছুই কি আর করার থাকবে না? মানুষও কি একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে ম্যামথের মত? হঠাৎ জর্জের মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। আচ্ছা, যদি ম্যামথকেই আবার ফিরিয়ে আনা যায়!

সাইবেরিয়ান পার্মাফ্রস্টের গলন- প্রাকৃতিক টাইম বোমা:

বর্তমান সময়ে পৃথিবীর জন্য সবচেয়ে আতঙ্কের বিষয় হলো সাইবেরিয়ান পার্মাফ্রস্টের গলন। কিন্তু কী এই পার্মাফ্রস্ট? কেনই বা এর গলন বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানীদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে? চলুন দেখা যাক।

আর্কটিক অঞ্চলে মাটির তিনটি স্তর দেখা যায়। এই তিনটি স্তর যথাক্রমে:

(১) Active Layer বা সক্রিয় স্তর (সবচাইতে উপরের স্তর)

(২) পার্মাফ্রস্ট (Permafrost)

(৩) আনফ্রোজেন স্তর

এই অঞ্চলে বছরের বেশিরভাগ সময় উষ্ণতা 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম থাকায় মাটির কৈশিক জল (Capillary Water) জমে বরফ হয়ে যায়। যদি দুই বছর বা তার থেকে বেশি সময় ধরে মাটির উষ্ণতা 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম থাকে তখন জমাট বাঁধা কৈশিক জল যুক্ত মাটির ওই স্তরটিকে পার্মাফ্রস্ট আখ্যা দেয়া হয়। সুতরাং বুঝতেই পারছেন এই পার্মাফ্রস্ট স্তরটির উষ্ণতা খুবই কম থাকে। প্লিস্টোসিন যুগে এবং তার পরবর্তী সময়ে যে সমস্ত প্রাণী এবং উদ্ভিদ মারা গিয়ে মাটির তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে তাদের মাইক্রোব দ্বারা ডিকম্পোজ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু পার্মাফ্রস্ট এর উষ্ণতা অত্যধিক কম হওয়ায় এই ডিকম্পোজিশন বাধা পায়। আমরা জানি, ডিকম্পোজিশন এর মাধ্যমে জীবদেহ বিশ্লিষ্ট হয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ,মিথেন প্রভৃতি গ্রীন হাউজ গ্যাস উন্মুক্ত হয় যেগুলি পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি করে। এখন যদি পার্মাফ্রস্টের উষ্ণতা ক্রমশ বাড়তে থাকে তাহলে এই ডিকম্পোজিশনের প্রক্রিয়া আবার চালু হয়ে যাবে। এর ফলে প্রচুর পরিমাণে গ্রীণ হাউজ গ্যাস উৎপন্ন হবে। বিজ্ঞানীদের মতে, পার্মাফ্রস্টে যে পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড বন্দী আছে তা বর্তমানে বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের দ্বিগুণ! এছাড়া মিথেন কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর তুলনায় ৮৬ গুণ বেশি সক্ষম সূর্য থেকে আগত তাপশক্তিকে ধরে রাখতে। পার্মাফ্রস্ট এর ক্রমাগত গলনের ফলে এই সকল গ্রীন হাউজ গ্যাস বায়ুমণ্ডলে মুক্ত হচ্ছে যার ফলে উষ্ণতাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইজন্য অনেক বিজ্ঞানী পার্মাফ্রস্টকে প্রাকৃতিক টাইম বোমা আখ্যা দিয়েছেন।

ফিডব্যাক লুপের জাঁতাকল:

পার্মাফ্রস্টের গলনের ঘটনায় একটি অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করেছেন? এক্ষেত্রে ঘটনার কারণ (Cause) এবং ফলাফল (Effect) দুটিই এক - পরিবেশের উষ্ণতা বৃদ্ধি। ক্রমাগত বর্ধনশীল উষ্ণতার কারণেই পার্মাফ্রস্ট ক্রমাগত গলছে এবং গলনের ফলে যে সমস্ত গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গত হচ্ছে সেগুলি পুনরায় পরিবেশের উষ্ণতা বৃদ্ধি করছে, যা আবার পার্মাফ্রস্টের গলনকেই ট্রিগার করছে। এই কারণে একটি লুপ তৈরি হয়েছে, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় 'ফিডব্যাক লুপ' (Feedback Loop) বলা হয়। আতঙ্কের কথা হল, পার্মাফ্রস্টে শুধু যে গ্রিনহাউজ গ্যাস বন্দী আছে তা নয়, এর মধ্যে আছে প্রচুর পরিমাণে পারদ (nearly 15 million gallon) যা একটি ক্ষতিকারক নিউরোটক্সিন। তাই এখন কীভাবে এই ফিডব্যাক লুপকে ব্রেক করা যায় তা খুঁজে বের করতে বিজ্ঞানীরা উঠে পড়ে লেগেছেন।

প্লিস্টোসিন পার্ক- সম্ভাব্য সমাধান:

আশ্চর্যের কথা, বর্তমান সময়ের এই সমস্যার সমাধান লুকিয়ে আছে প্রাচীন পৃথিবীতে। রাশিয়ান বিজ্ঞানী সার্গেই জিমভ (Sergei Zimov) এবং তাঁর ছেলে নিকিতা জিমভ (Nikita Zimov) পার্মাফ্রস্টের ফিডব্যাক লুপকে ভাঙার একটি উপায় বের করেছেন। সেটি হল 'প্লিস্টোসিন পার্ক' (Pleistocene Park)। অনেকেরই হয়তো এই নামটা শুনে জুরাসিক পার্কের কথা মনে পড়ে গেল। ব্যাপার অনেকটা সেরকমই। সাইবেরিয়ান স্টেপ অঞ্চলে প্লিস্টোসিন যুগের বিলুপ্ত প্রাণীদের ফিরিয়ে এনে এই পার্ক তৈরি করার পরিকল্পনা এই দুই বিজ্ঞানীর। কিন্তু কীভাবে বিলুপ্ত প্রাণীদের ফিরিয়ে আনা হবে? এ কি আদৌ সম্ভব? যাদের মনে এই প্রশ্ন আসছে তাদের বলি, হ্যাঁ ,সম্ভব! বিলুপ্ত প্রাণীদের ফিরিয়ে আনার এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ডি-এক্সটিঙ্কশন (De-extinction)।

কিন্তু কোন বিলুপ্ত প্রাণীকে ফিরিয়ে আনা হবে? এর উত্তর দেবেন হার্ভার্ডের ওই প্রবীণ জেনেটিসিস্ট - প্রফেসর জর্জ চার্চ।

ডি-এক্সটিঙ্কশন- জিনোম এডিটিং এর জাদু:

ডি-এক্সটিঙ্কশনের এই গল্প কিন্তু আজকের নয়। 2003 সালে স্পেনে বুকার্ডো (Bucardo) নামক বুনো ছাগলের একটি প্রজাতির ডি-এক্সটিঙ্কশন করা হয়। এটি ছিল পৃথিবীর প্রথম সফল ডি-এক্সটিঙ্কশন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রাণীটি কয়েক মিনিটের বেশি বাঁচেনি।

এবার বেশ কয়েক বছর পিছনে চলে যাওয়া যাক। 1987 সাল। জাপানের ওসাকা ইউনিভার্সিটির গবেষক ইয়োসিজুমি ইসিনো (Yoshizumi Ishino) এবং তাঁর সহকারীরা ল্যাবে কাজ করতে করতে হঠাৎই আবিষ্কার করে ফেলেন এক ডিএনএ সিকোয়েন্স। এই সিকোয়েন্সের নাম CRISPR, যার অর্থ 'clustered regularly interspaced short palindromic repeats'। অর্থাৎ এরমধ্যে বেশ কিছু প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্স আছে যেগুলোর মধ্যে স্পেস বা ব্যবধান বর্তমান। দুটি প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্স এর মাঝের এই

অংশকে বলা হয় স্পেসার ডিএনএ (Spacer DNA)। CRISPR প্রথম পাওয়া যায় ব্যাকটেরিওফাজ এর মধ্যে যেটি একটি প্রোক্যারিওটাকে আক্রমণ করেছিল। গবেষণার মাধ্যমে বোঝা যায় যে এই CRISPR প্রকৃতপক্ষে একটি প্রোক্যারিওট ইমিউন সিস্টেম। এর কাজ আক্রমণকারী ভাইরাসের একটি ডিএনএ সিকোয়েন্স কে চিহ্নিত করে সেটিকে ভেঙে দেওয়া যাতে ভাইরাসটি তার কোনো ক্ষতি করতে না পারে। এই কাজে অংশগ্রহণ করে একটি উৎসেচক যার নাম Cas9 (CRISPR-associated protein 9)। প্রথমে আক্রমণকারী ভাইরাসের ডিএনএ এর একটি ছোট অংশ কেটে নেওয়া হয়। তারপর ওই ছোট অংশটি দিয়ে কিছুটা লম্বা একটি সেগমেন্ট তৈরি করা হয়। একে বলা হয় CRISPR arrays। এরপর ট্রান্সক্রিপশন এর মাধ্যমে ওই ডিএনএ সেগমেন্ট থেকে আরএনএ প্রস্তুত করা হয়। এই আরএনএ টি Cas9 উৎসেচকটিকে গাইড করে নিয়ে যায়। এই জন্য একে বলা হয় গাইড আরএনএ (Guide RNA or gRNA)। ভাইরাসের ডিএনএ'র মধ্যে ওই নির্দিষ্ট সিকোয়েন্সটি Cas9 কে খুঁজে দেয় gRNA। এরপর Cas9 ওই নির্দিষ্ট অংশটি কেটে দিয়ে ভাইরাসটিকে অকেজো করে দেয়।

CRISPR এর উপর ক্রমাগত গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন, gRNA এর বদলে তাঁরা তাঁদের প্রোগ্রাম করা আরএনএ কে Cas9 এর সঙ্গে যুক্ত করে ডিএনএর একটি পছন্দমত অংশ কেটে নিতে পারেন এবং তারপর সেখানে আরেকটি ডিএনএ সিকোয়েন্স যুক্ত করতে পারেন। একে বলা হয় ডিএনএ এডিটিং। যখন ডিএনএর একটি নির্দিষ্ট অংশ যেটি একটি প্রোটিন কে কোড করে (এক কথায় যাকে জিন বলা হয়) তাকে এই পদ্ধতিতে এডিট করা হয় তখন সেই পদ্ধতিকে বলা হয় জিনোম এডিটিং বা জিন এডিটিং। 2015 সাল থেকে CRISPR-Cas9 কে বাণিজ্যিকভাবে জিনোম এডিটিং এর কাজে ব্যবহার করা শুরু হয়।

প্রফেসর চার্চ এই CRISPR-Cas9 ব্যবহার করে ডি এক্সটিংশন করতে চাইলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল চার হাজার বছর আগে অবলুপ্ত উলি ম্যামথ (Woolly mammoth) কে ফিরিয়ে আনা। এজন্য তাঁর প্রয়োজন ছিল ম্যামথ এর ডিএনএ স্যাম্পেল। এক্ষেত্রে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ডিএনএ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ডিএনএ এর ক্ষয়ের এই হার হিসেব করে দেখা গেছে ডিএনএ'র হাফ লাইফ বা অর্ধায়ু হল 521 বছর। তাই বর্তমানে ম্যামথ এর যে জীবাশ্ম পাওয়া যায়, তারমধ্যে অর্ধেক পরিমাণের কিছু কম ডিএনএ এখনও অক্ষত আছে। তাহলে কীভাবে আবার ম্যামথকে ফিরিয়ে আনা যাবে? বর্তমান সময়ে ম্যামথের যে উত্তরপুরুষ এখনও জীবিত আছে তা হল এশিয়ান এলিফ্যান্ট । এখন CRISPR-Cas9 ব্যবহারের মাধ্যমে এই এশিয়ান এলিফ্যান্ট এর ভ্রূণের জিনোম এডিট করে তাতে যুক্ত করা হবে ম্যামথের ডিএনএ। তারপর সেখান থেকে জন্ম হবে নতুন ম্যামথের। কিন্তু সমস্যা হলো, এক্ষেত্রে আমরা যে ম্যামথটিকে পাব সেটি 100% উলি ম্যামথ হবে না। সেটি হবে উলি ম্যামথ এবং এশিয়ান এলিফ্যান্ট এর একটি হাইব্রিড যার মধ্যে উলি ম্যামথের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দেখা মিলবে। যেমন- সারা গায়ে পশমের আবরণ, প্রবল শীত সহ্য করার ক্ষমতা প্রভৃতি। এখন আপনি বলতে পারেন, তাহলে তো আমরা যেটা পেলাম সেটা তো একটা হাইব্রিড বৈ আর কিছুই নয়। হ্যাঁ মানছি এটা হাইব্রিড, কিন্তু এটি একটি বিশেষ ধরনের হাইব্রিড যেখানে একটি বিলুপ্ত প্রাণীর সঙ্গে একটি জীবিত প্রাণীর ডিএনএ'র সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। এই কথা শুনে আপনি আবার হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারেন, তাহলে কি মিলিয়ন বছর আগে যে সকল প্রাণী অবলুপ্ত হয়ে গেছে (যেমন - ডাইনোসর) সেগুলির ডি-এক্সটিঙ্কশন কি সম্ভব নয়? উত্তর হলো, না। কারণ এত বছর আগের জীবাশ্মগুলি থেকে অক্ষত ডিএনএ স্যাম্পল পাওয়া যাবে না। এছাড়া এত বছর আগে বিলুপ্ত প্রাণীর কোনো উত্তরপুরুষ এখন আর বেঁচে নেই । তাই তাকে ফিরিয়ে আনা আপাতত সম্ভব নয়।

কীভাবে হবে সমাধান:

এই পর্যন্ত পড়ে আপনারা হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে এই ডি-এক্সটিঙ্কশন এর সঙ্গে গ্লোবাল ওয়ার্মিং প্রতিরোধ করার একটি সম্পর্ক আছে। কিন্তু কীভাবে এটা হবে? আগেই বলেছি যে পার্মাফ্রস্টের গলনের জন্য একটি ফিডব্যাক লুপের সৃষ্টি হয়েছে। এই ফিডব্যাক লুপকে ভাঙ্গার জন্য যে করেই হোক সাইবেরিয়ান অঞ্চলের উষ্ণতা কমাতে হবে। আর এই উষ্ণতা কমানোর জন্য সাইবেরিয়ার স্টেপ তৃণভূমি অঞ্চলে আবার ঘাসের পরিমাণ বাড়াতে হবে, যেমনটা ছিল আজ থেকে 4000 বছর আগে। এই ঘাস সূর্যরশ্মিকে প্রতিফলিত করতে সক্ষম, যার ফলে মাটি ওই সূর্যরশ্মি শোষণ করতে পারে না এবং তাই মাটির উষ্ণতা আর বাড়তে পারে না। এই ঘটনাকে বলা হয় অ্যালবেডো এফেক্ট (Albedo effect)। ঘাসের ক্ষেত্রে এই অ্যালবেডো এফেক্টের পরিমাণ বড় গাছের তুলনায় বেশি। এখন ওই অঞ্চলে ঘাসের পরিমাণ বাড়াতে হলে আবার প্লিস্টোসিন যুগের তৃণভোজী প্রাণীদের ফিরিয়ে নিয়ে আসতে

হবে। এই সকল বৃহৎ তৃণভোজী প্রাণীদের সঞ্চরণ এবং মলত্যাগের ফলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে, ফলে আরও বেশি পরিমাণ ঘাস উৎপন্ন হবে। ভবিষ্যতে ম্যামথ ছাড়াও রেনডিয়ার, বাইসন, ইয়াকুট ঘোড়া প্রভৃতি বিলুপ্ত প্রাণীদের ফিরিয়ে আনার কথা ভাবা হচ্ছে। দেখা গেছে, যদি এই সকল প্রাণীদের আবার স্টেপ তৃণভূমি অঞ্চলে ফিরিয়ে আনা যায় তবে পার্মাফ্রস্টের উষ্ণতা অন্ততঃ 15 ডিগ্রী ফারেনহাইট কমানো সম্ভব।

এই বিষয়ে গবেষণা এখনও জারি আছে। আশা করা যায়, কয়েক বছরের মধ্যেই আমরা এর বাস্তব রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করতে পারব। ততদিন অবধি অবশ্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

রেফারেন্স

দৈত্যাকার কীট

অয়ন ভৌমিক

আচ্ছা ক্যাটারপিলার চিনেন? ওই যে মাঝে মাঝে দেখা যায় অনেকগুলো পা-ওয়ালা ছোট কিউট একটা পোকা... (অবশ্য অনেকের কাছে কিউট নাও লাগতে পারে)। মনে করেন একদিন আপনি আপনার বাসার লনে একটা চেয়ারে বসে চা খাচ্ছেন, এমন সময় দেখলেন একটা দুই মিটার (ছয়--সাত ফুট) লম্বা আর আধা মিটার (দেড় ফুট) চওড়া ক্যাটারপিলার আপনার দিকে তেড়ে আসছে...

কি, ভয় পেলেন? আর আমি যদি বলি এই ধরনের ক্যাটারপিলার বাস্তবে ছিল? শুধু তাই না, আমাদের পরিচিত প্রায় সকল পোকামাকড়ই একসময় তিন-চার গুণ বড় আকৃতির ছিল। এবার নিশ্চয়ই অবাক হবেন। চলুন, একটু বিস্তারিত জানা যাক।

আজ থেকে ৩৬ কোটি বছর পূর্বে পেনসিলভ্যানিয়ান পিরিয়ডে পৃথিবীতে অস্তিত্ব ছিল এই দানবীয় পোকাটির। শুধু তাই না, এসময় আর্থ্রোপোডা পর্বের প্রায় সকল প্রাণীই ছিল আমাদের বর্তমান যুগের চেয়ে কয়েকগুণ বড়। একটা ফড়িং এর আকার ছিল প্রায় একটা বাজপাখির সমান!

তাহলে কেন তখন পোকামাকড়ের আকৃতি এত বিশাল ছিল? আর কেনই-বা পরে তারা এত ছোট হয়ে গেল?

দুটি প্রশ্নের উত্তর মূলত একই... সেটা হলো অক্সিজেনের কারণে! মিসিসিপিয়ান যুগে ও পেনসিলভ্যানিয়ান যুগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি (সেই যুগে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ছিল ৩৫ শতাংশ। এখন বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ২৬ শতাংশ)। প্রথমে আসি ওই সময় কেন অক্সিজেন এর মাত্রা এত বেশি ছিল??

তার কারণ হলো, সেসময় বনাঞ্চল এর আধিক্য ছিল। মূলত ডেভোনিয়ান পিরিয়ড (৪০.৫ কোটি বছর আগে) থেকেই পৃথিবীতে বনাঞ্চল গঠন শুরু হয় আর পেনসিলভ্যানিয়ান যুগে এসে ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটে, স্থলভাগ প্রায় পুরোটাই বনাঞ্চলে ভরে যায় আর সমুদ্রেও অ্যালগির প্রাচুর্য দেখা যায়। পক্ষান্তরে প্রাণীর সংখ্যা ছিল একেবারেই কম। ফলে উদ্ভিদ প্রচুর অক্সিজেন উৎপন্ন করত। এছাড়া অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি হওয়ার আরেকটা কারণও ছিল, বর্তমানে কিছু পোকা ও ব্যাকটেরিয়া মৃত গাছপালাকে ডিকম্পোজ করে তাদের দেহের কার্বনকে কার্বন-ডাই-অক্সাইডে পরিণত করে। ফলে অক্সিজেন আর কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ব্যালেন্স রক্ষা হয়। কিন্তু সেই যুগে এইসব ব্যাকটেরিয়া ও পোকার আগমন ঘটেনি। ফলে অক্সিজেনের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। মৃত গাছপালা প্রকৃতিতে সরাসরি কার্বন হিসেবেই জমা হত এবং একসময় মাটিচাপা পড়ে কয়লা ও পেট্রোলিয়ামের খনির সৃষ্টি করেছিল (এইজন্য মিসিসিপিয়ান পিরিয়ড ও পেনসিলভ্যানিয়ান পিরিয়ডকে একত্রে কার্বনিফেরাস যুগ বলা হয়)।

এবার আসি বেশি অক্সিজেনের সাথে পোকামাকড়ের আকৃতির সম্পর্ক কী? এটা বুঝার জন্য আমাদের দেখতে হবে পোকামাকড় কীভাবে নিঃশ্বাস নেয়। কিন্তু কোনো ফুসফুস নেই। ফলে আমাদের দেহে অক্সিজেনের প্রয়োজন বেশি হলে আমরা যেমন দ্রুত শ্বাস-

প্রশ্বাস নিয়ে আমাদের দেহে অক্সিজেন শোষণের পরিমাণ বাড়াতে পারি, বা অক্সিজেনের আধিক্য দেখা দিলে আস্তে আস্তে শ্বাস নিয়ে দেহে অক্সিজেনের ব্যালেন্স করতে পারি, ওরা কিন্তু সেটা পারে না। পতঙ্গদের মূলত দেহের দুইপাশে অনেকগুলো স্পাইরাকল নামক ছিদ্র থাকে, এই ছিদ্রগুলোর সাথে ট্রাকিয়া নামক একটা নালি যুক্ত থাকে, ট্রাকিয়া শরীরের একটু ভেতরে গিয়ে ট্রাকিওল নামের কয়েকটা নালিতে বিভক্ত হয়, এই ট্রাকিওলগুলো টিস্যু রসে ভরা থাকে। ফলে বাতাস স্পাইরাকল দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে ট্রাকিয়া হয়ে ট্রাকিওলের কাছে যায়, এরপর ব্যাপন পদ্ধতিতে গ্যাসের আদান-প্রদান ঘটে। পরে ট্রাকিওলের টিস্যুরসের মাধ্যমে অক্সিজেন প্রতিটি কোষে পৌঁছে যায় (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর প্রাণীবিজ্ঞান বইয়ে বিস্তারিত পাবেন)।

এইখানে লক্ষণীয় হলো, পতঙ্গদের শরীরে বাতাস "টেনে নেওয়ার" কোনো মাধ্যম নেই, বাতাস স্বাভাবিকভাবে যতটুকু প্রবেশ করে, ততটুকু অক্সিজেনই তারা পায়, ফলে সেটুকু অক্সিজেন দিয়ে তারা যতগুলো কোষকেজীবিত রাখতে পারবে, তাদের দেহ ততগুলো কোষের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তাই বর্তমানে পরিবেশে অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকায় তাদের শরীরে অক্সিজেন প্রবেশ করে কম, ফলে তাদের শরীরে কোষের সংখ্যাও হয় তুলনামূলক কম। আর পেনসিলভ্যানিয়ান পিরিয়ডে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন বেশি থাকায় পতঙ্গদের শরীরে কোষের সংখ্যাও বেশি ছিল, ফলে তারা আকারে তুলনামূলক বড় ছিল।

এখন, যদি এটাই সত্যি হয়, তাহলে আমরা যদিকোনো পোকাকে কোনো কৃত্রিম পরিবেশে রেখে সেখানে অক্সিজেন লেভেল বাড়িয়ে দিই, তাহলে কি পোকার আকারও বেড়ে যাবে?

উত্তর হলো,হ্যাঁ। অ্যারিজোনা স্টেট এর কিছু গবেষক একটা কৃত্রিম বায়োমে কিছু আর্থ্রোপোড পোকামাকড়কে রেখে সেখানে অক্সিজেনের লেভেল বাড়িয়ে দেখলেন, সেখানে পোকামাকড়ের আকার আসলেই স্বাভাবিকের থেকে বড় হচ্ছে। অবশ্য মিশিগান স্টেটের বিজ্ঞানীরা একটু ভিন্ন কথা বলেছেন। পতঙ্গরা শ্বাস নেওয়ার জন্য যে স্পাইরাকল নামের ছিদ্র ব্যবহার করে সেটা প্রাপ্তবয়স্ক পোকারা চাইলে বন্ধ করে রাখতে পারে। ফলে দেহে অক্সিজেন বেশি চলে গেলে স্পাইরাকল বন্ধ রেখে দেহে অক্সিজেনের স্যাচুরেশন কমানো যায়। কিন্তু পোকাদের লার্ভার স্পাইরাকল বন্ধ রাখার কপাটিকা থাকে না। তাই তাদের শরীরে বেশি অক্সিজেন চলে গেলেও নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা তাদের দেহে নেই। মিশিগান স্টেট এর বিজ্ঞানীদের ভাষ্যমতে, পেনসিলভ্যানিয়ান যুগে পোকার লার্ভাগুলোর মধ্যে যেগুলো ছোট লার্ভা হতো, সেগুলোর কম অক্সিজেন লাগত আর পরিবেশে বেশি অক্সিজেন থাকার কারণে সেগুলোর দেহে অক্সিজেন স্যাচুরেশন বেড়ে সেগুলো মারা যেত বা বেশি অক্সিজেন স্যাচুরেশান এর কারণে অনেক শারীরিক সমস্যা নিয়ে বড় হত। কিন্তু মিউটেশন এর ফলে লার্ভাগুলো বড় হতো সেগুলোর দেহে কোষের সংখ্যা বেশি হওয়ায় ওদের শোষ করা বেশি সংখ্যক কোষে ছড়িয়ে পড়ে ব্যালেন্স হয়ে যেত। ফলে বড় লার্ভাগুলো সুবিধা পেতো, ফলে বিবর্তনিক ধারায় বড় লার্ভাগুলো টিকে যেত।এভাবে পোকাদের লার্ভা বড় হয়ে
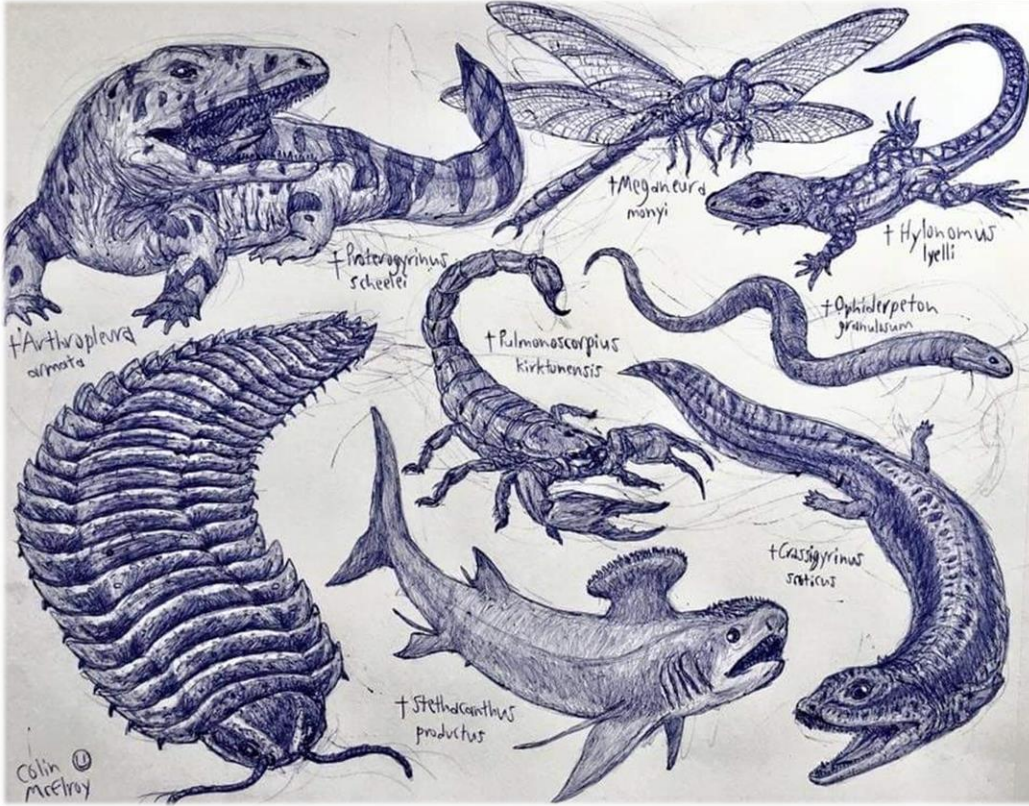
যেতে থাকে, এবং বড় লার্ভা থেকে বড় পোকা তৈরি হতে থাকে। এজন্যই পোকাদের আকৃতি ক্রমেই বড় হতে লাগল

এবার আসা যাক, এই বড় পোকারা বিলুপ্ত হয়ে গেল কীভাবে?

অবশ্যই এখানেও বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন লেভেলই দায়ী। পার্মিয়ান পিরিয়ডের (পেনসিলভ্যানিয়ান পিরিয়ডের পরের ধাপ, ২৭.৫ কোটি বছর আগে) শেষ দিকে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের লেভেল নাটকীয়ভাবে কমে যায়। ওই সময় অক্সিজেনের লেভেল এসে দাঁড়ায় ১৬ শতাংশে।

এই যুগে অক্সিজেন হঠাৎ এত কমে যাওয়ার কারণ কী, তা বিজ্ঞানীরা এখনও জানেন না। আবার একই সময় মৃত গাছপালাকে পচাতে সক্ষম ব্যাকটেরিয়ার আগমন ঘটে এবং এদের ডিকম্পোজিশন ক্রিয়ার ফলে অক্সিজেন লেভেল আরও কমতে থাকে। ফলে দানবাকৃতির পোকাদের জন্য বেঁচে থাকা ক্রমশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। শুধু দানবাকৃতির কীটই নয়, এই অক্সিজেন লেভেলের কমার কারণে প্রচুর জীব বিলুপ্ত হয়, এই সময় পৃথিবীর প্রায় ৯৬ ভাগ মেরিন স্পিসিজ এবং ৭০ ভাগ টেরেস্ট্রিয়ালভার্টিব্রেট বিলুপ্ত হয়। এই বিলুপ্তির ঘটনাটির নাম পার্মিয়ান-ট্রায়াসিক এক্সটিঙ্কশন ইভেন্ট এবং এটি পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক বিলুপ্তির ঘটনা। আর্থ্রোপোড কীট বিলুপ্তির জন্য এই ঘটনাটিকেই মূলত দায়ী করা হয়, এইজন্য এই বিলুপ্তিটি Mass Extinction of Insects নামেও পরিচিত।

এইসময় আবার আর্থ্রোপোডদের বিবর্তন ঘটতে থাকে বিপরীত দিকে। অর্থাৎ বড় লার্ভাগুলো মারা যেতে থাকে এবং মিউটেশনের ফলে উৎপন্ন ছোট লার্ভাগুলো সুবিধা পেয়ে টিকে যায়। ফলে আবার পোকাগুলোর আকার ক্রমশ ছোট হতে থাকে এবং বড়গুলো বিলুপ্ত হতে থাকে।

অনেকবিজ্ঞানী অবশ্য মনে করেন ওই সময় দৈত্যাকার পোকাগুলো অধিকাংশ বিলুপ্ত হলেও একেবারে সবাই ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে , তা না। পুরোপুরি বিলুপ্ত হতে এই পোকাগুলোর আরও সময় লেগেছিল। তাই পোকাগুলোর চূড়ান্ত বিলুপ্তির জন্য বিজ্ঞানীরা আরও একটি কারণকে দায়ী করেন, সেটা হলো আধুনিক পাখিদের আগমন।

জুরাসিক যুগের শেষ দিকে প্রায় ১৫ কোটি বছর আগে আর্কিওপটেরিক্স এর আবির্ভাব ঘটে। আর্কিওপটেরিক্স ছিল সরীসৃপদের থেকে বিবর্তিত এবং আধুনিক পাখিদের পূর্বপুরুষ। আর্কিওপটেরিক্স থেকে আধুনিক পাখিদের আবির্ভাব ঘটে(মতভেদ আছে)। পাখিরা ছিল সব দিক দিয়েই পতঙ্গদের থেকে উন্নত। ফলে এই পতঙ্গগুলো পাখিদের সাথেপ্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি।

পাখিগুলো দুইভাবে পতঙ্গের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরাসরি পাখিগুলো বড় পতঙ্গদের ধরে খেতে শুরু করে। অন্যদিকে কিছু মাংসাশী বড় পতঙ্গের খাদ্য ছিল ছোট পতঙ্গ। কিন্তু পাখিদের খাদ্যও ছোট পতঙ্গ হওয়ায় এরা পাখিদের সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকতে পারেনি। আর আগের বিলুপ্তির ফলে এদের সংখ্যা এমনিতেই অনেক কমে গিয়েছিল, তাই সব মিলিয়েই বিলুপ্ত হয়েছিল এরা।

এই পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য আর্থ্রোপোডদের চেয়ে বেশি কষ্ট বোধহয় আর কেউ করেনি। একবার ছোট থেকে বড় হয়েছে, আবার বড় থেকে ছোট হয়েছে। কী একটা অবস্থা!

অবশ্য কষ্টের ফলও ওরা পেয়েছে, বর্তমানে প্রাণিজগতের সবচেয়ে বড় পর্ব আর্থ্রোপোডা। সারা পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ প্রাণী আর্থ্রোপোডা পর্বের অন্তর্ভুক্ত।

মজার তথ্য

পৃথিবীতে ৩৫% এর মতো অক্সিজেন ছিল বহু আগে, কার্বোনিফেরাস যুগে। সে সময় অক্সিজেনের আধিক্য জায়ান্ট পোকামাকড়ের জন্ম দেয়। ডাইনোসরের যুগের বেশিরভাগ সময় অক্সিজেন ছিল বর্তমানের চেয়ে অনেক কম। জুরাসিকের শেষ থেকে ক্রেটাসিয়াস, পরে প্যালিওজিন পর্যন্ত অক্সিজেন আবার বেড়েছে, যদিও কখনো ৩৫% এর কাছাকাছি যায়নি। পরে কমে বর্তমান অবস্থায় এসেছে।

তথ্যসূত্র

চা, কফির রসায়ন

মার্জিয়া মেহজাবিন তন্বি

কফির রসায়নঃ

কফি উল্লেখ করলেই যেই রাসায়নিক যৌগের নাম সাথে সাথে মনে চলে আসে সেটা হলো ক্যাফেইন (caffeine)। তবে, মস্তিষ্কে এই ক্যাফেইনের প্রভাব ভালোভাবে নথিভুক্ত রয়েছে - তাছাড়া এটি মস্তিষ্কের অ্যাডিনোসিন রিসেপ্টরগুলির সাথে আবদ্ধ হয় - কিন্তু কফির স্বাদ ব্যাপারটা এলে অন্যান্য সময়ের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি চিন্তা মাথায় আসে। তো দেখা যায় যে এই কফির মধ্যে বিদ্যমান রাসায়নিক যৌগের ভান্ডার এর স্বাদকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। যদিও এর মধ্যে কিছু যৌগ দুর্বল বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

কফির মধ্যে ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড নামের একটি যৌগ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।
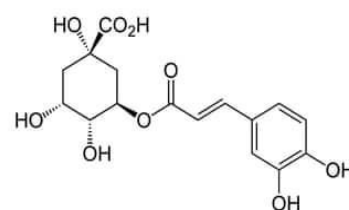
এই যৌগগুলি আনরোস্টেড কফির বীজে ৮% অবধি থাকে। ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড নাম থাকা সত্ত্বেও তাদের কাঠামোতে কোনও ক্লোরিন পরমাণু থাকে না - বরং যখন এই অ্যাসিডগুলি অক্সিডাইজ করা হয় তখন হালকা সবুজ বর্ণ তৈরি হতে দেখা যায়। যখন কফি বীজগুলি সেদ্ধ করা হয় তখন এই ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড বিভিন্ন রকমের যৌগ তৈরি করে, এবং যেটা কফির স্বাদকে প্রভাবিত করতে পারে।

মাঝারি থেকে হালকা সাইজের কফি বীজগুলিতে তিক্ততার প্রধান উৎস হলো ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড ল্যাকটোন; কফিতে যে দুধরনের ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড ল্যাকটোন পাওয়া যায় সেগুলো হলো 3-ক্যাফিওয়াইলিকুইনিক-1,5-ল্যাকটন এবং 4-ক্যাফিওয়াইলিকুইনিক-1,5-ল্যাকটন।
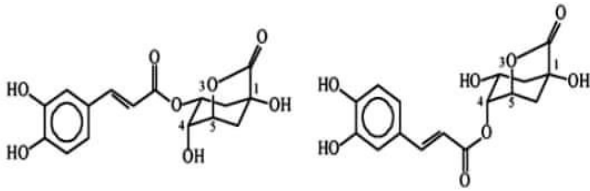
কালো কফিতে এই ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড ল্যাকটোনের ব্রেকডাউন যৌগ, স্বাদের তিক্ততায় ক্রমবর্ধমান প্রভাব ফেলে। এই যৌগটির নাম ফেনিলিনডেন এবং এর তিক্ততা ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড ল্যাকটোনের চেয়েও বেশি। উদাহরণস্বরূপ, এস্প্রেসো কফির (espresso coffee) তিক্ততা।
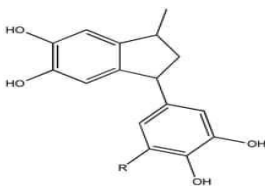
তিক্ত স্বাদের কারণের মধ্যে সর্বশেষ শ্রেণীর যৌগটি হলো মেলানোইডিন, কফির বীজ সেদ্ধ করার ফলে উপজাত হিসাবে বের হয়। এগুলি মাইলার্ড বিক্রিয়া (প্রোটিন এবং শর্করার মধ্যে একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া যা বিভিন্ন ধরনের রান্না করা খাবারের স্বাদের জন্য দায়ী) চলাকালীন সময়ে গঠিত হয়। মেলানোইডিনগুলি তাদের জটিলতার কারণে খুব কমই চিহ্নিত হয়, এবং তাদের রাসায়নিক কাঠামো অনেকাংশেই অজানা। তবে অনুমান করা হয় যে, সেদ্ধ কফির বীজে এই যৌগগুলির ৩০% পর্যন্ত থাকতে পারে। এই শ্রেণীর যৌগগুলি সম্পর্কে খুব কমই জানা যায় তবে ধারণা করা হয় যে তারাও কফির স্বাদে প্রভাব ফেলতে পারে।

চায়ের রসায়নঃ

সময় এসেছে চায়ের রসায়ন নিয়ে আলোচনা করার। ঠিক তাই, যাতে সমস্ত চা পানকারীরা বাদ না পড়ে। অনেকটা কফির মতোই, চায়েও বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক যৌগ রয়েছে, তবে এর স্বাদ এবং বর্ণের দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যৌগশ্রেণী হলো পলিফেনল। আলোচনা হবে চায়ে থাকা পলিফেনল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যৌগগুলো নিয়ে।

ব্ল্যাক টি বা সাধারণ চা, চা পাতাকে জারণ করে উৎপাদিত, যা পরে শুকানো হয়।
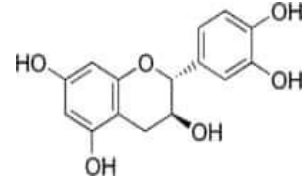
ক্যাটাকাইন (catechin) নামে পরিচিত ফ্ল্যাভোনয়েড (flavonoid) শ্রেণীর যৌগটি অ-জারিত সবুজ পাতায় ২৭% পর্যন্ত থাকে। পরে জারণ প্রক্রিয়াটির কারণে, ব্ল্যাক টি'তে এটি প্রায় ৪% -এ নেমে আসে।

চায়ে থাকা পলিফেনলগুলি বিভিন্ন ধরনের ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা যেতে পারে।
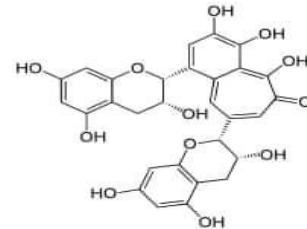
এগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণগুলোর মধ্যে একটি হলো থিয়াফ্লেবিন (theaflavin), যদিও এক্ষেত্রে থিয়ারুবিগিন (thearubigen) পলিমারিক পলিফেনল একটি বৃহৎ গোষ্ঠী যার নির্দিষ্ট কাঠামো সম্পর্কে এখনও অনেকাংশে অজানা। তবে উভয় যৌগই চা এর কমলা-লাল রঙের পাশাপাশি স্বাদেও অবদান রাখে। বিভিন্ন গবেষণায় জানা গেছে যে ,চায়ে থাকা পলিফেনল, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যৌগটি স্বাস্থ্যবিধিতে উপকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তবে এর জন্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখনও কিছুটা অস্পষ্ট। একটা গবেষণায় দেখা গেছে যে ফ্রি র‍্যাডিকেলের (অস্থির অণু যা দেহের কোষগুলিকে ক্ষতি করতে পারে) ফলে কোষের ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট (অযুগ্ম ইলেকট্রনের অণু)। তবে দীর্ঘমেয়াদি পরীক্ষায় কার্যকারিতা সম্পর্কে এখনও অনিশ্চিত,

বিশেষ করে ক্যান্সার চিকিৎসায়। এদিকে, অন্যান্য গবেষণাগুলি চা খাওয়া এবং কার্ডিওভাসকুলার রোগের মধ্যে একটি বিপরীত সম্পর্ক নির্দেশ করেছে।

আর এই বিতর্কিত স্বাস্থ্য সুবিধা নির্বিশেষে, চায়ে দুধ যুক্ত করার ফলে এর মধ্যে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলির উপর কী প্রভাব পড়ে তা নিয়েও বিরোধী মতামত রয়েছে। গবেষণায় ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে দুধে থাকা কেসিন (casein) প্রোটিন চায়ে পলিফেনলের সাথে বাধতে পারে এবং জটিল যৌগ তৈরি করতে পারে। অন্য কিছু গবেষণা বলেছে যে চা পান করে প্রাপ্ত অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পরিমাণের উপর এটা প্রভাব ফেলতে পারে, আবার অন্য গবেষকরা বলেছেন চা খাওয়ার পরে সেটা রক্তে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলির ঘনত্বকে আসলে প্রভাবিত করে না, হজমের সময় প্রোটিন-পলিফেনল কমপ্লেক্সগুলি ভেঙে যায়।

চা এবং তার মধ্যে পাওয়া বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগ নিয়ে বিস্তর সাহিত্য আছে বৈকি। ফিচার ফটোতেও কিছু দেওয়া আছে। আর গবেষণাপত্রের লিংক নিচে সংযুক্ত।

একটা মজার ব্যাপার হলো, চায়ে এল-থায়ানাইন (L-Theanine) নামের একটা ইউনিক অ্যামিনো অ্যাসিড থাকার কারণে কফি এবং চায়ের উত্তেজক প্রভাবও কিছুটা আলাদা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, এই যৌগটি মানুষের মস্তিষ্কের কার্যকারিতার দিকগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে এবং সেটা মনকে খারাপ না করে শিথিল করে। আবার আরও একটা গবেষণায় ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে এল-থায়ানাইন এবং ক্যাফেইনের সংমিশ্রণ কাজের গতি, কাজ সম্পাদনায় নির্ভুলতা এবং মাথা খাটানো কাজকে নির্ভুল ভাবে করতে সাহায্য করে। সহজ কথায় বলতে গেলে, এল-থায়ানাইন (চা) এবং ক্যাফেইন (কফ) মিশ্রণ মস্তিষ্কের উদ্দীপক প্রভাবগুলিকে 'মাখনের মতো মসৃণ' করে।

The Lost World: Jurassic Park (1997)

রিভিউয়ার: শুভ সালাউদ্দিন

বছর চারেক পার হওয়ার পরে এই সিরিজের দ্বিতীয় মুভিটা বের হয়েছে। কয়েক বছরে প্রযুক্তিগত অনেক উন্নয়ন হয়েছে । তাই এটাতে আরও ভালো ভিজ্যুয়ালাইজেশন আছে।

মিলিয়নিয়ার ভদ্রলোক কয়েকজনকে তার দ্বিতীয় ডাইনোসর পার্কে যাবার জন্য ইনভাইট করেন এবং বেঁচে থাকা ডাইনোসরদের নিয়ে ডকুমেন্টারি তৈরির কথা বলে। এখানে দেখা যায় মিলিয়নিয়ার ভদ্রলোক তার মানসিকতা পরিবর্তন করেছেন, তিনি মনে করেছেন ডাইনোসরদের প্রকৃতিতেই শান্তিতে বসবাস করতে দেওয়া দরকার।

এরপর কাহিনী এগোতে থাকলে কিছু লোক T-Rex কে ধরে অন্য জায়গায় পাচার করার চেষ্টা করে এবং জাহাজে উঠায়। কিন্তু ওটা পালিয়ে গেলেই সকল ঝামেলার শুরু হয়।

কিছুটা আন্ডাররেটেড মুভি। দেখতে খারাপ লাগার কথা না তবে স্টোরিলাইনটা আরও ভালো হতে পারত।

ডাইনোসরের ফেরিওয়ালা

নাইম শাহানুর

“এএ ডাইনোসর লন। কালা, সবুজ ডাইনোসর লন। (কী কী কালার বলছিল মনে নাই, আনুমানিক) বাইচ্চা লন। একদাম ৯০ টেহা। এএ ডাইনোসর।”

রাস্তায় এই আওয়াজ শুনে দাঁড়ালাম। বাবার কাছে আবদার করে কিনে আনলাম এক সবুজ ডাইনোসর। এই ছিল আমার প্রথম ডাইনোসর দেখা। পিঠের দিকটা উঁচু। মোটামুটি ভয়ংকর দেখতে। কিন্তু তখন কি জানতাম এ কী চিজ? পরে ডিসকভারির সুবাদে জানলাম ইনি হচ্ছেন সর্ববৃহৎ মাংসাশী প্রাণী।
যা হোক অনেক উল্টাপাল্টা কথা বললাম এবার কাজের কথায় আসি।
স্পাইনোসরাস ছিল ক্রিটেসিয়াস পিরিয়ডের প্রাণী। যারা ৯৯.২ থেকে ৯.৭ কোটি বছর আগে উত্তর আফ্রিকা দাপিয়ে বেড়াত। এর আকার বললে এটা প্রায় ৪৯ -৫৯ ফুট লম্বা। ভর প্রায় ৭-২৩ টন হতো। এরা জল-স্থল উভয় স্থানে চলত।তবে সাম্প্রতিক ফসিলসমূহে চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে এরাই প্রথম ডাইনো যারা মাটিতে সাঁতার কাটতে পারত।ধুর! কি বলতেছি। “পানিতে” হবে। সাম্প্রতিক এক গবেষণাপত্র অনুযায়ী, এদের পিছনের পা ছিল ছোট। হাঁসের মতো চ্যাপ্টা পা, সরু মুখ আর ভেতরে কোণাকার দাঁত বসানো যা দিয়ে মাছ শিকার করা যেত সহজেই।

এদের মূলত দুইটি প্রজাতি পাওয়া গেছে। একটি মিশরীয়, যার বৈজ্ঞানিক নাম Spinosaurus aegyptiacus। আর অপরটি মরক্কোতে পাওয়া যায়, যার বৈজ্ঞানিক নাম Spinosaurus maroccanus।
স্পাইনোসরাস নামটি এসেছে মূলত এর পিঠে থাকা কশেরুকাদের জন্য। যেগুলো আকারে একেকটা প্রায় ৭ ফুট (আমার দেখা সবচেয়ে লম্বা মানুষ থেকেও লম্বা)। একে 'সেইল' বলা হয়। এখানে একটা বিষয় সামনে আসে একটা প্রাণীর এত বড় একটা বর্ধিত অংশ কেন থাকবে? বিজ্ঞানমহলে এ নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। অনেকে অনেক হাইপোথিসিস এনেছেন। কেউ কেউ প্রস্তাব করেন

এটা দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখতে ব্যবহার হতো, আবার কেউ কেউ একে চর্বি ভান্ডার বলে ঘোষণা করেন।কিন্তু বিজ্ঞানী ইব্রাহিমি ও তাঁর দল এসব মিথ্যা প্রমাণ করেন। তারা বের করেন যে-এদের সেইল ঘন ভাবে যুক্ত হাড় এবং বিভিন্ন রক্তবাহী নালি দিয়ে গঠিত ছিল। বিজ্ঞানী ইব্রাহিমের মতে এটি ব্যবহৃত হতো তার কর্তৃত্ব জানান দেবার জন্য। রাজা যেমন তার রাজ্য বুঝাতে চারদিকে চিহ্ন দিত, এর চিহ্ন ছিল এই সেইল। এটি দ্বারা সে জানান দিত যে, আমি আছি, কাছে এলে জীবিত ফিরে যেতে দেবো না।এটি দ্বারা সঙ্গী আকর্ষণের কাজ হতো বলেও বিজ্ঞানীরা মত দেন। অনেকে ভয় দেখানোর জন্য এর উপস্থিতি বলে মত প্রকাশ করলেও এরা নিজেই নিজের এলাকার রাজা বিধায় শত্রুর সম্ভাবনা কম। যদিও কারকারাদন্তসরাস এর প্রধান শত্রু ছিল। কিন্তু স্পাইনোসরাস পানি ছেড়ে দূরে যেত না বিধায় এদের দেখা সাক্ষাৎ কমই হতো। স্পাইনোসরাসের (অনেকে স্পিনো বলে, আমার স্পাইনো বলতেই মজা লাগে) ঘাড় লম্বা আর ভারী ছিল। এ জন্য এর ভারকেন্দ্র সামনের দিকে ছিল, যা পানিতে চলার জন্য কাজের হলেও এর ফলে মাটিতে চলতে হলে তাকে চারপায়ে চলতে হতো। সিলেকেন্টস, হাঙর, স ফিশ (saw fish) এসব ছিল এর খাদ্যতালিকায়। এরা অনেক সময় মৃত প্রাণীও খেতো।

স্পাইনোসরাসরা যেহেতু মরক্কো ও মিশরে থাকত তাই বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন সাহারা মরুভূমিতে প্রচুর স্পাইনো জীবাশ্ম পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশের কারণে ঐখানে খোঁজ করা অত্যন্ত কঠিন। স্পাইনোসরাসের ফসিল প্রথম ১৯১২ সালে মিশরে পাওয়া যায়। একজন জার্মান বিজ্ঞানী আর্নেস্ট স্ট্রোমারের তত্ত্বাবধানে এটা থাকে পরবর্তী সময়ে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিউনিখে বোমা বর্ষণের কারণে তা ধ্বংস হয়ে যায়।

তবে স্ট্রোমারের নোট থেকে বেশকিছু তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়। এই ডাইনোসর সবচেয়ে বড় মাংসাশী হলেও বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে টি-রেক্সের সাথে এ পেরে উঠত না। যদিও তারা একই সময়ে একই জায়গায় উপস্থিত ছিল না (এই তথ্যটা আমার জন্য মারাত্মক পীড়াদায়ক ছিল)।

এই হলো সর্ববৃহৎ মাংসাশী ডাইনোসরের কাহিনী।

মজার তথ্য

মজার ব্যাপার হচ্ছে, গত ত্রিশ কোটি বছরের যেকোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের লেভেল অনেক কম (যদি কোটি বছরের গড় নিয়ে স্মুথ করি)। গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য বহু ফ্যাক্টর দায়ী, কার্বন-ডাই-অক্সাইড একা না।

[তথ্যসূত্র](#)

ডারউইন এবং অতঃপর

হাসান-উজ-জামান

২০০৬ সাল। মাস্টার্স শেষের পর রেজাল্টের অপেক্ষায় আছি। মাথায় প্ল্যান ঘুরছে পিএইচডি করার।

কিন্তু পিএইচডি করব কী বিষয়ে- তার কোনো উত্তর পাই না।

পিএইচডি'র ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত দর্শন ছিল- চাকরি-বাকরি বাদ দিয়ে পরিবার থেকে হাজার মাইল দূরে থেকে যদি ছয়-সাত-আট বছর গায়ে-গতরে খাটতে হয়, তাহলে সেটা এমন বিষয়ে হতে হবে যাতে পুরো অভিজ্ঞতাটা সার্থক হয়। তো পছন্দের বিষয় নির্ধারণের জন্য বই পড়ি, গবেষণাপত্র পড়ি। অ্যাকাডেমিকদের চিঠি দেই তাদের কাজের বিষয়ে। নতুন নতুন ধারণা মাথায় আসে। কিছুই অতটা নাড়া দেয় না।

এই অবস্থায় একদিন নিচের বইটা হাতে এল।
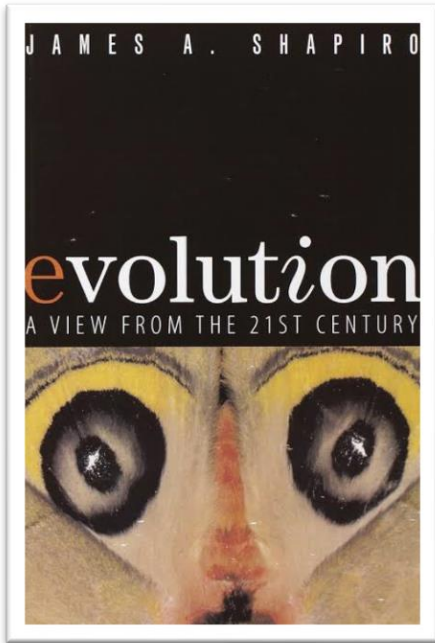
আজকে পর্যন্ত আমার বিজ্ঞানচিন্তায় সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন এনেছে এই একটা বই। লেখক শিকাগো ইউনিভার্সিটির অণুজীব বিজ্ঞানী জেমস শাপিরো- ব্যাকটেরিয়াদের ট্রান্সপোজেবল এলেমেন্ট (কথ্য ভাষায় আমরা যেটাকে বলি jumping genes) আবিষ্কার করে খ্যাতি কুড়িয়েছেন।

বইটার অধ্যায় সংখ্যা মাত্র চার। পেছনের তথ্যসূত্রগুলো বাদ দিলে মূল বইয়ের পৃষ্ঠাও এমন কিছু নয়। কিন্তু বইয়ের একটা লাইনও অযথা নয়। প্রত্যেকটা বাক্যে জটিল তথ্য উপাত্ত ঠেসে ঢোকানো, এতটুকু ধ্যাবড়া কথা নেই, ক্ষুরধার।

একদিক থেকে বইটার গঠনের সাথে গুরুজির অরিজিন অফ স্পিসিজের মিল আছে- লেখক একটা থিওরি দাঁড় করাতে চাচ্ছেন, সেই থিওরির পেছনে যত প্রমাণ তথ্য উপাত্ত সমস্তই একের পর এক বিন্যস্ত করে চলেছেন। ডারউইন পাঠক মাত্রই তার one long argument এর কথা জানেন। এই বইটা হলো শাপিরোর one long argument।

বইয়ের সব কথার সাথে যে আমি একমত তা না। এমনকি এর মূল থিওরির সাথেও আমি কতটা একমত তার সন্দেহ আছে। কিন্তু মোটামুটি এর বিষয়কে কেন্দ্র করেই পিএইচডি'র জন্য ইউনিভার্সিটি, প্রফেসর, গবেষণাগার নির্দিষ্ট করলাম।

কারণটা এবার বলি।

আমি আমার জীবনের একটা বড় সময় কাটিয়েছি বিবর্তন ব্যাপারটাকে অপছন্দ করে। এর কারণ আমি মনে করতাম বিবর্তন জীববিজ্ঞানের সবচেয়ে একঘেয়ে শাখা, ইংরেজিতে 'বোরিং'। ডারউইন তাঁর প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্ব তো দিয়েই গেছেন। তিনি নাহয় মিউটেশন জানতেন না, এখন আমরা জানি। কাজেই বিবর্তন বিষয়ে জীববিজ্ঞানে আর সেরকম কোনো রহস্য নেই। বিজ্ঞানীদের কাজ হলো এখন শুধু মাইলকে মাইল লম্বা অঙ্ক কষে বিবর্তনের গতিপথ দিনতারিখ বের করা।

অঙ্ক করার ইচ্ছে থাকলে গণিত ডিপার্টমেন্টেই ঢুকার ধান্দা করতাম- উপরওয়ালা অত বুদ্ধি দেননি।

অন্যভাবে বলতে গেলে, বিবর্তনকে আপনি যে প্রশ্নই করুন না কেন, তার উত্তর হবে প্রাকৃতিক নির্বাচন আর বংশবৃদ্ধি দিয়েই। মানুষের চোখ দুটো কেন? কারণ দুটো চোখ থাকার ফলে আমাদের বেশি বংশবৃদ্ধি করার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়। আমাদের ক্রোমোজোম সংখ্যা তেইশ দুগুণে ছেচল্লিশ কেন? কারণ ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোমওয়ালা মানুষই সবচেয়ে বেশি বংশবৃদ্ধি করতে পারে। প্লাটিপাস ডিম পারে কেন? ঐ বংশবৃদ্ধি আর ছানাপোনা ইত্যাদি। কী পানসে একটা শাস্ত্র রে বাবা!

কিন্তু শাপিরোর এই বই এবং পরবর্তীতে
আরো কিছু বই গবেষণাপত্র পড়ে আর পিএইচডি'র ক্লাসরুমে বসে বিবর্তন সম্পর্কে আমার এই ধারণাটা বদলে গেল।

সেই ষাটের দশক থেকেই বিজ্ঞানীরা বলে আসছেন, প্রাকৃতিক নির্বাচন বিবর্তনের একমাত্র “ইঞ্জিন” নয়। সত্যি কথা বলতে, এটা জীববিজ্ঞানের সবজায়গায় প্রযোজ্যই নয়। প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘটতে হলে তাকে বেশ কিছু সমীকরণ মানতে হয়, যেটা নিয়ে পপুলেশান জেনেটিক্স বলে একটা আলাদা শাস্ত্রই আছে। খুব সহজ করে বলতে গেলে, প্রাকৃতিক নির্বাচন তখনই বিবর্তনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে যখন জনসংখ্যা হয় অনেক বেশি। জীবাণুরা গণ্ডায় গণ্ডায় ছানাপোনা বানায় বলে তাদের বিবর্তনে প্রাকৃতিক নির্বাচনের গুরুত্বও অনেক। অন্যদিকে, এখন আমরা সাত বিলিয়ন তো কী হয়েছে, ঐতিহাসিকভাবে আমাদের জনসংখ্যা বেশ কম ছিল- গড়ে মোটামুটি সাতহাজারের কাছাকাছি ওঠানামা করেছে। এজন্য মানুষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তৈরিতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভূমিকা বেশ সীমিত।

এটা বিশাল আলোচনা- আমি পপুলেশান জেনেটিক্সের কণ্টকাকীর্ণ পথে আপনাদের এখনই ঢুকতে বলব না। আমার পয়েন্টটা অন্য জায়গায়।

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনই বিবর্তনের সব নয়, সব জায়গায় এটা প্রযোজ্য নয়, এবং জীববিজ্ঞানের সবটা এটা দিয়ে ব্যাখ্যাও করা যায় না। এছাড়াও বিবর্তনের আরো কিছু উপায় আছে। কিছু ক্ষেত্রে উপায়গুলো খুবই চমৎকার। সেগুলো নিয়ে বিজ্ঞানীরা বিগত ষাট বছর ধরে কথা বলে আসছেন- কিন্তু আমার মতো সাধারণ মানুষের কানে সেই গবেষণাগুলো সব সময় পৌঁছায় না, এই আর কী!

বইটাতে এবার ফিরে আসি। শাপিরো এখানে বিবর্তনের প্রক্রিয়ার যে তত্ত্বটা দিয়েছেন- সেখানে প্রাকৃতিক নির্বাচন আছে বটে, কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারও আছে। অর্থাৎ, যেমনটা বললাম, জীববিজ্ঞানের এই জায়গাটাতে এখনও অনেক অমীমাংসীত রহস্য আছে, বিজ্ঞানীদের ডিটেকটিভগিরির সুযোগ আছে। নতুনরকম তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জায়গা আছে।

বিজ্ঞানের মজাটাই তো এখানে।

বইটা পড়ার পর থেকে হাতের কাছে আর যা প্রাসঙ্গিক ম্যাটেরিয়াল পেলাম, সবকিছুই একই দিকে ইঙ্গিত করল। স্কুল-কলেজে পড়ে আসা বিবর্তনের ছবিটা একদমই সাদাকালো। বিবর্তন আসলে অনেক বর্ণিল। বিবর্তন মানে শুধু ডারউইন আর মেন্ডেলের বিবর্তন নয়। বিবর্তনে ডারউইন আছেন এবং থাকবেন, কিন্তু আরও আছেন কিমুরা, আছেন ওহতা, আছেন সুসুমু ওহনো, মাইকেল লিঞ্চ। আছেন জেমস শাপিরো।

ভদ্রলোক তার থিওরিকে বলেন ন্যাচারাল জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। আমি বলি ম্যাকগাইভারতত্ত্ব।

ফলস অ্যালার্ম

আদীন নূর

১.

কার্বনিফেরাসের বনে আগুন লেগেছে। আকাশছোঁয়া ১০০ ফুট লম্বা লেপিডোডেনড্রন গাছগুলো সব পুড়ে যাচ্ছে। কালো ধোঁয়া আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। আগুন ছড়াচ্ছে অস্বাভাবিক দ্রুত।

ওয়েট, এত দ্রুত তো ছড়ানোর কথা নয়। তাহলে ছড়াচ্ছে কেন?

কারণ বাতাসে অক্সিজেন এখন ৩৩ পার্সেন্ট।

কয়েক ফুট লম্বা ড্রাগনফ্লাই মেগানিউরা, আট ফুট দানব সেন্টিপেড আর্থোপ্লুরাগুলো জীবন্ত রোস্ট হয়ে যাচ্ছে। কীটপতঙ্গের আকৃতি এত বিশাল কেন?

উত্তর আবার ওটাই। বাতাসে অক্সিজেন ৩৩ পার্সেন্ট।

হ্যাঁ, কথা বলছি পোকামাকড়দের রাজত্বকাল কার্বনিফেরাসকে নিয়ে। কার্বনিফেরাস পিরিয়ড হলো আজ থেকে ৩৫৮-২৯৮ MYA (Million Years Ago) এর সময়। পৃথিবী তখন রেইনফরেস্টে ঢাকা। চারদিকে ভাপসা গরম। প্রমাণ সাইজের ফড়িং, মাকড়সা চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। আপাতত রেইনফরেস্টে আগুন জ্বলতে থাকুক। আমরা পিছিয়ে যাব আরও কয়েক কোটি বছর।

২.

প্যালাজোয়িক ইরা'কে ৬টি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম ভাগটি হচ্ছে ক্যামব্রিয়ান (৫৪১-৪৮৫ MYA)

অতিমহাদেশ প্যানোশিয়ায় ভাঙন ধরেছে। নতুন তিনটি ভূখন্ড লরেন্সিয়া, ব্যাল্টিকা, সাইবেরিয়া এবং নতুন মহাদেশ গন্ডোয়ানা। সমুদ্রের তলদেশে যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছায়, সেখানে কয়েক প্রজাতির গাছ দেখা যাচ্ছে, তবে ডাঙায় গাছের কোনো অস্তিত্ব নেই। পানির নিচে হেঁটে বেড়ায় প্রাচীনকালের সামুরাইরা। তাদের নাম ট্রাইলোবাইট। সন্ধীপদীদের মধ্যে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ব্যাপারে পূর্বে ধারণা করা হতো কারণ তাদের প্রচুর ফসিল পাওয়া গিয়েছিল। তবে এ ব্যাপারটি ভুল প্রমাণিত হয়। ট্রাইলোবাইটদের দেহ ক্যালসিয়াম কার্বনেট নির্মিত বর্ম দিয়ে আবৃত ছিল, এ কারণে

তাদের দেহ খুব সহজেই ফসিলে পরিণত হত। সমুদ্রের তলদেশে মাইক্রোবরা একত্র হয়ে পুরু মাদুর সৃষ্টি করেছে। ক্যামব্রিয়ানের শুরুতে একদল প্রাণীর বিবর্তন হলো যারা সমুদ্রের তলদেশ খনন করতে পারত। খননের কারণে মাইক্রোবিয়াল স্তরে ভাঙন হলো, যেসব মাইক্রোব অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বাঁচতে পারত না, তারা বিলুপ্ত হলো। অক্সিজেন সমৃদ্ধ পানি সমুদ্রতল স্পর্শ করল, সৃষ্টি হলো এক নতুন অধ্যায়। অনেক প্রজাতি যারা সেই মাইক্রোবিয়াল স্তরের উপর নির্ভরশীল ছিল, তারা ধ্বংস হয়ে গেল। বাস্তুতন্ত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসল। অনেক নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হলো। এই ঘটনাকে ক্যামব্রিয়ান বিস্ফোরণও বলা হয়।

ক্যামব্রিয়ান পিরিয়ডের ইতির ব্যাপারে ব্যাপক বিতর্ক রয়েছে। মূলত দুটি এক্সটিঙ্কশন ইভেন্টের পরে ক্যামব্রিয়ান পিরিয়ড শেষ হয়।

প্রথমটি হচ্ছে - End-botomian extinction event. এটি ঘটেছিল মিড ক্যামব্রিয়ানে(৫৭৩-৫০৯ MYA)। হাইপোথিসিস অনুযায়ী অক্সিজেনের পরিমাণ কমে আসার কারণে কার্বন সাইকেলে ব্যাপক পরিবর্তন আসা শুরু হয়েছিল। এই সময়ে একটি আগ্নেয়গিরির উদগীরণের কারণে হঠাৎ করে বায়ুমন্ডলে গ্রীনহাউস গ্যাস বেড়ে গিয়েছিল। এতে অস্বাভাবিকভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটেছিল এবং অনেক প্রজাতি মারা গিয়েছিল। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পৃথিবীর সময় লেগেছিল ৪০ লক্ষ বছর।

দ্বিতীয়টি হলো - ড্রিব্যাশিয়ান এক্সটিঙ্কশন(৫০২ MYA)। এ সময়ে হঠাৎই বায়ুমন্ডলে বিষাক্ত হাইড্রোজেন সালফাইডের আধিক্য দেখা গিয়েছিল। এটিও বিভিন্ন জলজ প্রাণীর জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

৩.

আশেপাশে ভাপসা গরম, আশেপাশে স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ, দূরে কয়েকটা ছোট ছোট লিভারওয়ার্ট দেখা যাচ্ছে। তাপমাত্রা দেখাচ্ছে ৪৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। চারদিকে অথৈ পানি। দাঁড়াও, এত পানি কেন? আর এত গরমই-বা কেন?

কারণ এটা হচ্ছে অর্ডোভিশিয়ান পিরিয়ড (৪৮৫-৪৪৩ MYA)। ক্যামব্রিয়ানের পরিণতির কথা মনে আছে? একগাদা গ্রীনহাউস গ্যাসে পৃথিবী ভর্তি হয়ে গেল?

গ্রিনহাউসের সাথে তাপমাত্রাও বাড়ল। তাপমাত্রার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলল পানির স্তর। গন্ডোয়ানা মহাদেশের অনেকখানি ডুবিয়ে দিয়ে গেল।

একটা ছোট্ট স্যাকাব্যাম্বাসপিস অল্প পানিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অর্ড্রোভিশিয়ানে বিবর্তিত অনেকগুলো প্রজাতির একটি সে। মাছটা খেয়ালই করেনি যে অনেকক্ষণ থেকে দুই জোড়া শিকারীর চোখ তার দিকে নজর রাখছে। চোখ দুটো একটি অর্থোসেরাসের , স্কুইডের মত দেখতে মলাস্কা পর্বের এই প্রাণীটি অর্ড্রোভিশিয়ানের মাছদের জন্য ত্রাস ছিল। একটা স্যাকাব্যাম্বাসপিস দিয়ে পেট ভরে না, লাঞ্চে আরও কিছু দরকার, নতুন খাবারের খোঁজে চলল অর্থোসেরাসটা। ডাঙার কাছে প্ল্যাঙ্কটন খাওয়ার জন্য মাছেরা জড়ো হচ্ছে। ওখানে ঠিক সময়ে পৌঁছাতে পারলে আজ ভুরিভোজ হবে।

অর্ড্রোভিশিয়ান যুগের শেষটা হয়েছিল অদ্ভুতভাবে। পৃথিবীর ইতিহাসের দ্বিতীয় বৃহত্তম এক্সটিঙ্কশন ইভেন্ট হচ্ছে অর্ড্রোভিশিয়ান-সিলুরিয়ান এক্সটিঙ্কশন ইভেন্ট। প্রথমটি পার্মিয়ান-ট্রায়াসিক এক্সটিঙ্কশন ইভেন্ট। সে গল্প যথাসময়ে করা হবে।

আগেই বলেছি অর্ড্রোভিশিয়ানে ভাপসা গরম, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেই গা ভিজে ওঠে, আবহাওয়া স্যাঁতসেঁতে। এরকম পরিস্থিতি চলছে চার কোটি বছর ধরে, সকল প্রাণী এসবের সাথে অভ্যস্থ। তবে হুট করে যদি প্রচন্ড ঠান্ডা পড়ে যায়, তখন কী হবে?

বেশ কয়েকদিন ধারাবাহিক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হলো, এতে ম্যাগমার সাথে প্রচুর সিলিকেট পাথর ভূপৃষ্ঠে সঞ্চিত হলো। সিলিকেট পাথরের ধর্ম হচ্ছে এরা কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করতে পারে। শুরু হয়ে গেল কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ। পাথরগুলোর পেট ভরাতে ভরাতে বায়ুমন্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড ৭০০০ পিপিএম থেকে নেমে এল ৪৫০০ পিপিএমে। এতে যেটা হওয়ার কথা ছিল, সেটাই হলো। হুট করে পৃথিবীতে নেমে আসলো বরফযুগ। জলজ প্রাণীদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলো। ব্রায়োজোয়ারা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেল। এর আঘাতে ৪৯% (এই মান নিয়ে কন্ট্রোভার্সি আছে। উইকির তথ্য অনুযায়ী এটাই। তবে ভুল থাকলে সংশোধন করা হবে) জীব ধ্বংস হয়ে গেল। অর্ডোভিশিয়ানের জীবনকাল ছিল অদ্ভুত। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে তার জন্ম, তাপমাত্রা হ্রাসে মৃত্যু। বরফের যুগ কাটিয়ে উঠতে পৃথিবীর সময় লেগেছিল ৫-৭৫ লক্ষ বছর। এত লম্বা সময় সুপ্তাবস্থায় থাকার পরে পৃথিবী নতুন এক যুগে প্রবেশ করে, যার নাম সিলুরিয়ান।

৪.

বরফযুগ চলে গেছে। জলবায়ু এখন নাতিশীতোষ্ণ। ভাপসা গরমের ব্যাপারটা আর নেই। সমুদ্রের মধ্যে ছোটবড় সাইজের প্রচুর দ্বীপ দেখা

যাচ্ছে। খুশির বিষয় হচ্ছে বরফযুগ পৃথিবীর একটা অদ্ভুত উপকার করে দিয়ে গেছে। প্রতিটা দ্বীপে স্বতন্ত্র বাস্তুতন্ত্র দেখা যাচ্ছে। মস ও ফার্ন থেকে নতুন কিছু উন্নতজাতের উদ্ভিদ বিবর্তিত হয়েছে। আজকের গাছেরা এদেরই বংশধর।

পানিতে কয়েকটা জোঁক দেখা যাচ্ছে। তারা একটা মাছের শরীর আকড়ে ধরে ভেসে আছে। মাছটার চেহারা কিছুটা আধুনিক মাছদের মত, গায়ে আঁইশ দেখা যাচ্ছে, মুখের ধরণটাও চেনা চেনা। সিলুরিয়ানেই সর্বপ্রথম অস্থিকথিস শ্রেণির মাছেদের বিকাশ ঘটে। সিলুরিয়ানের জলবায়ু মাছেদের বিকাশের জন্য আদর্শ ছিল। মাছেরা তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায়, প্রথম ভাগ হচ্ছে চোয়াল বিহীন মাছ। দ্বিতীয় ভাগে থাকে শার্ক এবং স্টিংরে-রা আর শেষ ভাগ হচ্ছে অস্থিময় মাছ। অস্থিময় মাছেদেরই একটা অংশ থেকে সৃষ্টি হবে টেট্রাপডরা। সেখান থেকে বিবর্তিত হবে ডিপ্লোডোকাস, আর্জেন্টিনোসরাস কিংবা অ্যালবার্টনেক্টেস এর মত ডাইনোসররা।

৫.

সমুদ্র এখানে অতটা গভীর নয়। একটা ড্রিপ্যানাসপিস অনেকক্ষণ ধরে প্রবালের সাথে ক্যামোফ্লেজ করে আছে। প্রায় ৩৫ সেমি লম্বা এই মাছটির চেহারা অনেকটা স্টিংরের মত। মাছটা পালিয়ে আছে কারণ তার জাতভাই তাকে দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারার মতলব করছে। এই জাতভাই হলো cladoselache(বাংলা উচ্চারণটা বেশ বিদঘুটে)। আদিম শার্করা তখন একটু একটু করে নিজেদের আকৃতি বড় করছে, পাড়ি দিতে হবে লম্বা পথ। ড্রিপ্যানাসপিসটার উদ্দেশ্য সফল হলো। শার্কটার নজর পড়েছে একটা বাচ্চা টিকট্যালিকের দিকে। টিকট্যালিকটা বাঁচার জন্য ডাঙার দিকে জোরে জোরে সাঁতার কাটা শুরু করল। কিছু দূর গিয়েই অবাক হয়ে গেল, শার্কটা তার পিছে পিছে আসছে না, বরং একটু আগে যেখানে ছিল, সেখানের পানি লাল হয়ে গেছে টগবগ করে ফুটছে। কারণ সাত ফুট লম্বা শার্কটার উপর হামলে পড়েছে একটা তেত্রিশ ফুট দানব ডাঙ্কলিওস্টিয়াস। এটাই হচ্ছে মাছেদের যুগ ডেভোনিয়ান(৪১৯-৩৫৮ MYA)। জীবন এখানে অনিশ্চিৎ। শিকারী নিজেই শিকার বনে যায়। তবে শার্কদের দুরবস্থা বেশিদিন থাকবে না। তারা এসব শিকারীর হাত থেকে বেঁচে যাবে। সামনে আসছে তাদের রাজত্বকাল।

বাচ্চা টিকট্যালিকটা আবার ডাঙার দিকে আসতে লাগল। আজ ভাগ্য জোরে বেঁচে গেছে, প্রত্যেকবার এমন হবে না। একবার ডাঙায় চলা শিখতে পারলেই কেল্লা ফতে। বড় মাছগুলো সেখানে আর আসতে পারবে না। মাছটা তার পেকটোরাল আর অ্যানাল ফিন ব্যবহার করে ডাঙায় উঠে পড়ার চেষ্টা করতে লাগল। এরকম কিছু মাছেরাই আজকের টেট্রাপডদের পূর্বপুরুষ।

ডেভোনিয়ান পিরিয়ডের গড় তাপমাত্রা ছিল ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ডেভোনিয়ানের শুরুর দিকে বেশিরভাগ গাছেরই প্রধান মূল ছিল না, তবে মাঝ পর্যায়ে এসে প্রধান মূল গজাতে শুরু করেছিল। প্রচুর বনভূমি গড়ে ওঠার কারণে লেট ডেভোনিয়ানে এসে সমুদ্রে বেনথিক শৈবালের পরিমাণ অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেল। শৈবালের কারণ শেষ হতে লাগল দ্রবীভূত অক্সিজেন। প্রকৃতি অস্বাভাবিকতা সহ্য করতে পারে না। অক্সিজেনের অভাবে প্রচুর মাছ মারা গেল। সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল ১৯ পার্সেন্ট গোত্র। ক্ষতিগ্রস্ত হলো ৫০ পার্সেন্ট এর অধিক। প্রচন্ড জীবনীশক্তি সম্পন্ন কিছু মাছ বেঁচে রইল। তাদেরই পরবর্তীতে সমুদ্রে রাজত্ব করতে হবে, শত্রুরা সব ধ্বংস হয়েছে।

পাঁচটি এক্সটিঙ্কশন ইভেন্টের মধ্যে লেট ডেভোনিয়ান (৩৭৬-৩৬০ MYA) এক্সটিঙ্কশন তৃতীয়। এর গভীরতা এতটাই যে পৃথিবীর স্বাভাবিক হতে লেগেছিল ৫-২৫ মিলিয়ন বছর। এই সময়ে গাছগুলো আরও লম্বা হবে গাছের সাথে সাথে অক্সিজেনও বাড়বে। সিটবেল্ট বেঁধে নিন, সামনে আসছে পোকামকড়দের রাজত্বকাল।

৬.

আগুন থেমে গেছে, সাথে থেমে গেছে বাতাসে মাংস পোড়া গন্ধ। ৬০ ফুট লম্বা একটা ক্যালামাইটসের নিচে চাপা পড়ে প্রাণ হারিয়েছে একটা দৈত্যাকার আর্থোপ্লুরা, সাড়ে আট ফুটের কম হবেনা। আগুন থেকে বাঁচার জন্য মাটির নিচে ঢুকে ছিল একটা ডিকটাইওপটেরা। পোড়া গন্ধে সে বেরিয়ে এসে আর্থোপ্লুরাটাকে খেতে শুরু করে দিলো, তেলাপোকাদের কোনোকালেই মাংসে অরুচি ছিল না। অর্ধেক ধ্বসে যাওয়া গাছ থেকে অদ্ভুতভাবে ঝুলে আছে একটা মেগার‍্যাচনে। কার্বনিফেরাসের এই মাকড়সাদের লেগস্প্যান ছিল ২০ ইঞ্চি। আজ বাতাসে অক্সিজেন কম বলেই এদের আকার ছোট।

ডেভোনিয়ানের পুঁচকে শার্কদের কথা মনে আছে? এক্সটিঙ্কশন ইভেন্টের পরও কিন্তু তারা মারা যায়নি। তবে তাদের যেসব মাছ শিকার করত, তারা বেঁচে থাকতে পারেনি। তাই কার্বনিফেরাসে এসে শার্কদের বিস্ফোরণ ঘটে। তারা পরিণত হয় সমুদ্রের মূর্তিমান আতঙ্কে।

কার্বনিফেরাসের সময়ে গাছের সংখ্যা ছিল প্রচুর। তাই গড় তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রীর আশেপাশে ঘোরাফেরা করত। গাছেদের সংখ্যা বাড়ছিল

আতঙ্কজনকভাবে। পৃথিবী প্রস্তুত হচ্ছিল আরেকটা এক্সটিঙ্কশন ইভেন্টের সাক্ষী হওয়ার জন্য। গাছেদের সংখ্যা বাড়ার ফলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড অতিমাত্রায় কমে আসে, এসে পৃথিবীর তাপমাত্রা কমে যায়, আবারও শুরু হয় গ্লেসিয়েশন। বরফের কারণে মারা পড়ে গাছেরা। তারপর মারা যায় গাছেদের উপর নির্ভরশীল প্রাণীরা। এই ঘটনাকে বলা হয় কার্বনিফেরাস রেইনফরেস্ট কল্যাপ্স। বরফের মধ্যে জন্ম হবে নতুন যুগের, পার্মিয়ান।

৭

ম্যাসেঞ্জারে টুংটাং শব্দে নোটিফিকেশন আসছে। টেবিলক্লকে সময় দেখাচ্ছে সকাল সাড়ে ছয়টা। হঠাৎ বিকট শব্দে অ্যালার্ম বেজে উঠল, রাহী লাফিয়ে উঠে বসল।

এই ব্যাপারটি ২৯ কোটি আলোকবর্ষ দূরের কোনো গ্রহ থেকে প্রাণীরা যেভাবে দেখল,

ভোর হচ্ছে, কনিফারের পাতার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়ছে মাটিতে। ভয়ঙ্কর একটা চিৎকারে ধড়মড় করে জেগে উঠল আর্কোসরটা।চিৎকারটা একটা বিশাল ডিমেন্ট্রোডনের। এরা সবাই ডেভোনিয়ানের মাছেদের বংশধর। বরফযুগ যাবার পথে লেপিডোডেনড্রনদের জায়গা দখল করে নিচ্ছে সিড-ফার্ন আর কনিফাররা। চলে এসেছে পার্মিয়ান(298-252 MYA)।

পার্মিয়ানেই সর্বপ্রথম রেপটাইলরা বিবর্তিত হয়। ছোট্ট অ্যানাপ্সিড থেকে শুরু করে বিরাট প্যারিয়্যাসর পর্যন্ত সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এক্সটিঙ্কশন ইভেন্ট হচ্ছে পার্মিয়ান-ট্রায়াসিক এক্সটিঙ্কশন ইভেন্ট। এতে ৯৫ পার্সেন্ট সামুদ্রিক জীব এবং ৭০ পার্সেন্ট স্থলজ জীব ধ্বংস হয়ে যায়। এই ইভেন্ট নিয়ে বেশ কয়েকটি হাইপোথিসিস আছে। সবচেয়ে জনপ্রিয়টি হচ্ছে, সাইবেরিয়ান ট্র্যাপস থেকে ম্যাগমা ক্ষরনের ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস বেড়ে গিয়েছিল। এটিই পৃথিবীর প্রায় সব প্রাণীদের ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট ছিল। পৃথিবীর অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে স্বাভাবিক হতে সময় লেগেছিল তিন কোটি বছর।

ছোট্ট আর্কোসররা পার্মিয়ানের এক্সটিঙ্কশনের সময় সারভাইভ করেছিল। পরবর্তীতে তাদের থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বাঘা বাঘা সব ডাইনোসররা।

সমুদ্র জিত সাহা

ফসিলের বয়স

স্বপ্নীল জয়ধর

কখনও ভাবতে অবাক লাগে না প্রত্নতত্ত্ববিদরা যে এত এত প্রাচীনকালের পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করা ডাইনোসরের ফসিল মাটি থেকে উদ্ধার করে এরপরই ফটাফট তাদের বয়স কত আই মিনতারা কত বছর আগে পৃথিবীতে ছিল তা বের করে দেয়, তারা এগুলো কীভাবে করে? মানলাম, তারা তাদের ফসিল উদ্ধার করে তারপর মিউজিয়ামে রাখে এই পর্যন্ত সব ঠিক আছে। কিন্তু এরপরই তারা যে সেইসব কঙ্কাল বা ফসিলগুলো কত বছর আগে পৃথিবীতে জীবিত অবস্থায় ছিল তা বের করে দেয় এটা একটু বেশি মনে হচ্ছে না? হ্যাঁ, মানছি ছোটবেলা আমারও মনে হতো এসব। এরপর... আমার এক বড় ভাই আমাকে এর পিছনের বিজ্ঞান বলে আমার ভুল ভাঙাল।

তো, আমি আমার বড় ভাইয়ের থেকে তো জানলাম।
এবার আমি যাব বড় ভাইয়ের জায়গায়, তোমরা যাবা আমার জায়গায়। আমি তোমাদের শোনাব আর কী, কীভাবে তুমি ফসিলের বয়স নির্ণয় করবে?

প্রথমেই আমি ফসিল সম্পর্কে কিছু কথা বলি। প্রাণীর মৃতদেহ থেকে ফসিল তৈরি হয়। কোনো প্রাণী বা গাছ যখন মারা যায় তখন সেই প্রাণীর মৃতদেহ দীর্ঘদিন ধরে ব্যাকটেরিয়ার প্রভাবে মাটির সাথে মিশতে শুরু করে। প্রাণীর দেহের নরম অংশগুলো যেমন মাংসে দ্রুত পচন ধরে। কিন্তু হাড় বা খোলসের মতো শক্ত জিনিসগুলো এত দ্রুত পচন ধরে না। মাঝে মাঝে এইসব হাড়ের ফাঁকে ফাঁকে মাটির বিভিন্ন পদার্থ যেমনঃ ক্যালসিয়াম প্রবেশ করে হাড়গুলোকে আরো মজবুত করে তোলে যার ফলে এইসব টিকে থাকে হাজার হাজার বছর। এই হাড়গুলো তখন ফসিলে পরিণত হয়।

সাধারণত প্রত্নতত্ত্ববিদরা মাটি খুঁড়ে এ সকল ফসিল উদ্ধার করে। তো, ধরে নিলাম আমি আমার বাসার পিছনে বাগানের মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে ফসিল উদ্ধার করতে চাই(খুশির ঠেলায় আর কী) তো আমি মস্ত বড় ডাইনোসরের ফসিল বেরও করলাম। এবার হয়তো ভাববে আমি এবার বিখ্যাত হব! কিন্তু দাঁড়াও, আমরা বাঙালি, তো আমরা আগে অনেক কিছু জোড়াতালি করে বিশ্ব বিখ্যাত হওয়ার চেষ্টা করেছি। তাই স্বভাবতই আমার এই ডাইনোসরের ফসিলের কথা কেউ বিশ্বাস করবে না, তাই আমি সোজাপথে না গিয়ে একটু বাঁকা পথে গিয়ে আগে বয়স নির্ণয় করব তারপর সবাইকে দেখাব, এবার সবাই বিশ্বাস করবে। বলে তো দিলাম বয়স নির্ণয় করব, কিন্তু এটাতে অনেক টাফ কাজ। তবুও আমিও হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নই, আমিও শুরু করে দিলাম।

তো, আমার কাছে এখন দুটো পদ্ধতি আছে এই বয়স নির্ণয় করার জন্য।
১) শিলাখণ্ডের গঠন দেখে
২) কার্বন ড্যাটিং করে।

প্রথমে বলেছি শিলাখণ্ডের গঠন দেখে ফসিলের বয়স নির্ণয়ের কথা।
আমি মাটির যে স্তরে ফসিল পেয়েছি সেই স্তরের শিলাখণ্ডের গঠনের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা প্রাথমিকভাবে ধারণা করে নেন ফসিলটা কত বছর আগের হতে পারে। আমাদের পৃথিবীর এই শিলাস্তর হচ্ছে আসলে একটা অ্যালবামের মতো। মাটি খুঁড়ে একটার পর একটা স্তরে যাওয়া, আর অ্যালবামে পাতার পর পাতা পুরোনো ফটো ওল্টানো একই ব্যাপার। কি বিশ্বাস হচ্ছে না? বিজ্ঞানীরা এই পাতা বা মাটি ও শিলার স্তরকে কয়েকটা প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এই সবগুলো স্তরের মধ্যে কয়েকটা হলো- Paleozoic, Mesozoic, and Cenozoic স্তর। এই অ্যালবামের পাতা উল্টে

আমি অর্থাৎ তিনটা শিলাস্তর ধরেই ৫০০ মিলিয়ন বছর আগের পৃথিবীতে চলে যেতে পারি!
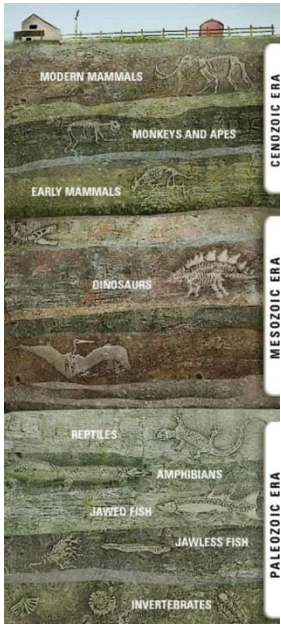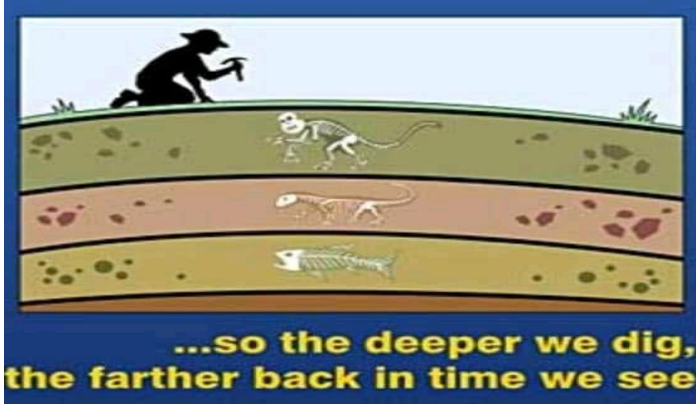
ছবিটা দেখুন। এখানে তিনটা স্তর দেখছি। এর মধ্যে সবচেয়ে নিচে আছে Paleozoic স্তর। তার মানে এই তিনটা স্তরের মধ্যে প্যালিওজোয়িক(Paleozoic) স্তরটা সবচেয়ে পুরোনো। এর মাধ্যমেই আমি ৫০০ মিলিয়ন বছর আগের পৃথিবী কেমন ছিল মোটামুটি জানতে পারি। আমি যদি কোনোভাবে ঐ স্তরে ফসিল খুঁজে পাই তবে সেগুলো হবে- সরীসৃপ, উভচর, মাছ এবং অমেরুদণ্ডী প্রাণী। এই স্তরের ফসিলগুলো ৫০০ মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে বিরাজমান ছিল। তবে দুঃখের বিষয় এই স্তরে কোনো ডাইনোসর পাব না। কারণ ডাইনোসরেরা তখনও আসেনি পৃথিবীতে। আমি এর উপরের স্তরে অর্থাৎমেসোজোয়িক (Mesozoic) স্তরে ডাইনোসর পাবো। এই স্তর হলো ২৫০ মিলিয়ন বছরের পুরোনো। তার মানে বলা যায় ডাইনোসররা এসেছিল প্রায় ২৫০ মিলিয়ন বছর আগে। তবে এই স্তরে কোনো স্তন্যপায়ী প্রাণী খুঁজে পাবেন না। তাদের পাবেন এর উপরের স্তর, সেনোজোয়িক (Cenozoic) স্তরে। আমরা এখন এই স্তরের উপরেই বাস করছি। এই স্তরের বয়স মাত্র ৬৫ মিলিয়ন বছর।

যাইহোক, এভাবে নিচের দিক হতে শুরু করে উপরে যেতে যেতে দেখতে পাব আমাদের পৃথিবীর স্মৃতিময় অ্যালবাম। বুঝতে পারব কার কত বয়স। এ থেকে বুঝা যায় কীভাবে পৃথিবী তার সন্তানদের সাথে সাথে নিজেও বিবর্তিত হয়েছে সময়ের স্রোত ধরে।

অনেক তো বললাম ভাবছি এই পদ্ধতিতে বয়স নির্ণয় করে আমি বিখ্যাত হব, ওয়ার্ল্ড ফেমাস হব। কিন্তু এখানেও একটা সমস্যা আছে। সেটা হলো এই পদ্ধতিতে একটা অনুমান ভিত্তিক বয়স বের করা যায়, কিন্তু ফসিল এর প্রকৃত বয়স বের করা যায় না। যেহেতু প্রথম পদ্ধতি দিয়ে আমি প্রকৃত বয়স বের করতে পারলাম না তাই আমাকে এখন ধরতে হবে দ্বিতীয় পদ্ধতি। কার্বন ড্যাটিং পদ্ধতি। এটা একটু জটিল তাই সবাই একটু মন দিয়ে পড়ি।

এই কার্বন ড্যাটিং পদ্ধতির মাধ্যমে বয়স নির্ণয় করা যায়। যা একটা নিখুঁত পদ্ধতি।

এই কার্বন ড্যাটিং কী তা সম্পর্কে জানতে আগে কার্বনের পারমাণবিক গঠন সম্পর্কে জেনে নিই। আমরা জানি, সকল পদার্থ মূলত ৩টি মৌলিক কণা দ্বারা গঠিত – ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। একেকটি মৌলের প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রন সংখ্যা একেক রকম। যেমন কার্বনের প্রোটন সংখ্যা ৬ আর নাইট্রোজেনের প্রোটন সংখ্যা ৭। আমরা প্রকৃতিতে যে কার্বনের সাথে পরিচিত তা মূলত কার্বন-১২। অর্থাৎ এই কার্বনে ৬টি প্রোটন ও ৬টি নিউট্রন থাকে। কিন্তু প্রকৃতিতে এমন কার্বন অণুও আছে যেখানে নিউট্রনের সংখ্যা হলো ৮টি। এই কার্বন অণুগুলোকে বলা হয় কার্বন-১৪। কার্বন-১৪ এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এরা ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মাধ্যমে কার্বন-১৪ অণু থেকে প্রোটনের সংখ্যা পরিবর্তিত হতে থাকে এবং একসময় কার্বন-১৪ অণু নাইট্রোজেন পরমাণুতে পরিণত হয়। অর্থাৎ কোনো বস্তুতে কিছু পরিমাণ কার্বন-১৪ অণু থাকলে ধীরে ধীরে সেই বস্তুর কার্বন-১৪ এর পরিমাণ কমতে থাকবে।

প্রতিটি প্রাণীর শরীরেই কার্বন থাকে। প্রকৃতি থেকে উদ্ভিদ সরাসরি কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণের মাধ্যমে কার্বন গ্রহণ করে আর সেই প্রাণীরা সেই উদ্ভিদ খেয়ে প্রকৃতির কার্বন গ্রহণ করে। গৃহীত এই কার্বনের বেশিরভাগ অংশই কার্বন-১২, তবে এতে কিছু পরিমাণ কার্বন-১৪ ও থাকে। তাই প্রাণীর ফসিলে থাকা কার্বনের মাঝে কার্বন-১৪ ও উপস্থিত থাকে। বিজ্ঞানীরা যখন কোনো ফসিল পান তখন সেই ফসিলে কী পরিমাণ কার্বন-১২ আর কী পরিমাণ কার্বন-

১৪ আছে তা পরীক্ষা করে বের করেন। আগে বিটা কাউন্টিংয়ের মাধ্যমেই কার্বন-১৪ এর পরিমাণ নির্ণয় করা হতো। তবে বর্তমানে 'অ্যাক্সেলেটর মাস স্পেক্ট্রোমিটার'-এর মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা ফসিলের কার্বন-১৪ ও কার্বন-১২ এর অনুপাত নির্ণয় করেন।

যেহেতু কার্বন-১৪ এর পরিমাণ সারাক্ষণ কমতে থাকে তাই যে ফসিলে কার্বন-১৪ এর অনুপাত কম সেই ফসিলের বয়স বেশি। কার্বন-১৪ এর অর্ধায়ু প্রায় ৫৭৩০ বছর। অর্থাৎ কিছু পরিমাণ কার্বন-১৪ নেওয়া হলে সেই কার্বন-১৪ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে অর্ধেকে পরিণত হতে সময় নেবে প্রায় ৫৭৩০ বছর। যে সময়ে কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থের মোট পরমাণুর ঠিক অর্ধেক পরিমাণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাকে ঐ পদার্থের অর্ধায়ু বলে।

আমরা যখন মারা যাই, তখন কার্বন-১২ এবং কার্বন-১৪ সমান অনুপাতে থাকে। কিন্তু পরে কার্বন-১৪ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। আর কার্বন-১২ তার আগের পরিমাণেই স্থির থাকে। তুমি যদি কোনো ফসিলে এই কার্বন-১২ ও কার্বন-১৪ এর অনুপাত বের করে ফেলতে পার, তবে তুমি ফসিলটার বয়স জেনে যাচ্ছ। এর জন্যে একটা সূত্র আছে।

t = ln (Nf/No) / (-0.693) x t1/2,

এখানে,

ln = Natural logarithm

Nf/No = Percentage of Carbon-14

t1/2 = Half-life of Carbon-14 = 5730 years

এখন ধরো তুমি একটা ফসিল পেলে যেটায় কার্বন-১৪ আছে ১০%। তাহলে ঐ ফসিলের বয়স হবে-

t = ln (0.10) / (-0.693) x 5,730 years

t = (-2.303) / (-0.693) x 5,730 years

t = 3.323 x 5,730 years

t = 19,040 years old

অর্থাৎ ১৯,০৪০ বছরের পুরোনো সেই ফসিল!

দেখলে কত সোজা? জাস্ট সূত্রে কয়টা মান বসিয়ে দিলেই ফসিল এর বয়স কত, তা নির্ণয় করা যায়!

এখন তো আমার বিখ্যাত হতে সমস্যা নাই 😊

তথ্যসূত্র

Flying Monsters with David Attenborough

রিভিউয়ার: সমুদ্র জিত সাহা

প্রাচীন পৃথিবীর মত চমকপ্রদ বিষয়, আর তাতেআমার-আপনার প্রিয় ডেভিড এটেনবরোর কিছু থাকবে না এমন হয় নাকি?

BBC Planet Dinosaur এর গ্রাফিক্স দেখে চক্ষু ছানাবড়া হলে তা ঠিক করতে দেখতে পারেন মাত্র ১ এপিসোডের এই ডকুমেন্টারি, টেরোসরদের ব্যাপারে সর্বোচ্চ ডিটেইলে জানতে পারবেন অনেক কিছু।

কেন তাদের আকাশে উড়তে হলো ?

কীভাবে উড়ার মত করে বিবর্তিত হলো ?

কীভাবে উড়ত ?

ভালো বাজেট থাকায়, ২০১১ সাল সত্ত্বেও গ্রাফিক্স অসাধারণ।

সাথে ডেভিড এটেনবরোর অসাধারণ ন্যারেশন তো আছেই।
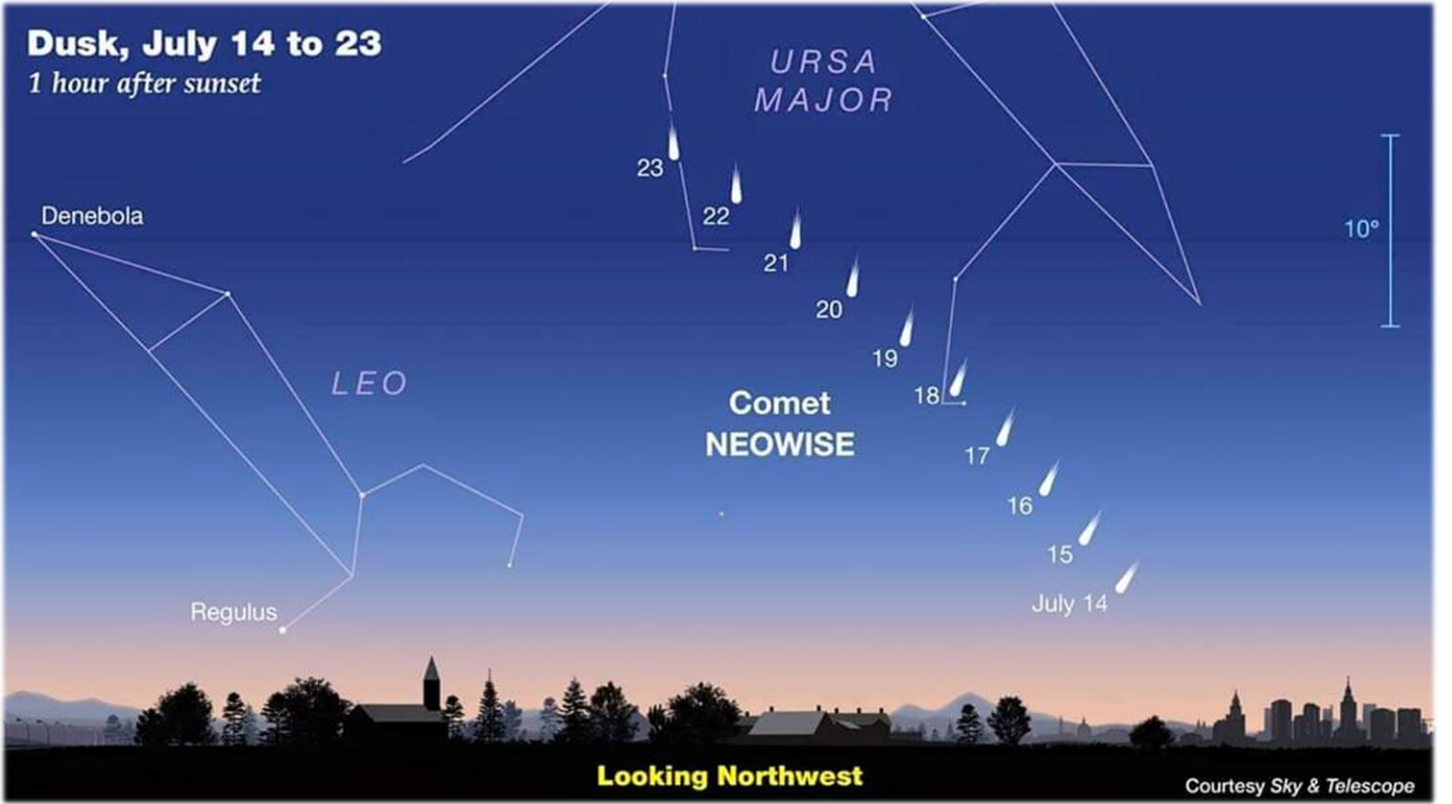
C/2020 F3 (NEOWISE)

হৃদয় হক

বর্তমানে জ্যোতির্বিদ্যা প্রেমীদের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হল এই ধূমকেতু। আমি জানি অনেকেই একে নিয়ে অনেক কিছুই জানেন। তাই কথা না বাড়িয়ে আমরা দেখার উপায়ে চলে যাই।

এই ধূমকেতুটা খালি চোখে দেখা যাবে, তবে কম কিংবা শূন্য তথা আলোক দূষণমুক্ত এলাকায়। যেকোনো ক্ষমতার বাইনোকুলার থাকলে এটা দেখতে বেশ সহজ হবে। এটা আগস্টের অর্ধেকের মতো থাকবে।

যাহোক আকাশের কোথায় থাকবে তা নিয়ে বলি।

১৪ তারিখের পর থেকে একে সন্ধ্যায় আকাশের উত্তর-পশ্চিমে দেখা যাবে। যতই দিন এগোবে ততই এটি দিগন্তের উপরে উঠে আসবে এবং ততই এর উজ্জ্বলতা হারাতে থাকবে। ২২ তারিখ এটি পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে থাকবে, তবে তার মানে এই না যে এটি সেদিন সবচেয়ে উজ্জ্বল থাকবে। সত্যি বলতে ১৪-১৬ তারিখ এটি বেশ উজ্জ্বল দেখালেও দিগন্তের বেশ নিকটে থাকায় আমাদের দেখা খুবই কষ্টকর হবে। তাই আমাদের উচিত ১৭ তারিখ থেকেই মাঠে নামা। ৭টা ২০মি. থেকেই একে ভালো করে দেখতে পাওয়া যাবে। আবারও বলছি ২২ তারিখ পৃথিবীর নিকটে থাকা মানেই সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখা নয়, এই দিন এর উজ্জ্বলতা পূর্বের দিন থেকে কমে যাবে তাই ১৭ তারিখ থেকেই পর্যবেক্ষণ শুরু করুন।
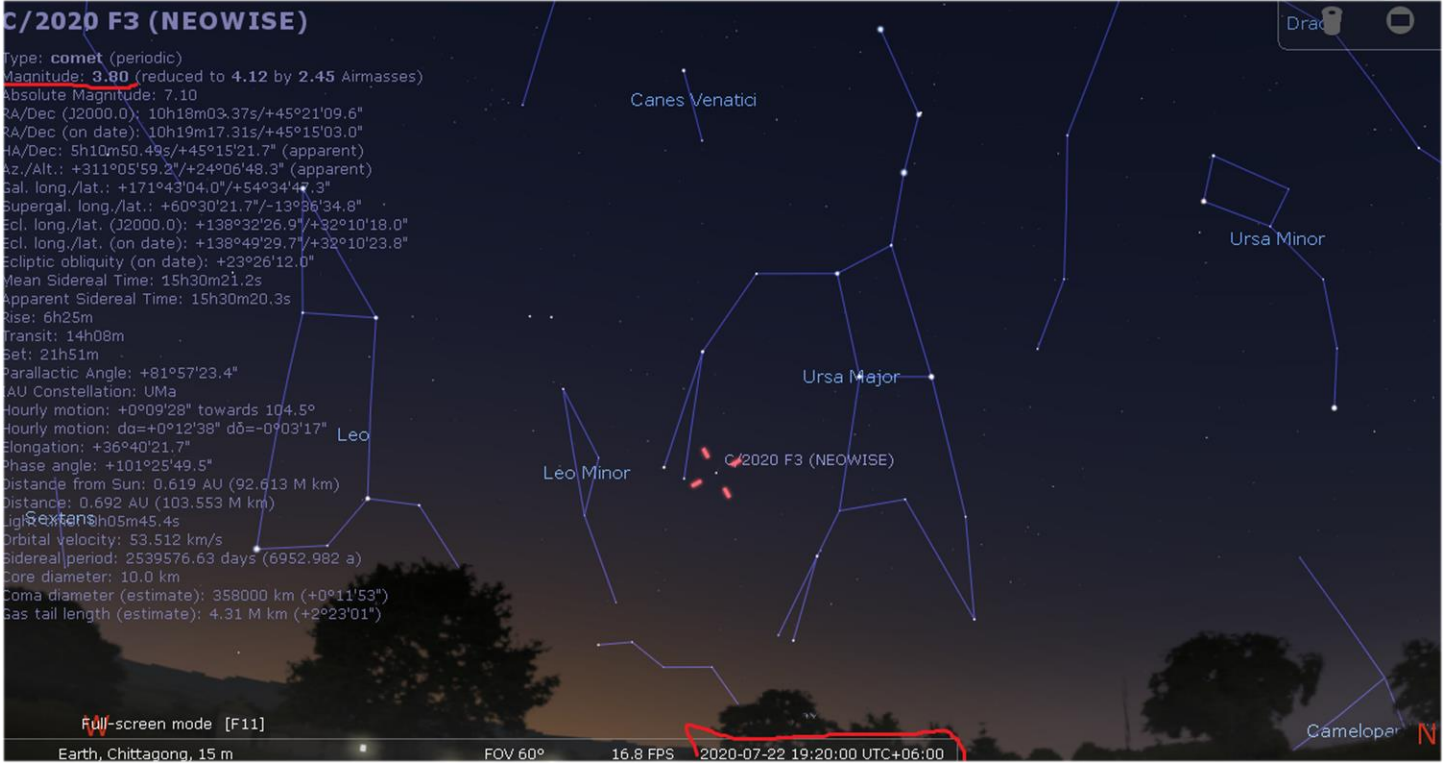
এবার ধূমকেতুটির অবস্থান আরেকটু পরিষ্কার করে পেতে ছবির তারাচিত্রটিতে লক্ষ্য করুন। এটা সপ্তর্ষি মণ্ডলেরই মধ্যে থাকবে। সন্ধ্যায় উত্তর-পশ্চিমে ৭টি প্রায় সমান উজ্জ্বলতার তারা দেখা যায়, দেখতে অনেকটা প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো। বুঝতে বেগ পেতে হয় না এরা সপ্তর্ষি মণ্ডলের তারা। ইংরেজিতে "Ursa Major", বাংলায় আসলে বৃহৎ ভল্লুক বলা হলেও, সপ্তর্ষি নামে বেশ জনপ্রিয়। ছোটবেলায় গ্রামবাংলায় পরিবার পরিজনদের নিকটে কিংবা স্কুলের পাঠ্যবইতে এর কথা জানা যায়। ৭টি তারা ও এর নিচের কিছু তারা নিয়ে এই মণ্ডল গঠিত।

১৭ তারিখ এটি সপ্তর্ষির বেশি নিচে থাকবে। দিনের পর দিন এটি আরো উপরে উঠে আসবে এবং উজ্জ্বলতা হারাতে থাকবে। ১৭ ও ২২ তারিখের ছবিতে দেখুন, প্রভার[1] মান বেড়ে যাচ্ছে তার মানে উজ্জ্বলতা কমে যাচ্ছে। এমন করে ৩০ জুলাইয়ের মাঝে এর প্রভা ৫ এর কাছাকাছি চলে যাবে। এরপর থেকে একে খালি চোখে দেখা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তবে বাইনোকুলার বা সাধারণ টেলিস্কোপ দিয়ে দেখা যাবে অন্তত আগস্ট পর্যন্ত।

পাদটীকা:

১. ম্যাগনিটিউড বা আপাত উজ্জ্বলতা বা প্রভা - নক্ষত্রের আকার ছোট বড় হবার কারণ হল তার আপাত উজ্জ্বলতা বা প্রভা, তাই প্রভার মানদন্ডর পরিসর আরো বাড়ানো হয়, মানে স্কেল ঋণাত্মক মানের দিক যেতে শুরু করে। কোন বস্তুর আপাত প্রভার মান যত কম তার উজ্জ্বলতা তত বেশী

তথ্যসূত্র

অ্যা ব্রিফ হিস্টোরি অব টি-রেক্স

নূর-এ নাঈম শান্ত

আপনারা সবাই নিশ্চিয়ই সাকিব আল হাসানকে চেনেন। ক্রিকেট খেলেন ব্যাটে-বলে সমানে সমানে। কিন্তু যদি আপনাদের বলি সেরা ব্যাটসম্যানের কথা তাহলে? সাকিব ভাই আশি-পঁচাশি পাবে। কেউ কেউ হয়তো তার থেকে বেশি পাবে। আবার বোলারের ক্ষেত্রেও একই কথা আশি পর্যন্তই। সেরা ফিল্ডারও তেমনি।

কোনোটাতেই তিনি সেরা নন। কিন্তু যখনই কথা আসে সেরাদের সেরা নির্বাচনের তখন! তার আনাগোনা তখনই শুরু। ব্যাটসম্যান কিংবা বোলার হয়ে কেউ একশ পেলেও সাকিব ভাইয়ের দুটো মিলে ১৬০ কে ধরার মতো কেউ তখন থাকে না। তবে বিশ্বে কিন্তু আবার অনেক অলরাউন্ডার ছিল এটাও মনে রাখতে হবে।

আচ্ছা আচ্ছা ফালতু কথা বাদ দেই, এখন আলতু কথা বলি। উপরের কথাগুলো বললাম টিরানোসরাস রেক্সকে উদ্দেশ্য করে। সবাই টি-রেক্স বলতেই পছন্দ করে। ডাইনোসরের নাম শুনলেই ভেসে ওঠে এর ছবি। কিন্তু কেন ওঠে? এটি তো সবচেয়ে বড় ডাইনোসর নয়! আর্জেন্টিনোসরাসের দৈর্ঘ্য যেখানে প্রায় ৩০ মিটার (৯৮ ফুট) সেখানে টি-রেক্সের দিকে একবার তাকান। একসাথে কম্পেয়ার করেন! এখন বলবেন এরা তো তৃণভোজী। তৃণভোজীর মধ্যে তো ব্র্যাকিওসরাস কম যায় না। আচ্ছা বাদ দিলাম তৃণভোজীর কথা। মাংসাশীর মধ্যেও যে টি-রেক্স সবথেকে বড় এটা ভাবার কোনো দরকার নাই। স্পাইনোসরাস নিয়ে নিয়েছে সেই জায়গা। স্পাইনোসরাস দৈর্ঘ্যে সর্বোচ্চ ১৮ মিটারও হতো যেখানে টি-রেক্সছিল ১২ মিটার। এছাড়াও আছে কারকারোডন্টোসরাস, জাইগানোটোসরাস। যাই হোক এখন আপনাদের মাথায় আসতেই পারে, সাইজ দিয়ে কী হয়! বুদ্ধিই আসল। টি-রেক্সেরই হয়তো সবচেয়ে বেশি বুদ্ধি। তাই সে সবার থেকে এগিয়ে! কিন্তু না, ডাইনোসরের মধ্যেও ছিল চোর একটা জাতি। জানেনই তো চোরদের বুদ্ধি একটু বেশিই থাকে। র‍্যাপ্টররাও ছিল তেমনি। এছাড়াও র‍্যাপ্টর না হয়েও ট্রুডনরা ছিল সবচেয়ে বুদ্ধিমান ডাইনোসর। ধারণা হতে পারে এদের দ্রুতগামীতা সর্বোচ্চ! না তাও নয় ostrich mimic ornithomimids (এটাকে বাংলা করার ইচ্ছে অনুভব করছি না) নামের একটি ডাইনোসর। উপরের এতগুলো কথা বললাম শুধুমাত্র বোঝাতে যে, টি-রেক্স কোনো একটা কিছুতে সেরা না হলেও এরা ছিল সবকিছুতেই দক্ষ। যাই হোক এখন আসল আলোচনায় আসা যাক। তো শুরু করি আমার আজকের টি-রেক্স নিয়ে সেই আলোচনা। টি-রেক্সের পুরো নাম হচ্ছে টাইরানোসরাস রেক্স। এটি হচ্ছে থেরোপডা প্রজাতির। এরা জুরাসিক থেকে ক্রিটাসিয়াস পর্যন্ত ছিল । এরা বর্তমানের উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাংশে তখনকার লারামিডিয়া নামের দ্বীপ মহাদেশে বাস করত। বিভিন্ন পাথরে রূপান্তরিত হওয়া জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া গেছে যা ম্যাসট্রিচশিয়ান যুগের ৬৮ থেকে ৬৬ বছর আগেকার। এরা টাইরানোসরয়েডস পরিবারের শেষ সদস্য এবং শেষ অপক্ষী ডাইনোসরগোষ্ঠী। টাইরানোসরাস রেক্সের ইংলিশ করলে দাঁড়ায়: Tyrant lizard king অর্থাৎ অত্যাচারী সরীসৃপ রাজা। টি-রেক্স লম্বায় হতো প্রায় ১২.৩ মিটার (৪০ ফুট) আর উচ্চতায় হতো

৩.৭ থেকে প্রায় ৬.৬ মিটার পর্যন্ত! এরা ছিল বিশাল ভরের যা ৪,৫০০ কেজি থেকে ১৪,০০০ পর্যন্ত হতে পারত! আকার বড় হওয়ায় এরাই সাধারণত শিকার করত। এদের শিকার করার মতো কেউ ছিল না। তাই এরা দীর্ঘদিন (প্রায় ৩০ বছর) বেঁচে থাকত। ডাইনোসরিয়া মহাবর্গের প্রায় সব প্রজাতির মতই ক্রিটেসিয়াস-প্যালিওজিন এক্সটিঙ্কশন ইভেন্টের ঘটনায় প্রায় ৬৬ মিলিয়ন বছর আগে টি-রেক্স এই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এই গেল কিছু সাধারণ তথ্য। শুরু থেকে আবার শুরু করা যাক। তা চোখ দিয়েই শুরু হোক সেই আলোচনা। চোখের কথা শুনতেই আমার জুরাসিক পার্ক মুভির কথা মনে পড়ে যায়। এখানে দেখানো হয়েছে টি-রেক্সের দৃষ্টিশক্তি খুব একটা কাজের নয়। কাজেই কেউ যদি নড়াচড়া না করে তবে টি-রেক্স তাকে ধরতেই পারবে না। কিন্তু তখনকার বাস্তবতা তেমন ছিল না। টি-রেক্সের চোখের বাইনোকুলার রেঞ্জ ছিল ৫৫ ডিগ্রির আশে পাশে। এদের শুণ্ড ছোট এবং সংকীর্ণ হওয়ায় এদের দৃষ্টিশক্তি প্রখর হত। কিন্তু বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেলেন উল্টো ঘটনার। টি-রেক্সের দৃষ্টিশক্তি ছিল খুব ভালো। বর্তমানের ঈগল-আই থেকেও বেশি উন্নত ছিল তাদের দৃষ্টি। এছাড়া টি-রেক্সের চোখের পজিশন ছিল আজকের যুগের মানুষের মতো। তবে এদের চোখ ও অপটিক লব ছিল মানুষের থেকে স্বভাবতই অনেক বড়। চোখের পরেই আসা যাক নাকের দিকে। টি-রেক্সের নাক মোটেই মানুষের মতো ছিল না। এদের নাক ছিল জাস্ট মুখের উপর দুটো ফুটোর মতো দেখতে। তবে এই নাকের ঘ্রাণশক্তি ছিল অসম্ভব ভালো। অনেক দূর থেকেই শিকারকে অনুসরণ করতে পারত। খাবারের সন্ধানে মৃতদেহ খুঁজে বের করতে পারত। এখন একটু টি-রেক্সের মুখের দিকে তাকাই। আহা বেজায় কালো হয়ে গেছে যেন! সেই মুখের দিকে তাকিয়ে ভুলেও কেউ বন্ধু বানানোর চেষ্টা করবেন না। প্রথমেই বলছি টি-রেক্সের মুখ ছুড়ির মতো ধারালো দাঁতে সাজানো। মুখ ছিল অনেকটা গোলাকার। সেই গোলাকার চোয়ালেই সাজানো থাকত প্রায় ৬০টি ছুড়ির মতো ধারালো ১২ ইঞ্চির মতো দাঁত! যা কামড় বসানোর জন্য একেবারে নিঁখুত। টি-রেক্সের কামড় এবং গর্জন সম্পর্কে জানতে একটু অপেক্ষা করতে হবে। টি-রেক্সের মাথার খুলি ছিল ভীষণ শক্ত। অন্য বড় কোনো প্রাণী কামড় দিলে বা আপনি ধরেন কোনো কিছুর সাহায্য নিয়ে খুব জোরে আঘাত করলে খুব একটা সমস্যা হতো না এদের। এমনকি নাকের কাছে হাড়গুলোও অনেক শক্ত ছিল। এমনকি টারবোসরাসের কয়েকটা কামড়ও সহ্য করার ক্ষমতা রাখত এরা। এখন একটা দানবের পিচ্চি হাতের দিকে তাকানো যাক। টি-রেক্সের যে সাইজ তাতে তার পিচ্চি হাত তার মুখের কাছাকাছিও যেত না। তাহলে কাজটা ছিল কী এই হাতের!! এই নিয়ে ভিন্নভাবে গবেষণা তাই অনুমিত ছিল। উনিশ শতকে প্যালিয়ন্টোলজিস্ট বার্নি নিউম্যানের মতেঃ টি-রেক্স বিশ্রামের সময় হাত ছড়িয়ে রেখে ঘুমাত এবং জেগে ওঠার সময় দুহাত ব্যবহার করত। এটি ছাড়া আরও একটি ধারণা হলোঃ টি-রেক্সের ছুটে চলার সময় হাত দুটি ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করত। এছাড়া শিকারকে কাবু করার কাজে নখ ও বাহু ব্যবহার করত। যাই হোক এদের হাতে বেশ পুরু ও ভারী মাংসপেশি ছিল। হাতের হাড়গুলোও ছিল মজবুত। বলতে গেলে মানুষের পায়ের উরুর মতো। এদের প্রতি বাহুতেই পুরু কর্টিকেল হাড় ছিল। গেল সামনের পা, এখন পিছনের পা নিয়ে বলি। টি-রেক্সের পিছনের লম্বা পা ছিল ম্যারাথন দৌড়ের জন্য। এই লম্বা পা তাদের ভালো দৌড়বিদ বানিয়েছে। এরা প্রায় ৪০ কি.মি বেগে দৌড়াতে পারত। তবে সেটা জুরাসিক পার্কে দেখানো ছবিটার মতো এত দ্রুত নয়। ৭০-৮০ কি.মি বেগে চলা গাড়িকে টি-রেক্সের ধরতে পারার সম্ভাবনা খুবই কম। তাদের পায়ের হাড় ছিল খুবই শক্ত। তবে এদিক-ওদিক ঘুরে তাকানোর জন্য এরা খুব একটা দক্ষ ছিল না বলেই ধারণা করা হয়। হ্যাঁ, আরেকটা ব্যাপার হলো টি-রেক্সের দাঁড়ানো। এরা দুপায়ের উপর ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত না। যদি সোজা হয়ে দাঁড়াতো তাহলে তার পায়ের হাড় দেহের ভারে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেত। তাই টি-রেক্সরা সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে ভূমির সাথে সমান্তরাল হয়ে দাঁড়ায়। এদের লেজ ছিল বেশ পেশিবহুল যা কোমর থেকে গিয়ে আস্তে আস্তে সরু হয়ে গেছে। এই লেজ এদের ভারসাম্য রাখতে সাহায্য করত। দৌড়ানোর সময় মাটির সমান্তরালে থাকলেও যাতে পড়ে না যায় তাতে সাহায্য করত। এছাড়া পা কে সামনে পিছনে নেওয়ার মধ্যবর্তী সময় কমিয়ে আনতে সাহায্য করত যাতে তারা দ্রুত দৌড়াতে পারে। টি-রেক্স নিয়মিত বড় বড় ডাইনোসর খেত। এদের হজম করার জন্য এদের শক্তিশালী পাকস্থলী ছিল । টি-রেক্সেরা জীবিত সহ মৃত প্রাণীও খেত। টি-রেক্সের শ্রোণিচক্রের গঠন ছিল সরীসৃপের মতো। এদের কশেরুকা মৌচাকের মতো আকারের ছিল। এখন আসা যাক টি-রেক্সের কামড়ের দিকে। টি-রেক্সের কামড় পৃথিবীর বুকে বাস করা যেকোনো স্থলচরের চেয়ে শক্তিশালী যা সবচেয়ে বড় মাংসাশী স্পাইনোসরাসের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। এদের কামড়ে ছিল প্রায় ৮০০০ পাউন্ড (৪০০০০ নিউটন)!!! যে কামড়ে থাকত ৬০টি ছুড়ির মতো ধারালো দাঁত! যা দিয়ে ৩০ ফুট লম্বা বর্মওয়ালা ডাইনোসর খেতে পারত! যাই হোক গর্জন দিয়ে শেষ করে দেই। মূলত টি-রেক্সের মুখ

খুলে গর্জনের প্রয়োজনই হতো না। এরা মুখ না খুলেই যে আওয়াজ করত তা পুরো চারপাশকে ভাইব্রেট করে দিত। জুরাসিক পার্কের মতো মুখ খুলে এরা হুঙ্কার দিতে পারত না। তবে এদের ডাকে ভৌতিক একটা পরিবেশ তৈরি হতো। বর্তমান ভূতের সিনেমায় এমন শব্দকে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু পরিশেষে বলতে চাই, এদের হারানোর মতো কেউ ছিল না ভেবে বসে থাকবেন না। ওই যে বলেছিলাম সাকিব ভাইয়ের মতো অলরাউন্ডার আরো আছে।

রেফারেন্স

Jurassic World Evolution

রিভিউয়ার: সমুদ্র জিত সাহা

ডাইনোসর এর ব্যাপারে জানেন অথচ জুরাসিক পার্ক/ওয়ার্ল্ড ফ্র্যাঞ্চাইজির নাম শোনেননি এমন মানুষ হয়তো পাওয়াই যাবেনা দুনিয়াজুড়ে। ব্যাবসায়িকভাবে প্রচন্ড সফল জুরাসিক পার্ক ও জুরাসিক ওয়ার্ল্ড ফিল্ম সিরিজের গেইম এই Jurassic World Evolution। ডাইনোসরের জন্ম দিয়ে, তাদের সিমুলেট করতে কার না ভালো লাগবে। ছোট বেলায় প্লাস্টিক মডেল দিয়ে খেলার মত এখানে বেশ ভালো গ্রাফিক্সের মডেল দিয়ে খেলা যাবে, যদিও গেইমটির উদ্দেশ্য শুধু এটা না। তবে আমার মত ডাইনোসর লাভাররা গেইমে ঢুকে শুধু এটুকুই করে।

এখানে আছে ৪৮টি প্রাকৃতিক ডাইনোসর, অসাধারণ গ্রাফিক্স এবং ডাইনোসরদের মারামারি/হাঁটাচলার রিয়ালিস্টিক সিমুলেশন। তবে জুরাসিক পার্ক/ওয়ার্ল্ড ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ডাইনোসরদের ব্যাপারে অনেক অনেক ভুল তথ্য দেখানো হয়, যার ব্যতিক্রম এই গেইমও না। টি-রেক্স বা ভেলোসিরেপ্টরদের ভুলভাবে তুলে ধরা একটা উদাহরণ মাত্র। তারপরও যারা পছন্দের ডাইনোসরদের একে অপরের সাথে মারামারি, কিংবা নিজের হাতে ভ্যালোসির‍্যাপটরদের দলবেঁধে শিকার করা সিমুলেট করতে চান তাদের জন্য এই গেইমটা পার্ফেক্ট। ২০১৮ সাল হিসেবে গ্রাফিক্স কোয়ালিটি এবং মিউজিক অসাধারন।

টার্ডিগ্রেড: দ্য গ্রেট এলিয়েন

মুস্তফা কামাল জাবেদ

আজকে এলিয়েনের গল্প হবে।
রহিমুদ্দিন,কলিমুদ্দিনের মতো 'আদার ব্যাপারী' টাইপের এলিয়েন না,সত্যিকারের এলিয়েন। যারা কিনা আইফোনের মতো এক্কেবারে হাই লেভেলের।
জোহান অগাস্ট এফ্রেইম গোজ নামে একজন জার্মান যাজক(!) ১৭৭৩ সালে টার্ডিগ্রেড খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি এর নাম দিলেন টার্ডিগ্রেডা। তারপর? বাকিটা পুরাই ইতিহাস! খুঁজে পেলেন বলছি কারণ,টার্ডিগ্রেড আবিষ্কার করার মতো কিছু না।ওরা এই দুনিয়ায় আগেও ছিল, এখনও আছে,আর ভবিষ্যতেও থাকবে! মানুষ যে এদের এত দেরি করে খুঁজে পেয়েছে- এটা মানবজাতিরই ব্যর্থতা। এই এলিয়েনগুলো নোকিয়া ৮০০ এর মতো রাফ এন্ড টাফ সিচুয়েশনেও টিকে থাকতে পারে। কীরকম? চলুন দেখা যাক:

টার্ডিগ্রেড যে এলিয়েন না এটা আপনি প্রমাণ করবেন। কী করে করবেন?
একটা কাজ করা যায়। চুলা গরম করে, এলিয়েন চুলায় যাক বলে, টার্ডিগ্রেডকে চুলায় ফেলে দিতে পারেন। কিন্তু এতে কি কাজ হবে?
আমরা জানি, পানির স্ফুটনাঙ্ক হলো ১০০° C,মানে এই তাপমাত্রায় পানি ফুটে বাষ্পে পরিণত হতে শুরু করে। কিন্তু ব্যাটা টার্ডিগ্রেড ১৪৮.৯° C তাপমাত্রায়ও দিব্যি হেসে খেলে বেড়ায়! এরা এলিয়েন না হয়ে পারে?

প্রথম প্ল্যান কাজ করেনি। তো কী হয়েছে, চলুন টার্ডিগ্রেডকে নিউমোনিয়া বাঁধিয়ে মারি। কিন্তু সমস্যা হলো (০.০৫ -১.২) মি.মি. সাইজ রেঞ্জের এই প্রাণী হিমুর সাথে হিমালয়েও আড্ডা দিতে যায়। এই শয়তানের কাছে -২০০° C এর মতো তাপমাত্রা কোনো ব্যাপারই না! এইবারও আপনি বলবেন এরা এলিয়েন না?

টার্ডিগ্রেড হায়ার টেম্পারেচারও সহ্য করতে পারে আবার লোয়ার টেম্পারেচারও সহ্য করতে পারে। কী মুশকিল!
এইবার ব্যাটাকে চাপে ফেলা যাক। সে তো আর আনোয়ারের এ1 পাইপ না যে 'চাপের বাপ' বলে চাপ সহ্য করে যাবে!
রেজাল্ট:
কীসের মধ্যে কী,পান্তা ভাতে ঘি! এইখানেও এলিয়েনের সুপার পাওয়ারের চমক দেখা যায়।
সমুদ্রের গভীরতম ট্রেঞ্চের চেয়েও ৬ গুণ বেশি চাপ ইনি সহ্য করতে পারেন। এই জন্য উনাকে স্পেসেও ছেড়ে আসা হয়েছিল। ফলাফল? আন্ডা। যাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের দুই-তৃতীয়াংশই বেঁচে ওঠে। ঠিক যেন, সাত জন্মের কাহিনী!
একবার চিন্তা করুন,আপনাকে ঐখানে রেখে আসলে কী হত?

টার্ডিগ্রেড শয়তানের জন্য অনেকগুলো অস্ত্রই কাজ করেনি। দুঃখের বিষয়! আরেকটা মারণাস্ত্র প্রয়োগ করা যাক। রেডিয়েশন খুব বিপজ্জনক জিনিস। যে মানুষ রেডিয়েশনের জন্য নোবেল পায় (তাও ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি দুইটাতেই) তাকেও ছেড়ে কথা বলে না। এই জন্য মাদাম মেরি কুরির নোটসগুলোও রেডিয়েশন প্রোটেক্টীভ গ্লাসের ভিতর রাখা। কিন্তু টার্ডিগ্রেডের বেলায়? তখন রেডিয়েশনেও কাঁচুমাচু করে বলেন, ওর জন্য একটু তো ছাড় দেওয়াই যায়! সব ধরনের UV রেডিয়েশনেও তিনি খুব কিউট ভেংচি দিতে পারেন। অবশ্যই এলিয়েন টাইপ ভেংচি।

মার্কেট পাওয়া যাক আর না যাক, টার্ডিগ্রেড যে এলিয়েন এই বিষয়ে সারাদিন চিল্লানো যায়। তারপরও নরমাল আরেকটা কথা বলি। এলিয়েন হতে হলে তাকে ঠিক কীরকম হতে হবে? সে সব জায়গায় থাকবে অথচ কেউ তাকে খেয়াল করবে না। জি হাঁ, টার্ডিগ্রেডের ক্ষেত্রেও এরকমটাই ঘটে। তাকে বনে জঙ্গলে,সাগরে,নদীতে,মরুভূমিতে,পাহাড়ে এককথায় পাতাল,মর্ত্য,অন্তরীক্ষ সব জায়গায়ই পাওয়া যায়। কিন্তু আপনি কি টের পান যে সে আছে?

এবার দেখা যাক থুক্কু শোনা যাক টার্ডিগ্রেডের প্রজননের কাহিনী। টার্ডিগ্রেড সেক্সুয়াল, এসেক্সুয়াল দুইভাবেই প্রজনন করতে পারে। একবারে এরা ৩০ টা পর্যন্ত ডিম দিতে পারে। সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের ক্ষেত্রে ফিমেল টার্ডিগ্রেড ডিম দেয় আর মেলগুলো ফার্টিলাইজ করে। আর এসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের ক্ষেত্রে ফিমেলগুলো ডিম দেয় কিন্তু ফার্টিলাইজেশন ছাড়াই সেগুলো বড় হয়।
এই অদ্ভুত কাজ-কারবার এলিয়েন ছাড়া কেউ করে? এটা অবশ্যই এলিয়েন।

আপনি খাবার ছাড়া, পানি ছাড়া কতক্ষন সার্ভাইভ করবেন? ১ দিন? ২ দিন? ৩ দিন? বড়জোর ৪ দিন? তারপর? ফটাস, আই মিন আপনি খতম। কিন্তু এই টার্ডিগ্রেড, হ্যাঁ, এই টার্ডিগ্রেড খাবার ছাড়া ১০ বছর, এমনকি ৩০ বছর পর্যন্ত থাকতে পারে! ভাবা যায়? Only alien can survive like this!

টার্ডিগ্রেড নিজে যেমন অদ্ভুত তেমনি খাবারও কিছুটা খায় অদ্ভুত। অ্যালগাই,লাইকেন,মজের জুস ওর ফেভারিট খাবার। কিছু কিছু আছে আবার কার্নিভোরাস। কিন্তু তারচেয়েও চমকপ্রদ বিষয় হলো কেউ কেউ ক্যানিবালিজমেরও আশ্রয় নেয়। আগে যে প্ল্যানেটে ছিল সেই প্ল্যানেটে বোধ হয় একজন আরেকজনকে কাঁচা চিবিয়ে খেত।

টার্ডিগ্রেডের অনেকগুলো সুপার পাওয়ারের গল্প শোনা হলো। কিন্তু এর চেয়েও রোমহর্ষক গল্প অপেক্ষা করছে! কী সেটা? চলুন শোনা যাক।
মনে করুন, আপনার চরম শোচনীয় অবস্থা। খাবার নেই,পানি নেই,তার উপর মরার উপর খাড়ার ঘা; একজন গার্লফ্রেন্ডও নেই। আপনি বাঁচবেন? বাঁচলে কী করে? আচ্ছা, আপনার গল্প বাদ দেই। এই জায়গায় টার্ডিগ্রেড হলে কী করতো?
সিম্পল, ক্রিপ্টোবায়োসিস! কী এই ক্রিপ্টোবায়োসিস?
টার্ডিগ্রেড যখন খুব খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখন সে তার বডির পানিকে স্কুইজ করে কার্ল করে ফেলে। কীভাবে? মাথা আর পা-গুলোকে একসাথে করে ছোট্ট একটা বল বানিয়ে ফেলে। এই বলকে টান বলে। পানি পাওয়ার কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই এটা আগের এলিয়েন আই মিন টার্ডিগ্রেডে পরিণত হয়! ৩০ বছর পর্যন্তও টান হিসেবে থাকার এদের রেকর্ড আছে! তখন নরমাল অবস্থার তুলনায় তার দৈহিক কার্যকলাপ ০.০১% হয়ে যায়।আর অর্গানগুলোকে রক্ষা করার জন্য trehalose নামক মিষ্টি জেল তৈরি করে। সেইসাথে বাড়িয়ে দেয় এন্টি-অক্সিডেন্ট তৈরির পরিমাণ। কী বুদ্ধি রে বাবা!

কাহিনী এইখানে শেষ হলেও একটা কথা ছিল, কিন্তু না। ডিএনএর জন্য বেচারা অর বেচারির মায়া বেশি তাই রেডিয়েশন থেকে ডিএনএ কে বাঁচাতে Damage Suppress নামক প্রোটিন প্রডিউস করে। আমাদের যেমন গরমে পাতলা নরমাল তাঁবু আর শীতের সময় মহিষের চামড়ার মতো মোটা তাঁবু লাগে তেমনি টার্ডিগ্রেডও বেশি ঠান্ডা হলে স্পেশাল টান তৈরি করে নেয়। বাবাগো বাবা! এই না হলে এলিয়েন!

আমরা মানুষ। আমরা কি এই পৃথিবীতে সবসময়ই টিকে থাকব? যত বিপর্যয় আসুক, আমরা কি খেয়ে-দেয়ে, ঘুমিয়ে জীবন পার করতে পারব? মেবি নট! বিলিয়ন বছরের ভিতরে পৃথিবীর উপর নানা ধরনের বিপর্যয় আসতে পারে। সুপারনোভা এক্সপ্লোশান, গামা রে'র আঘাত, উল্কা কিংবা গ্রহাণুর আঘাত এর মধ্যে কয়েকটা। তখন মানবসভ্যতার টিকে থাকার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। মানবসভ্যতার সেই দুর্দিনেও টার্ডিগ্রেড বুক ফুলিয়ে সন্তর্পণে ধরণীর বুকে বিচরণ করবে।

টার্ডিগ্রেড প্রায় ৬০০ মিলিয়ন বছর ধরে এই পৃথিবীতে আছে। এরপর থেকে ডাইনোসরের মতো বহু জীবই বিলুপ্ত হয়ে গেলেও টার্ডিগ্রেড সেই পথে যাবে বলে মনে হচ্ছে না। মনে হবেই বা কেন? যতই হোক,
Only alien can survive like this!
রেফারেন্সেস:

দ্য বোরিং বিলিয়ন

শুভ সালাউদ্দিন
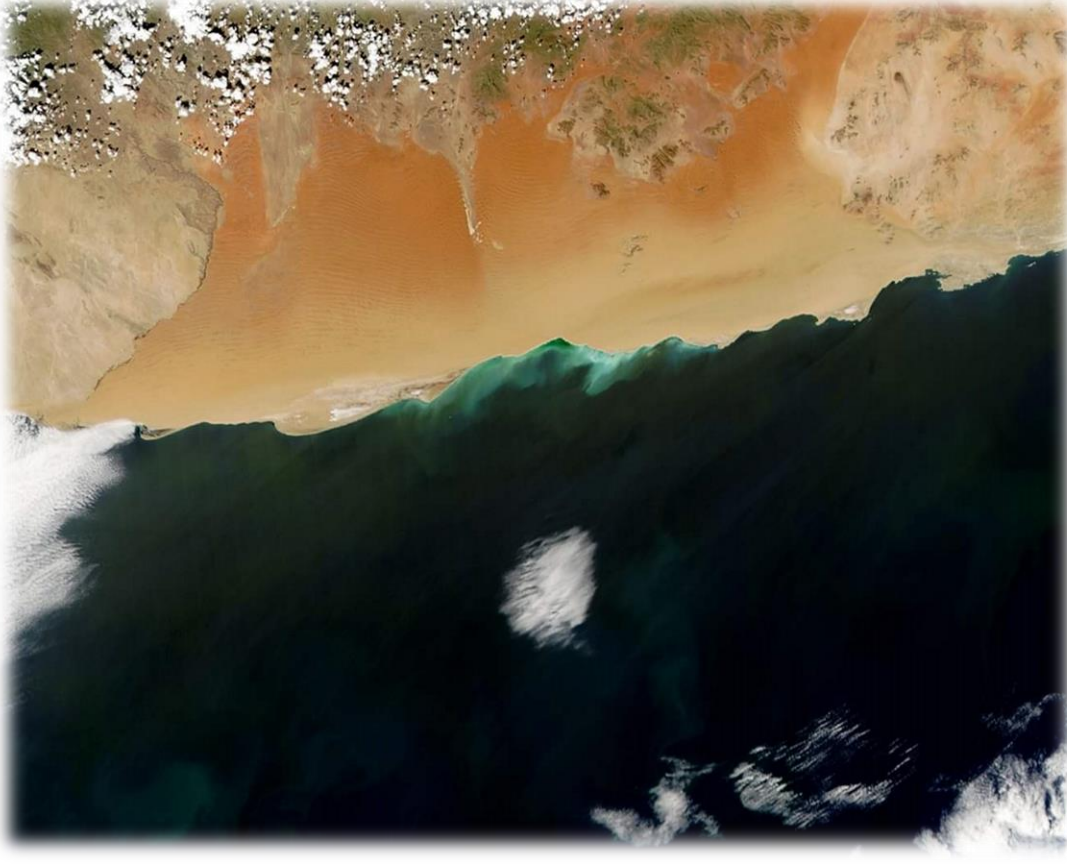
বছর নব্বই আগে ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল যদি বিবিসি রেডিও শুনতেন তাহলে অবাক হয়ে যেতেন কারণ সেখানে খবর প্রচারের সময় খবরের বদলে বাজানো হচ্ছিল পিয়ানো। এর মূলকারণ হলো তখন প্রচারের মতো কোনো খবর পাওয়া যায়নি। অ্যানাউন্সমেন্ট করা হয়েছিল "There is no news "। এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে যেখানে প্রতিনিয়তই কেউ না কেউ ভাইরাল হচ্ছে তার তুলনায় সেদিনটা ছিল নিতান্তই বোরিং। তেমনি পৃথিবীর ইতিহাসের মধ্যে প্রোটেরোজয়িক ইয়নটা মোটামুটি বোরিংই ছিল যেখানে অন্যসময় বিশাল দৈত্যাকার ডাইনোসর, মেরিন রেপ্টাইল দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল পৃথিবীতে। অগ্ন্যুৎপাত আর ধুমকেতু পৃথিবীকে নরকে পরিণত করেছিল, গ্লেইসিয়ার ইভেন্ট, বিশাল বিশাল ম্যাস এক্সটিঙ্কশনের মাধ্যমে প্রতিমুহূর্তে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল হাজারও প্রাণী সেদিক থেকে এই সময়টাতে পৃথিবীর জলবায়ু ছিল শান্ত, সূর্য ছিল ৫-১৮% কম উজ্জ্বল, প্লেট টেকটোনিক এর তেমন পরিবর্তন দেখা যায়নি, জীববিবর্তন ছিল প্রায় স্তব্ধ, তেমন বড় কোনো প্রাণীও ছিল না। এসব দেখে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্যালিয়ন্টোলজিস্ট মার্টিন ব্রেইসিয়ের (Martin Braiseir) তো নামই দিয়ে ফেললেন দ্য বোরিং বিলিয়ন (The Boring Billion)। এর ব্যাপ্তিকাল ১.৮-০.৮ বিলিয়ন বছর।

তবে নামটি বিরক্তিকর হলেও পৃথিবীর ইতিহাসে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। তখন জলে বিরাজ করছিল এক ধরনের সায়ানোব্যাকটেরিয়া যেটা সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে কিন্তু সালোকসংশ্লেষণের সময় পানির পরিবর্তে হাইড্রোজেন সালফাইড ব্যবহার করে আর অক্সিজেনের পরিবর্তে সালফার উৎপন্ন করে। কখনো কেমিস্ট্রি ল্যাবে পানির সাথে সালফার মিশ্রিত করে দেখেছেন কি রং হয়?

না দেখলেও ক্ষতি নেই আফ্রিকার এক সাগরে সালফার নির্গত হবার ফলে রঙের কি অবস্থা হয়েছিল তা নাসার আর্থ অবজারভেটরি থেকে তোলা প্রথম ছবিটা দেখলেই ক্লিয়ার হতে পারবেন। অনেকটা কালো কিন্তু পুরোপুরি নয়, সাথে সবুজ-নীলাটে

ভাব আছে। সেসময়ে পৃথিবীর সমুদ্রের পানির রং এমনই ছিল। একে বলা হয় ক্যানফিল্ড ওশান।

সে সময়েই হয়ত বহুকোষী জীবের উদ্ভব হয়েছিল পরে তারা আস্তে আস্তে যৌনপ্রজননের বৈশিষ্ট্য লাভ করে প্রাণী, উদ্ভিদ, ফ্যাঙ্গাসে বিভক্ত হয়ে যায়।

প্লেট টেকটোনিক এর কথা আমরা সবাই শুনেছি। এটা একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যা বলে পৃথিবীর ভেতরের স্তর বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। এই ভাগগুলো প্লেট নামে পরিচিত। প্লেটের নিচে রয়েছে গলিত লাভা ম্যান্টল। একারণেই প্লেটগুলো চলাচল করতে পারে। এর ফলেই ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের আবির্ভাব ঘটে, তৈরি হয় পাহাড়, ডুবে যায় দ্বীপ। এই প্লেটগুলো সব একসাথে গঠন করে সুপার কন্টিনেন্ট। পাথর, সেডিমেন্ট এবং আর্কিওলজিক্যাল প্রমাণের ভিত্তিতে ম্যাগমার গতিপথ এবং চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের প্রাবল্য থেকে টেকটোনিক প্লেটের পূর্বের অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়। এভাবে জানা গিয়েছে বোরিং বিলিয়ন এর সময়কালে কলম্বিয়া এবং রডিনিয়া নামে দুইটি সুপারকন্টিনেন্ট ছিল। কলম্বিয়া ২ বিলিয়ন বছর পূর্বে গঠিত হয় এবং ১.৩ বিলিয়ন বছর পর্যন্ত কোনো নড়াচড়া করেনি তবে ১.১-০.৯ বিলিয়ন বছর সময়কালে হালকা পরিবর্তন দেখা যায়। তাও ১.২৫ বিলিয়ন বছর আগে রডিনিয়া গঠিত হবার আগ পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। কারণ যদি নড়াচড়া করত তাহলে মাটির স্তরের গঠনের মাধ্যমে তার প্রমাণ পাওয়া যেত কিন্তু এক্ষেত্রে তা পাওয়া যায়নি। এই পুরো ঘটনাটাকে বলা হয় টেকটোনিক স্ট্যাসিস (Tectonic Statis).

বোরিং বিলিয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো-

The Great Oxidation Event

নাম শুনেই বুঝতে পারার কথা এটা বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন বৃদ্ধির একটা ঘটনা। এটার শুরু একদম বোরিং বিলিয়নের সময়কালে নয় তবে মধ্যবর্তী অংশটুকু এ সময়েই হয়। মূলত এই ইভেন্টের দুইটা পার্ট আছে।

•**Great Oxidation Event 1 (GOE1):** আর্কিয়ান সময়কালের দিকে বায়ুমন্ডলে কোনো অক্সিজেন ছিল না এটার মাধ্যমেই প্রথম অক্সিজেন সংযোজন শুরু হয়। এটা সংঘটিত হয় ২.৩-২.৫ বিলিয়ন বছরের দিকে। বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন ছাড়াও জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মৌল যেমন: সেলেনিয়াম, মলিবডেনাম, নাইট্রোজেন, জিংক বৃদ্ধি পায় আর নিকেল, কোবাল্ট, আর্সেনিক, মার্কারির পরিমাণ কমতে থাকে। এতে সমুদ্রের বিষাক্ততা কমতে থাকে, পৃথিবী ধীরে ধীরে বসবাস যোগ্য হওয়া শুরু করে তবে বলা চলে সে এখন ভ্রূণ হিসেবেই আছে আরও পাড়ি দিতে হবে অনেক পথ।
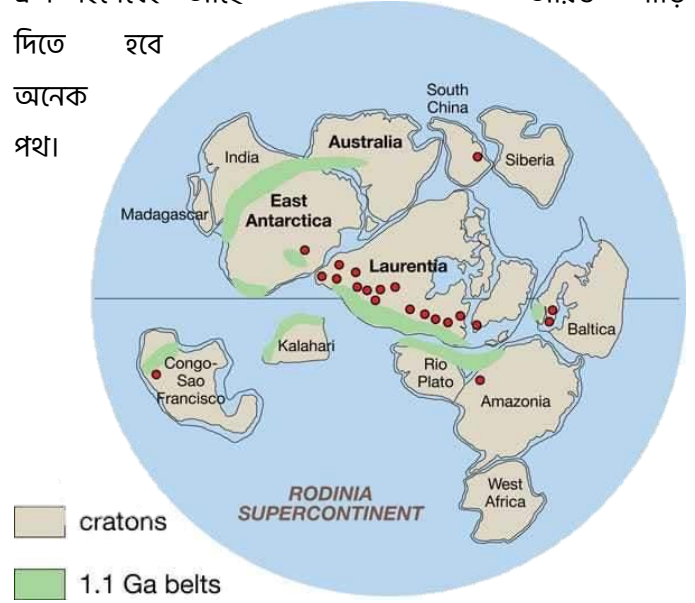
•**Great Oxidation Event 2 (GOE2):** এসময়ে জীবনধারণ উপযোগী মৌলগুলোর পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়। বহুকোষী সায়ানোব্যাকটেরিয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করে উপজাত হিসেবে অক্সিজেন তৈরি করতে থাকে।

আসলে পৃথিবী হঠাৎ করে বসবাসযোগ্য হয়ে উঠেনি। বিলিয়ন বিলিয়ন বছর সময় লেগেছে । অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে অনেক প্রাণী টিকে আছে সংগ্রাম করে, নতুন জীবের আবির্ভাব ঘটেছে, বিবর্তনের কারণে পরিবর্তন হয়েছে অনেক। আমরা অনেক কিছুই জানতে পেরেছি অনেক কিছুই পারিনি, হয়ত ভবিষ্যতে পারব হয়তো-বা পারব না, হয়তো নতুন কোনো কিছু চিন্তার পট পরিবর্তন করে দিবে। তবে যাই ঘটুক না কেন থেমে থাকা চলবে না প্রকৃতির স্তরে স্তরে লুকানো রহস্যকে উন্মোচন করার জন্য বহু পথ পাড়ি দিতে হবে। এজন্যই আইনস্টাইন বলেছিলেন,

"Our task must be to free ourselves by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature and it's beauty."

রেফারেন্স

লস্ট ওয়ার্ল্ড

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

রিভিউয়ার: নাঈম হোসেন ফারুকী

আপনি বসে আছেন তাঁবুর নিচে। সামনে ক্যাম্পফায়ারে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। আপনাকে ঘিরে ধরেছে এক ঘন দুর্ভেদ্য জঙ্গল। বহু দূরে আকাশে প্লেনের মতো উড়ছে অজানা কোনো দানব। ওপাশে জঙ্গলের আড়াল থেকে ভেসে আসছে রক্ত হিম করা চিৎকার।
আপনি কি ঘুমাবেন? এই ঠুনকো তাঁবু কি আপনাকে রক্ষা করতে পারবে? গভীর রাতে দাঁতালো দানব যদি হানা দেয়, ঠিক কী করতে পারেন আপনি?
চারপাশে নিষ্ঠুর জঙ্গল, দানবের পুকুর, রহস্যময় সব জীব-জন্তু, আদিম মানুষ - এর মাঝে অভিযানে এসেছেন একগুঁয়ে বৈজ্ঞানিক-প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, চ্যালেঞ্জারের একগুঁয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রফেসর সামারলী, শিকারী আর স্পোর্টসম্যান লর্ড জন রক্সটন, আর সাংবাদিক এডওয়ার্ড ম্যালোন। আপনাকে কয়েক ঘণ্টার জন্য প্রাগৈতিহাসিক আদিম পৃথিবীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই বইটা যথেষ্ট।
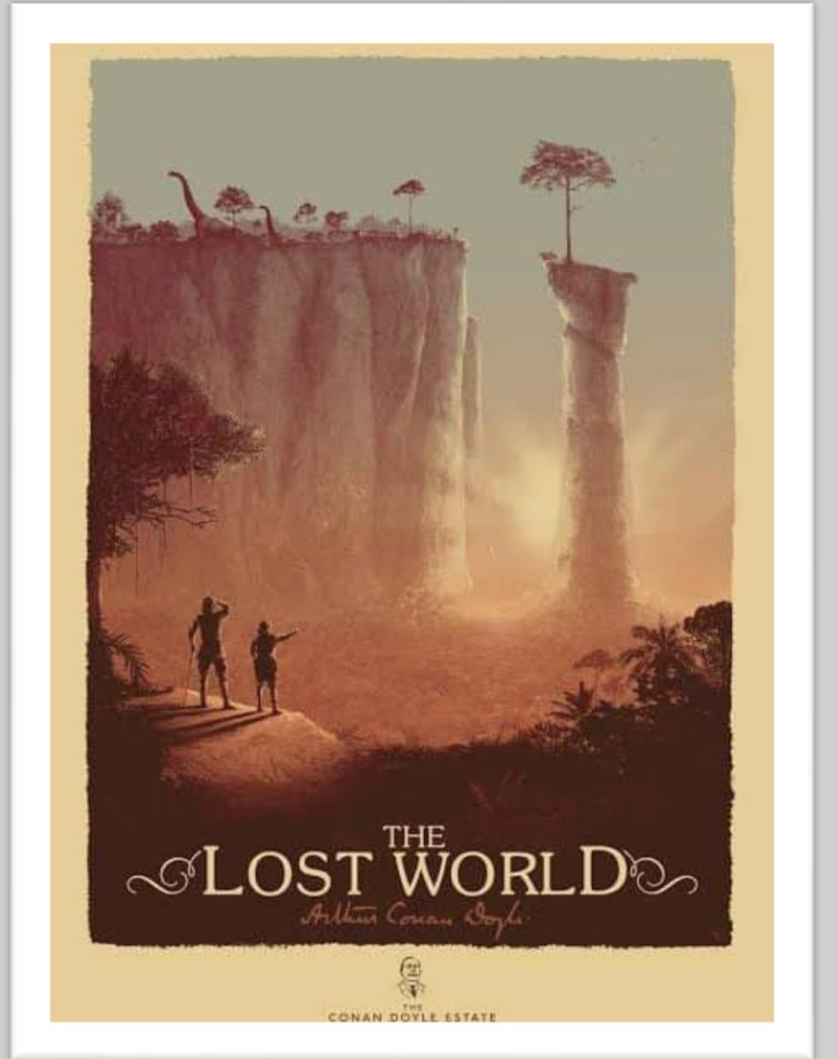
সিলাকান্থ

সাগ্নিক সিংহমহাপাত্র

১৯৩৮ সালের ২২শে ডিসেম্বরের সকাল। দক্ষিণ আফ্রিকার বন্দর শহর ইস্ট লন্ডনের (East London) স্থানীয় মিউজিয়ামের কিউরেটর মার্জরি ল্যাটিমারের (Marjorie Courtenay-Latimer) টেলিফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল। ফোন তুলে তিনি বললেন - "হ্যালো! কে বলছেন?"
ওপাশ থেকে কণ্ঠস্বর শোনা গেল - "আমি ক্যাপ্টেন গুসেন বলছি। আপনি এক্ষুনি একবার ডকে আসতে পারবেন?"
-"কেন বলুন তো?"
-"আজ সকালে আমাদের জালে অদ্ভুত দেখতে একটা মাছ ধরা পড়েছে। মাছটা সাইজে বিশাল বড়।"
-"বিশাল বড় মানে? কত বড়?"
-"এই ধরুন পাঁচ ফুটের কাছাকাছি।"
-"বলেন কি? দাঁড়ান আমি এক্ষুনি আসছি!"

এই বলে ফোন রেখে তড়িঘড়ি তিনি মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর চটজলদি একটা ট্যাক্সি ধরে পৌঁছলেন ডকে। পৌঁছে দেখেন ক্যাপ্টেন হেন্ড্রিক গুসেন (Captain Hendrik Goosen) মাছের একটি স্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। মিস

ল্যাটিমার দ্রুতপদে সেখানে পৌঁছে ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় মাছটা?"

ক্যাপ্টেন গ্যুসেন অঙ্গুলি নির্দেশ করে মাছের স্তুপের দিকে দেখালেন- "ঐখানে।"

মিস ল্যাটিমার দেখতে পেলেন স্তুপের মধ্য হতে একটি বিশাল বড় মাছের নীলাভ শরীরের কিছু অংশ উঁকি মারছে। সামনে এগিয়ে গিয়ে তিনি মাছটিকে স্তুপ থেকে টেনে বের করে আনতে চাইলেন। কিন্তু মাছটির শরীর অত্যন্ত পিচ্ছিল। ধরতে গেলেই বারবার হাত পিছলে যাচ্ছে। অবশেষে বেশ কয়েকবারের চেষ্টায় তিনি মাছটিকে স্তুপের মধ্যে থেকে টেনে বের করতে পারলেন। বের করে এনে মাছটিকে সামনে শুইয়ে দিয়ে বেশ মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করতে শুরু করলেন তিনি। তাঁর মনে হলো, এর আগে তিনি এত সুন্দর মাছ কখনও দেখেননি। মাছটির শরীর নীলাভ, সারা শরীর জুড়ে সাদা ছোপের বিস্তার, শরীর থেকে বেশ সুন্দর একটা নীল সবুজ আভা বেরোচ্ছে। শক্ত এবং ঘন আঁশ দিয়ে সারা শরীর আচ্ছাদিত। তিনি দেখলেন মাছটির চারটি পাখনা আছে যেগুলির সাথে চতুষ্পদী (Tetrapod) প্রাণীদের পায়ের বেশ মিল আছে। লেজটিও বেশ অস্বাভাবিক দেখতে, অনেকটা কুকুরছানার লেজের মত। মাছটির দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুটের কাছাকাছি।

মিস ল্যাটিমারের মনে হলো, মাছটির মধ্যে বেশ কিছু বিশেষত্ব আছে। অন্যান্য মাছের সাথে এর মিল সামান্যই। তিনি ভাবলেন, এটিকে পরীক্ষা করে দেখা গেলে হয়তো অনেক কিছু জানা যেতে পারে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। তখনই তিনি মাছটিকে ট্যাক্সিতে করে মিউজিয়ামে নিয়ে গেলেন। মিউজিয়ামে পৌঁছে বিভিন্ন বইতে তিনি মাছটির সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য খুঁজতে শুরু করলেন। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে কোনো বইতেই এই মাছটি সম্পর্কে কিছু লেখা ছিল না। মিউজিয়ামে প্রাণীদেহ সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটলেন নিকটবর্তী মর্গে। কিন্তু সেখানে তিনি কোনো সাহায্য পেলেন না। তারপর তিনি গেলেন রোডস ইউনিভার্সিটিতে (Rhodes University) তাঁর বন্ধু ইচথ্যায়োলজিস্ট ড. জে এল বি স্মিথের (Dr. James Leonard Brierley Smith) সন্ধানে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনিও তখন শহরের বাইরে ছিলেন। নিরুপায় হয়ে মিস ল্যাটিমার তখন অজ্ঞাতকুলশীল ঐ মাছটিকে পাঠিয়ে দিলেন একজন ট্যাক্সিডার্মিস্টের কাছে সংরক্ষণের জন্য। আর মাছটির একটি স্কেচ এঁকে পাঠিয়ে দিলেন প্রোফেসর স্মিথের কাছে।

জানুয়ারির ৩ তারিখে মিস ল্যাটিমার প্রোফেসর স্মিথের কাছ থেকে উত্তর পেলেন। চিঠিতে লেখা ছিল - "তুমি আমাকে যে স্কেচটা এঁকে পাঠিয়েছ তার সাথে আমি একটি বিলুপ্ত প্রাণীর আশ্চর্যরকম মিল খুঁজে পাচ্ছি। আমি যেটা সন্দেহ করছি এটা যদি তাই হয় তবে বলতে হবে তুমি একটা বিশাল বড় আবিষ্কার করে ফেলেছ।" এরপর তাদের মধ্যে আরো বেশ কিছুবার চিঠি চালাচালি হয় এবং টেলিফোন মারফত কথাও হয়। অবশেষে প্রায় দেড়মাস পর (১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯) শহরে ফিরে এলেন প্রোফেসর স্মিথ। ফিরেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন ইস্ট লন্ডন মিউজিয়ামে। মাছটির ট্যাক্সিডার্মি সামনাসামনি দেখে বিস্ময়ে তাঁর মুখ হাঁ হয়ে গেল। বিস্ময়ের ঘোর কাটবার পর মিস ল্যাটিমারের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন - "তুমি তো ফাটিয়ে দিয়েছ হে! যে জিনিস তুমি খুঁজে পেয়েছ, ধরে নাও ইতিহাসের বইতে তোমার নাম ছাপা হয়ে গেল। আর সেই সঙ্গে আমারও, কারণ প্রথম আমিই একে শনাক্ত করলাম কিনা!"

একথা শুনে মিস ল্যাটিমার তো অবাক। বললেন- "কেন? কী হয়েছে?"

প্রোফেসর স্মিথ আনন্দে লাফ দিয়ে উঠে বললেন- "আরে, এটা তো সিলাকান্থ (Coelacanth)! ৬৫ মিলিয়ন বছর আগে এই মাছ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।"

এবার মিস ল্যাটিমারের মুখ হাঁ হবার পালা। বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নিয়ে উনি বললেন - "বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল মানে? বিলুপ্ত হয়ে গেলে আবার খুঁজে পেলাম কি করে?"

"আরে সেটাই তো!" বললেন প্রোফেসর স্মিথ - "বিজ্ঞানীরা এই মাছের সর্বশেষ যে জীবাশ্ম খুঁজে পেয়েছেন, কার্বন ড্যাটিং করে জানা গেছে তা আজ থেকে প্রায় ৬৫ মিলিয়ন বছরের পুরনো। ৬৫ মিলিয়ন বছর মানে বুঝছ? ক্রিটেসিয়াস যুগের শেষ। মানে যখন ডাইনোসররা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়েছিল। এই মাছ সেই সময়ের। সবাই ভেবেছিল ডাইনোসরের সঙ্গে এই মাছও পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, সবাই ভুল ভেবেছিল।"

-"কি বলছ তুমি? তার মানে এটা তো বিশাল বড় একটা আবিষ্কার!"

-"সে তো অবশ্যই। ভাবতে পারছ এর থেকে কত অমীমাংসিত রহস্যের সমাধান হবে? জলচর প্রাণী থেকে কিভাবে স্থলচর প্রাণী এল সেই বিষয়টা এখনও অনেকটাই ধোঁয়াশা। এই আবিষ্কার থেকে সেই ধোঁয়াশা অনেকটাই কেটে যাবে আশা করা যায়।" তারপর মাছটির ট্যাক্সিডার্মির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বললেন- "যে মাছটিকে সবাই বিলুপ্ত ভেবেছিল , সে আসলে আমাদের

চোখের আড়ালে লুকিয়ে ছিল মাত্র।" তারপর মিস ল্যাটিমারের দিকে ফিরে বললেন, "এতদিন পর আবার সে ফিরে এসেছে। তুমি জান এরকম স্পিসিসকে কি বলা হয়? জীবন্ত জীবাশ্ম (Living fossil)!"

১৮ ই মার্চ তিনি তাঁদের এই আবিষ্কারের কথা সর্বসমক্ষে ঘোষণা করলেন। ঐদিনই তিনি নেচার পত্রিকায় এর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। চিঠিতে তিনি এই মাছের বৈজ্ঞানিক নাম হিসেবে উল্লেখ করলেন "Latimeria chalumnae", যেখানে গণের নাম আবিষ্কারক মিস ল্যাটিমারের নাম অনুসারে এবং প্রজাতির নাম যে নদীতে মাছটিকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল (Chalumna river) তার নাম অনুসারে দেওয়া হয়েছিল। ওই সিলাকান্থটির ট্যাক্সিডার্মি এখনও দক্ষিণ আফ্রিকার ইস্ট লন্ডন মিউজিয়ামে সযত্নে রাখা আছে। আর যে ডেকে ওই সিলাকান্থটি প্রথম পাওয়া যায় সেখানে মিস ল্যাটিমার এবং ক্যাপ্টেন গ্যুসেনের স্মৃতিতে তাঁদের নামে একটি ফলক (plaque) নির্মিত হয়েছে।

এই ঘটনার প্রায় ১৪ বছর পর ১৯৫২ সালে কোমোরোস দ্বীপে পাওয়া যায় প্রথম জীবন্ত সিলাকান্থ। তারপর আরো অনেক সিলাকান্থ খুঁজে পাওয়া যায়। রেকর্ড বলছে, ১৯৩৮ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে মোট ৮৪টি সিলাকান্থের স্পেসিমেন পাওয়া গেছে।
এরপর সোজা চলে যাওয়া যাক ১৯৯৭ সালে। ইন্দোনেশিয়ার সুলাওয়েসি দ্বীপের (Sulawesi) মানাডো টুয়ায় (Manado Tua) একটি মাছের বাজারে মার্ক এর্ডম্যান (Mark Erdman) নামক এক ভদ্রলোক হঠাৎ খোঁজ পান একটি মৃত সিলাকান্থের। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সিলাকান্থ পাওয়া গিয়েছিল তার থেকে এটি ছিল বেশ কিছুটা আলাদা। এটির রং ছিল বাদামী। এর্ডম্যান প্রথমে অবশ্য এটিকে গোমবেসা (Gombessa) ভেবে ভুল করেছিলেন। তবে বুদ্ধি করে তিনি সেই সময় মাছটির কিছু ছবি তুলে নেন। পরে সেই ছবিগুলি দেখে বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত করেন এটি সিলাকান্থই ছিল, তবে অন্য প্রজাতির। একথা জানার পর এর্ডম্যান ওই সালেই আবার সুলাওয়েসি দ্বীপে পাড়ি দেন। সেখানে গিয়ে তিনি বিভিন্ন জেলেদের জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু করেন। কিন্তু বিশেষ কিছু জানা যায় না। অবশেষে ১৯৯৮ এর জুলাই মাসে ওম লামেস সোনাথাম (Om Lamesh Sonatham) নামক এক জেলের জালে ধরা পড়ে আরেকটি ইন্দোনেশিয়ান স্পেসিমেন। স্পেসিমেনটির দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় চার ফুটের কাছাকাছি। সোনাথাম তৎক্ষণাৎ মাছটি হস্তান্তর করে দেয় এর্ডম্যানকে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাছটির অনেকগুলি ফটোগ্রাফ তুলে নেন। ফটোগ্রাফে ধরা পড়েছিল মাছটির কালারেশন, পাখনার মুভমেন্ট এবং বেশ কিছু সাধারণ আচার-আচরণ। দুঃখের বিষয়, ৬ ঘণ্টার মধ্যেই মাছটি মারা যায়। তবে মাছটিকে সযত্নে সংরক্ষণ করা হয় এবং তারপর সেটিকে বোগর জুলজিক্যাল মিউজিয়ামে (Bogar Zoological Museum) দান করে দেওয়া হয়। বিজ্ঞানীরা এর নাম দেন Latimeria menadoensis, এবার প্রজাতির নাম অবশ্য রাখা হয়েছিল মাছটি প্রথমবার যেখানে দেখা গিয়েছিল সেই স্থান, অর্থাৎ মানাডো টুয়ার নাম অনুসারে। আক্ষেপের বিষয়, এখনও অবধি মাত্র সাতটি ইন্দোনেশিয়ান সিলাকান্থ খুঁজে পাওয়া গেছে। এর মধ্যে শেষ সিলাকান্থটি পাওয়া যায় ২০১৪ সালে। কে জানে আবার কবে সমুদ্রের বুকে ভেসে উঠবে প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই জীবন্ত সাক্ষী, জলচর এবং স্থলচরের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী এক নীলাভ বিস্ময় - সিলাকান্থ।

(বি.দ্র. কথোপকথনের অংশটি লেখকের কল্পনাপ্রসূত)

রেফারেন্স

বিবর্তনে লিঙ্গ কেন এল?

সমুদ্র জিত সাহা

প্রতিটি জীবের জীবনের মূল লক্ষ্য হলো তার প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখা, তার প্রজাতির ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা। প্রজাতিকে ভবিষ্যতে টিকিয়ে রাখার জন্য নিজের কপি তৈরি করতে হবে, সোজা কথায় বাচ্চা পয়দা করতে হবে।
সেই বাচ্চা টিকে থাকলে আমার প্রজাতিও টিকে থাকবে। আর টিকে থাকবে সেই কপিটা যেটা সবচেয়ে ফিট, সবচেয়ে ভালো মানিয়ে নিতে পারবে দুনিয়ার সাথে, সবচেয়ে ভালো সার্ভাইভ করতে পারবে।
অনেক কপি তৈরি করলেও শেষ পর্যন্ত টিকে যাবে সেরা থেকে সেরা কপিগুলোই। অনেক প্রজন্ম পর দুর্বল বা আনফিট কপিগুলো বিলুপ্ত হয়ে শুধু টিকে থাকবে ফিট কপিগুলো। প্রতিটি র‍্যানডম মিউটেশন এর মধ্যে ভালোগুলো বা কাজেরগুলো টিকে যায় এভাবে। একেই ন্যাচারাল সিলেকশন বলে।
অবশ্যই সেক্স বা লিঙ্গ আসারও মূল কারণ তাহলে এটা।

কোনো জীব অ্যাসেক্সুয়াল ভাবে নিজের কপি তৈরি করে সিম্পলি। কোনো ঝামেলা নাই। কপি নিশ্চিত ভাবে তৈরি হবেই। তাহলে সেক্সের দরকারটা কী?
প্রথমত সেক্সের মাধ্যমে ডাইভারসিটি তৈরি হয়। ধরুন, জগা একটা দ্বীপ কিনে সেখানে বাড়ি বানালো, নিজস্ব দ্বীপ, একাই থাকবে। জগা একটা অ্যাসেক্সুয়াল প্রানী, জগা ফিট, সবল। পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য একদম উপযুক্ত। জগা তার দ্বীপে গিয়ে নিজেকে রেপ্লিকেট করা শুরু করলো, বিন্দুমাত্র ডাইভারসিটি বা বৈচিত্র্য নাই। জগাময় দ্বীপ। কিছু বছর পর দেখা গেল, দ্বীপে শুধু এক টাইপেরই প্রানী, সবই জগা। সবার বৈশিষ্ট্য এক, কোনো জিনিসে সবাই ভালো, আবার কোনো জিনিসে সবাই খারাপ। কোনো জিনিসে সবার সবলতা, আবার কোনো নির্দিষ্ট জিনিসে সবারই দুর্বলতা। কোনো রোগ জগার কোনো বংশধরকেই কিছু করতে পারবেনা, আবার কোনো রোগ জগার সব কপিকেই মেরে ফেলবে। জগা নামক সেই প্রানীটির কি ভবিষ্যৎ নিশ্চিত? না, যে প্রতিকূল পরিবেশ বা রোগ জগা সহ্য করতে পারে না, তা তার কোন কপিই সহ্য করতে পারে না। সেই অবস্থায় সবগুলো জগাই মারা যাবে। সুতরাং এভাবে হবে না, জগার অন্য কোনো পদ্ধতি দরকার।
এজন্যই আসে যৌন জনন বা সেক্স। যাতে দুইটি জীবের জিন বা বৈশিষ্ট্য মিক্সড হয়ে নতুন প্রজন্ম তৈরি হয়। প্রতিটি কপি ইউনিক হয়। প্রতিটি কপি সামান্য হলেও একে অন্যের চেয়ে আলাদা। প্রত্যেকের সবলতা আর দুর্বলতা আলাদা। একই কারণে সবাই একসাথে মরবে না। অর্থাৎ ভবিষ্যতে প্রজাতি টিকে যাবে এটা নিশ্চিত। আমরা একটা কারণ পেলাম, যে জন্য সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন অ্যাসেক্সুয়ালের চেয়ে ভালো। জগার প্রজাতি টিকে গেল।

দ্বিতীয়ত, পৃথিবী পরিবর্তনশীল। নতুন পরিবেশের সাথে দ্রুত প্রতিটি জীবের নতুন প্রজন্মকে মানিয়ে নিতে হয়। মানিয়ে নিতে প্রয়োজন হয় মিউটেশন। সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনে মিউটেশন হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। ভিন্ন ভিন্ন জিন এসে বাচ্চা হয় বলে, বাচ্চাগুলো বিভিন্ন রকম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। এভাবে দ্রুত মিউটেশন হয়, দ্রুত মিউটেটেড জীব আসে। অন্যদিকে অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনে শুধু সরাসরি কপি হয়, মিউটেশন এত বেশি পরিমাণে হয় না।

কিন্তু এসবের জন্য তো ভিন্ন লিঙ্গের দরকারই নাই। শুধু ফিমেল হলেই তো চলত। মেল আসার কারন সুনির্দিষ্ট ভাবে জানা যায় নাই। ন্যাচারাল সিলেকশন দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়।
মেল-ফিমেইল আসার কারনে সঙ্গী বাছাইয়ে প্রতিযোগীতা আসে। বিপরীত লিংগের সবচেয়ে যোগ্য বা সবচেয়ে ফিট জীবেরা প্রজননের সুযোগ পায়, ফলে পরবর্তী প্রজন্মে আসে ফিট/যোগ্য বাচ্চারা, আনফিট, দুর্বলরা না।

এটাই লিঙ্গের প্রয়োজনীয়তা। ন্যাচারাল সিলেকশনে টিকে গেল লিঙ্গ।

ফসিলের ভাষা ও অশুদ্ধ পাঠ

মনিফ শাহ চৌধুরী

"Scientists have egos, and scientists like to name dinosaurs." - Jack Horner. (Paleontologist)

১.

সাদা সঙ্গহীন একলা সুয্যিমশাই চোখ রাঙিয়ে তার প্রকট দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে ভুট্টোদানার মতো ছড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর ওপর। পাথুরে মাটির ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে গড়িয়ে যাচ্ছে শুকনো আগাছার বল। ঘর্মাক্ত শরীর থেকে বিন্দু বিন্দু জল তাদের হাতে থাকা বিভিন্ন আকৃতির ব্রাশ দিয়েও চুইয়ে পড়ছে।

ডক্টর এজিও আজ বেজায় খুশি। তার দলবল মিলে নিউ মেক্সিকোর এই প্রত্যন্ত উপত্যকায় এক ডাইনোসরের ফসিল আবিষ্কার করেছেন। এমন ডাইনোসর আগে তালিকাভুক্ত কেউ করেনি। অর্থাৎ, এটার নামকরণ তিনিই করতে পারবেন। এজিওসরাস নামটা খারাপ শোনায় না...। তার মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল।

২.

জীবাশ্ম। কয়েক কোটি বছর আগেকার প্রাণের শেষ চিহ্নগুলো নিজেদের মেলে রেখেছে খোলা বইয়ের মতো , যেন আকুতি জানাচ্ছে, "এসো, দেখ আমাদের, পড় আমাদের, জেনে নাও পৃথিবীর গর্ভে শুরুর প্রজন্ম কারা ছিল।"

কোনো বই পড়তে হলে সেই বইয়ের ভাষা জানতে হয়। জীবাশ্মেরও তেমন ভাষা রয়েছে। কোন হাড়ের মালিকের আকার কত বড় ছিল, তারা কত বছর আগে পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াত , বা তাদের নিত্য ভোজন কী ছিল সেগুলো নিয়ে গবেষণা করে জীবাশ্মের ভাষার মর্মোদ্ধার করাই হলো একজন জীবাশ্মবিদ বা Paleontologist এর কাজ। কিন্তু কোটি বছর আগের পৃথিবী যে লেখনীতে হাতছানি দেয়, তার ভাষানুবাদ করতে কি কোনো বিপত্তি বাধেনি?

কোনো জীবাশ্ম পাওয়া গেলে সবার আগে যা করা হয় তা হলো সেটাকে শ্রেনিভুক্ত করা। ডাইনোসরের ফসিলের ব্যাপারেও একই কথা। যেহেতু একটা ফসিলে কোনো ডিএনএ বা জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল অক্ষত থাকে না, তাই তাদের তালিকাভুক্ত করার সময় Morphological বা অঙ্গসংস্থানসংক্রান্ত বিষয়গুলোর দিকেই নজর দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ভুল হবার সম্ভাবনা অনেক। যেমন, Brachiosaurus, Barosaurus আর Giraffatitanদের ফসিল এর মাঝে পার্থক্য করা সহজ হবে না যদি না কেউ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেন। এদের সবারই বিশাল সাইজ, সবারই লম্বা গলা এবং লেজ রয়েছে। এক দেখায় যে কেউ এগুলোকে একই প্রজাতির ডাইনোসর ভাবতে পারেন। আবার উল্টোটাও সত্য। সেটা নিয়েই আজকের লেখায় আলোচনা হবে।

১৮২০ সালে প্রথম ডাইনোসর ফসিল পাওয়ার পর বিশ্বজুড়ে তুলকালাম পড়ে যায়। সবারই একটা করে ডাইনোসর চাই তখন। যার ফলে যে যখন যেখানে ডাইনোসরের জীবাশ্ম পেয়েছেন সেটার মাঝে ন্যূনতম অঙ্গসংস্থানসংক্রান্ত পার্থক্য দেখলেই সেটাকে ভিন্ন প্রজাতি হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করেছেন, এবং অবশ্যই ইচ্ছেমতো নামকরণ করেছেন। শুধুমাত্র ১৮৭০ থেকে ১৮৯০ এর মাঝেই বছরে প্রায় ১৫ টা করে নতুন ডাইনোসর প্রজাতির নামকরণ করা হয়েছিল। এর নেপথ্যে ছিল দুই শত্রু Edwin Cope ও Othniel Marsh যাদের কাজই ছিল মিউজিয়ামের জন্য জীবাশ্ম সংগ্রহ করা। উত্তর আমেরিকার সেই সময়কাল ইতিহাসে পরিচিত বোন ওয়্যারস বা দ্যা গ্রেট ডাইনোসর রাশ নামে।

এই সময়ে বিজ্ঞানীরা বা জীবাশ্মবিদগণ খ্যাতির লোভে অনেকটা তাড়াহুড়ো করেই সেগুলোর নামকরণ করেছিলেন। যৎসামান্য পার্থক্য থাকলেই চলত, যেমন হয়তো খুলির ক্রেনিয়ামে থাকা ফুটা একটা জীবাশ্মে আছে আরেকটায় নেই। ব্যস! আর কোনো বাছ-বিচার নেই, এটার নতুন নামকরণ হয়ে গেল। মিডিয়া প্রেসার এখানে আরো গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ অবশ্যই কেউই শুনতে চাইবে না যে আপনি পুরোনো কোনো ডাইনোসরের আরেকটা জীবাশ্ম খুঁজে পেয়েছেন। বরং মানুষের আগ্রহ তুঙ্গে রইবে যদি আপনি বলেন নতুন প্রজাতির ডাইনোসরের জীবাশ্ম খুঁজে পাওয়া গেছে!
অবশ্যই, এগুলো ছাড়াও বিজ্ঞানীদের যারা স্পন্সর করতেন বা ফান্ডিং করতেন তারাও তাদের চাপে রাখতেন নতুন প্রজাতির জীবাশ্ম বের করার জন্য। সবকিছু মিলিয়ে এবং অবশ্যই খ্যাতির লোভে তখনকার বিজ্ঞানীরা অনেক ভুল নামকরণ করেছেন।
কারণ, বিজ্ঞানীদের অহংকার থাকে, এবং তারা ডাইনোসরদের নামকরণ করতে পছন্দ করেন।

বোন ওয়্যারের সূত্র ধরেই এই নতুন প্রজাতির ডাইনোসরদের ফসিল খুঁজে পাওয়ার সর্বোচ্চ হার গিয়ে পৌঁছে ১৯২০ সালে যখন বছরে ৩০টি নতুন ডাইনোসর প্রজাতির নামকরণ করা হয়েছিল।
নিচে ছবিতে গ্রাফ যোগ করে দেব।

এরপর দুই দুটো বিশ্বযুদ্ধ জীবাশ্ম খোঁজা প্রায় থামিয়েই দেয় বলা চলে। যুদ্ধ শেষ হলে আবারও ১৯৬০ সাল থেকে নতুন প্রজাতির নামকরণ শুরু হয়। তবে, এবার নামকরণের ক্ষেত্রে আরেকটু কঠোর হন বিজ্ঞানীরা।
এবার তারা স্রেফ একটা জীবাশ্ম পেয়েই এটার নাম কী দেয়া যায় সেটা নিয়ে বাকবিতণ্ডা শুরু করে দেন না। বরং তারা নতুন প্রজাতি নামকরণের জন্য সেই প্রজাতির পূর্ণাঙ্গ জীবাশ্ম পাওয়ার অপেক্ষা করেন। এরপর সেগুলোকে অন্য জীবাশ্মদের সাথে মিলিয়ে দেখেন এবং ক্ষুদ্র পার্থক্যগুলো কতটুকু হলে সেটাকে আলাদা প্রজাতি ভাবা যাবে বা যাবে না সে বিষয়ে মোটা দাগ এঁকে দেন। তারা বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে দাবি করতে পারেন যে পূর্বের তুলনায় তাদের নামকরণের প্রক্রিয়া আরো নির্ভুল হয়েছে। এবং অবশ্যই অনেক ডাইনোসর, যেগুলোকে আলাদা প্রজাতি ভাবা হয়েছিল, তাদের নাম কেটে দেয়া হয়।

৩.

বিজ্ঞানী এজিও আজ পার্টি দিয়েছেন। হালকা মদ্যপান করেছেন। আন্তর্জাতিক জীবাশ্মবিদদের অনেকে উপস্থিত, সাথে তার প্রজেক্ট ফান্ড করা মিউজিয়ামের ডিরেক্টরও আসার কথা।

"আমার ভাইয়েরা ও শ্রদ্ধেয় কলিগবৃন্দ, আজ আপনারা সবাই আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন বলে আমি আপ্লুত। যদিও নতুন ডাইনোসর নামকরণ করতে পারাটা খুব বড় বিষয় নয় তারপরেও আপনাদের সাথে এই খুশিটা ভাগ করে নিতে পেরে আমি সম্মানিত।"

হলরুম করতালিতে মেতে উঠল। সবাই ডক্টর এজিওর উদ্দেশ্যে ওয়াইন গ্লাস উপরে ওঠালেন।
ডক্টর এজিও আরো কিছু বলতেন কিন্তু এরই মাঝে হলরুমে ছুটে আসলেন ডক্টর ডডসন, হাতে কিছু কাগজপত্র ধরে রেখেছেন। চেহারা দেখেই বুঝা যাচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু। ঠিক কী কারণে ডক্টর এজিও লোকটাকে পছন্দ করেন না।

"ডক্টর এজিও, আমার মনে হয় আমাদের এত জলদি করা উচিত নয় নামকরণের ক্ষেত্রে। আমার স্টাডি পেপারগুলো খেয়াল করেন। ডাইনোসররা আসলে সরীসৃপদের মত বড় হয় না, বরং তাদের ontogeny বা ছোট থেকে বড় হওয়ার স্টেজগুলো পাখির সাথে মেলে বেশি।"

ভ্রু কুঁচকে তাকালেন ডক্টর এজিও। "আপনি কী বলতে চাচ্ছেন ডডসন? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

হলরুমের অধিকাংশই জীবাশ্মবিদ। তারা দুইজনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গেলেন। সবার মাঝে মদের নেশা উবে গিয়ে জানার নেশা আবার চেপে বসেছে। হাজার হোক, বিজ্ঞানী তো!

"ডক্টর এজিও, একটু খেয়াল করেন। আমরা জানি বাচ্চা পাখির সাথে বড় পাখির মরফোলজিকাল অনেক পার্থক্য আছে। উদাহরণ হিসেবে Cassowary পাখির কথাই ধরুন। এদের মাথার খুলি উঁচু হয়ে একটা মুকুটের আকৃতি নেয়। এটা তাদের অ্যাডাল্ট স্টেজে দেখা যায়। কিন্তু তাদের বাচ্চাদের মাঝে এমনকি তাদের জুভেনাইলদের মাঝেও এটা দেখা যায় না। তাদের এই allometric cranial ontogeny বা খুলির আপেক্ষিক বেড়ে ওঠার পার্থক্য কিন্তু শুরু হয় জুভেনাইল স্টেজের শেষ পর্যায়ে। অর্থাৎ তখন পাখিটা ইতিমধ্যে ৮০% অ্যাডাল্ট সাইজ হয়ে গেছে। কিন্তু তখনও এটার খুলি নেই। এখন যদি আপনাকে এটার কঙ্কাল দেয়া হয় আপনি অ্যাডাল্টের সাথে মিলিয়ে বলবেন দুটো আলাদা প্রজাতি। এই ভুলটাই আমরা করে এসেছি ডাইনোসরদের নামকরণের ক্ষেত্রে।"

সারা হলে ফিসফিস শুরু হয়ে গেল। ডক্টর ডডসন অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষক, তিনি ফেলনা কথা নিশ্চয়ই বলবেন না।

"এখন আমরা একটা ডাইনোসরের কথা বলি। Hypacrosaurus প্রজাতির ডাইনোসরের বাচ্চা নাকি আপনারা খুঁজে পাননি? আপনারা এমন মতামত দিয়েছেন কারণ আপনারা আশা করছিলেন এদের বাচ্চা এদের মতই দেখতে হবে, শুধু সাইজে ছোট। পুরো উত্তর আমেরিকার মিউজিয়ামগুলোতে আমি কোথাও ছোট সাইজের কোনো ডাইনোসর জীবাশ্মের নমুনা দেখলাম না। মিউজিয়াম সেগুলো সংগ্রহ করে না। কী চমৎকার! কিন্তু শখের বশে সংগ্রহ করে এমন মানুষদের থেকে কিছু ছোট সাইজের জীবাশ্ম সংগ্রহ করি আমি যেগুলো দেখতে মোটেই Hypacrosaurus এর খুলির মত না।
কিন্তু সেগুলোকে আমি পাশাপাশি রাখি। অ্যাডাল্ট Hypacrosaurus এর থেকে যেই খুলি ৫০% ছোট সেটা দেখেন, আর যেটা ৮০% সাইজ সেটা দেখেন।
ছোটগুলোর সামনের ঠোটের মত আকৃতিটা সমান। কিন্তু ৮০% টায় সেটা অল্প বাঁকা হওয়া শুরু করেছে এবং অবশ্যই আমাদের কাছে যে অ্যাডাল্ট Hypacrosaurus এর খুলি আছে সেটায় এটা পুরোটাই বাঁকানো। দিস ইজ পিওর ontogeny! একদম cassowary-র মত। অর্থাৎ খুলিতে তেমন মিল না পেয়ে আপনারা যেমন সেগুলোকে আলাদা করে ক্লাসিফাই করেছিলেন সেগুলো সবই আসলে Hypacrosaurus এর বাচ্চা ও জুভেনাইল রূপ! এর অর্থ কি বুঝতে পারলেন ডক্টর এজিও? আপনি আজ যে ডাইনোসরের জীবাশ্ম খুজে পেয়েছেন সেটা নতুন কোনো প্রজাতির নয়, বরং একটা জুভেনাইল ডাইনোসর। আমাদের পুরো তালিকাগুলো আবার নতুন করে সাজাতে হবে!"

এটুকু বলে থামতেই পুরো হলরুমে পিনপতন নিরবতা নেমে এল। এমনকি ডক্টর এজিও বাদে আর কারো শ্বাস প্রশ্বাসেরও আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। ডক্টর এজিও সেদিন কিছু না বলে হল থেকে প্রস্থান করেন।

ডক্টর ডডসন এরপর তার স্টাডি জার্নাল পেপারে প্রকাশ করেন। আপনি যদি ভেবে থাকেন যে
এর পর পরই বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানীমহল ডাইনোসরের তালিকা নতুন করে সাজানো শুরু করে দিয়েছিল বা ডক্টর ডডসনের স্টাডি নিয়ে আরো রিসার্চ করেছিল তাহলে আপনি ভুল ভাবছেন।
ডক্টর এজিও তার ক্ষমতাবলে বিষয়টা চেপে যাওয়ার চেষ্টা করলে এবং এ বিষয়ে আগামী অন্তত কয়েক দশক কোনো গবেষণা হয়নি।

কারণ বিজ্ঞানীদের অহংকার থাকে, আর তারা ডাইনোসরের নামকরণ করতে পছন্দ করেন।

৪.

বিশিষ্ট জীবাশ্মবিদ জ্যাক হর্নার, যিনি মাত্র আট বছর বয়সে থাকতে তার প্রথম জীবাশ্ম খুঁজে পান, শেষতক ডডসনের গবেষণা আরেকটু এগিয়ে নিতে সফল হন।
অধিকাংশ জীবাশ্মবিদদের সবচেয়ে বড় যেই বাধা ছিল তা হচ্ছে জীবাশ্মের ওপর ইচ্ছেমতো কাটাছেঁড়া না করতে পারা। কারণ সব ভালো, বড় জীবাশ্মগুলো বিভিন্ন মিউজিয়ামে কুক্ষিগত করে রাখা আর তারা অবশ্যই এটা পছন্দ করে না যখন আপনি তাদের কাছ থেকে জীবাশ্ম ধার চান কাটাছেঁড়া করার জন্য।

জ্যাক হর্নারের নিজেরই একটা ছোট-খাটো মিউজিয়াম আছে। ফলে তিনি তার ইচ্ছে মতো জীবাশ্মের ওপর পরীক্ষা চালাতে পারতেন। তিনি যেটা করলেন সেটা হল ডাইনোসরদের পা, খুলি কেটে সেগুলো স্ক্যান করিয়ে তাদের হাড়ের ভেতরের গঠনের ছবি সংগ্রহ করলেন। হাড়ের গঠনের ব্যাপারে গুরুত্ব কেন? কারণ একটা বাচ্চার হাড়ের সাথে একটা অ্যাডাল্টের হাড়ে অনেক পার্থক্য থাকে। একটা বাচ্চা তখনও তার বাড়ন্ত বয়সে থাকে। অর্থাৎ তার হাড়ের কোষগুলো খুব দ্রুত বাড়তে থাকে সংখ্যা যা একটা প্যাটার্ন তৈরি করে। যত বড় হতে থাকে বাচ্চাটা তত এই নতুন কোষ তৈরি হওয়ার হার কমতে থাকে যেটা প্যাটার্নে স্পষ্ট বোঝা যায়। এর হার সবচেয়ে কম থাকে অ্যাডাল্টের মাঝে।

তো তিনি যেটা করলেন, Dracorex, Stygimoloch ও Pachycephalosaurus নামের তিনটি ডাইনোসরের জীবাশ্ম সংগ্রহ করলেন ও এগুলোর খুলি কেটে হাড়ের স্ক্যান করিয়ে ফেললেন। এদের তিনজনের মাঝে মিল থাকলেও তাদের মাথার খুলির আকৃতি আলাদা।

সবচেয়ে ছোট যেই খুলি, Dracorex, সেটার স্ক্যানে তিনি দেখালেন যে এটার মাঝে স্পঞ্জি গঠন বেশি যার অর্থ হাড় অনেক তাড়াতাড়ি বড় হচ্ছিল। অর্থাৎ এটা একটা বাচ্চা ডাইনোসর ছিল।

মাঝারি সাইজের খুলি যেটার, Stygimoloch, সেটার স্ক্যানের স্পঞ্জের মত গঠন ছিল তবে অল্প এবং এটার খুলি ওপর থেকে অল্প একটু গোলাকার ছিল। হাড়ের গঠন থেকে বলা যায় এটা জুভেনাইল ডাইনোসর।

সবচেয়ে বড় খুলি যেটার, Pachycephalosaurus, সেটার স্ক্যানে দেখা গেল এটা বেশ কঠিন গঠনের, তেমন স্পঞ্জের মত গঠন নেই। অর্থাৎ এটা অ্যাডাল্ট ডাইনোসর। আর এটার খুলি ওপরে অংশে গোলাকার।

নিচে ছবি সংযুক্ত করব। বুঝতে সুবিধা হবে।

ডক্টর হর্নার প্রমাণ করলেন এই তিনটে ডাইনোসর আসলে একই প্রজাতির ছোট, বড় ও জুভেনাইল ডাইনোসর। এভাবেই এই তালিকা থেকে দুটো বাদ দেওয়া হলো।

এভাবে তিনি আরো ডাইনোসরের জীবাশ্ম পরীক্ষা করে তালিকা আরো ছোট করে দেন। এবং ডাইনোসর নামকরণের ক্ষেত্রে ত্রুটি অনেকটাই কমিয়ে আনেন।

৫.

বিজ্ঞান হওয়া উচিৎ একটা নিরপেক্ষ বিষয়। কিন্তু অবশ্যই বিজ্ঞানীরাও মানুষ এবং মানুষ নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হিমশিম খেতে পারে। অবশ্যই মানুষ খ্যাতি পিপাসু হতে পারে, অর্থলোভী হতে পারে, বদ্ধ সংস্কারী হতে পারে। এগুলো অবশ্যই বিজ্ঞানের সামনে এগিয়ে চলার জন্য হোঁচটের ন্যায়। সেদিন ডক্টর ডডসনের কথা সবাই গুরুত্ব সহকারে নিলে জীবাশ্মপাঠের ক্ষেত্রে আমরা আজ আরো এগিয়ে থাকতাম। তবে এসব ছোট-খাটো বাধা বিপত্তি সাথে নিয়েই বিজ্ঞানকে এগিয়ে চলতে হবে এবং মাঝে মাঝে তার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য বিজ্ঞান টি-রেক্সের মত গর্জনও করবে।

রেফারেন্স

জ্যোতির্বিজ্ঞান

ব্যাঙাচি
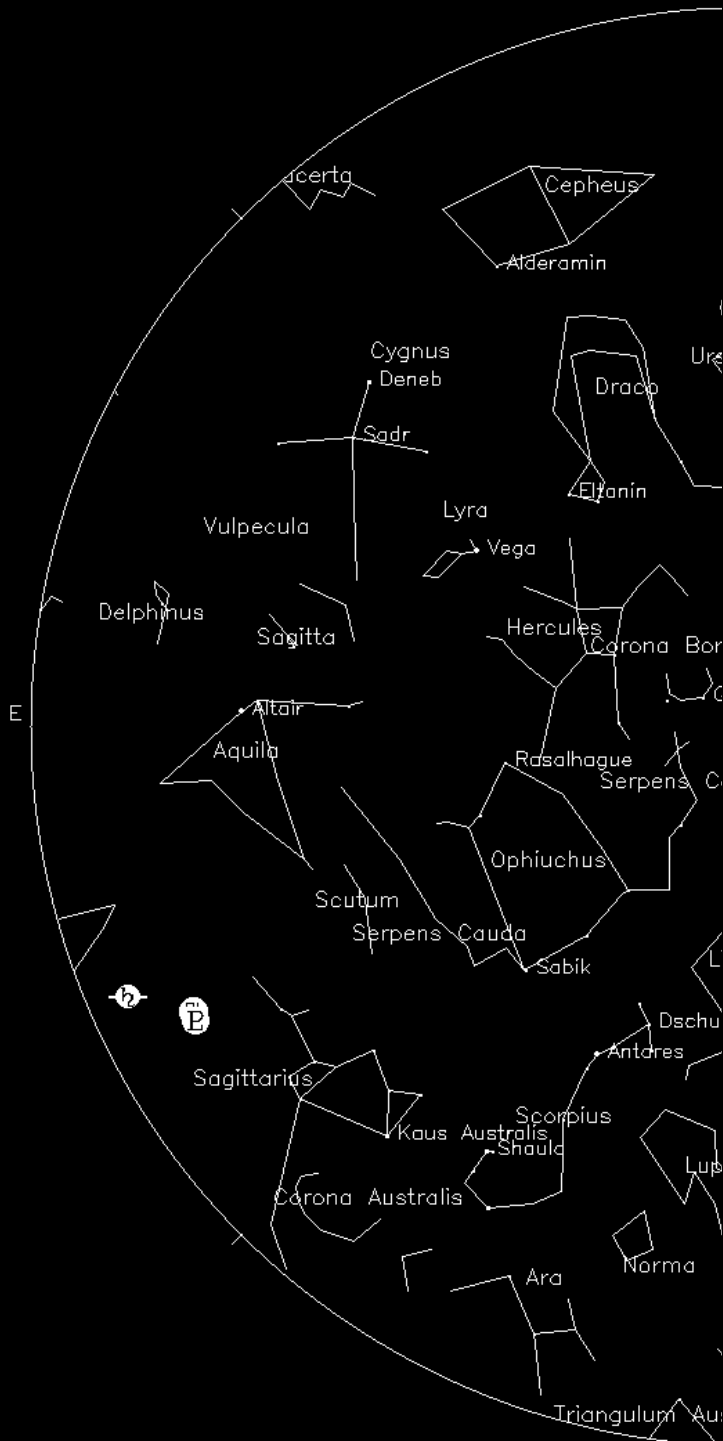
নিশীথ আকাশের দিন-পুস্ত

হৃদয় হক

(জুনের শেষ ও জুলাই মাসের প্রথম দিকের রাতের আকাশ।
বি.দ্র: দিন যত এগোবে, একই সময়ে উক্ত তারাসমূহ ততই পশ্চিমে নেমে পড়বে। আস্তে আস্তে কিছু মণ্ডল অস্ত যাবে, নতুন মণ্ডল উদিত হবে।)

২৮/০৬/২০২০
পর্যবেক্ষণ কাল : রাত প্রায় ৮টা ৬৫মি. হতে প্রায় ৮টা ৪০ মি.।
অবস্থান: খতিবেরহাট, বহদ্দারহাট, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

দুপুর থেকেই বিদ্যুৎ নেই। দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত। তবুও বিদ্যুতের দেখা নেই। পড়ার টেবিলের পাশেই জানালা। সন্ধ্যের পর সাধারণত বন্ধ থাকে, মশার জন্যে। তবে আজ বিদ্যুৎ নেই, গরমে শরীর হতে যেন ঘামের বন্যা বইছে। মশার কয়েল জ্বালিয়ে কিচ্ছুক্ষণ বাদে জানালা খুলাললাম । আহ! কি ফুরফুরে বাতাস। জানালার ওপাশে নারিকেল গাছ। মাথা আগিয়ে গাছের পাতার ফাঁকে দেখি দু-তিনটা তারা, অন্যদিকে চাঁদ। বিদ্যুত নেই, আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার, অর্ধ চাঁদ আলো ছড়াচ্ছে। রাত আনুমানিক আটটা বেজে পনেরো মিনিট, ঘর ছেড়ে ছাদে যাচ্ছি।

ছাদের দরজা খুলতেই প্রথমে চোখ যায় সেসময়ের সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, বৃহস্পতি গ্রহে। দক্ষিণ-পূর্ব হতে তুলনামূলক বেশ পূর্বের সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তার পিছেই শনি। তারপর চোখ যায় সোজা দক্ষিণে। সেথায় পাশাপাশি দুটি তারা দুচোখে ধরা দেয়। বাম পাশেরটার নাম 'জয়' (Rigil Kent) ডানেরটা 'বিজয়' (Hadar), এ দুয়ের উপরে তুলনামূলক হালকা ডান দিকের তারাগুলো নিয়ে নিয়ে গঠিত 'সেন্টরাস মণ্ডল', হিন্দু জ্যোতিষে 'মহিষাসুর'। 'জয়' হল সমগ্র আকাশ পটের তৃতীয় উজ্জ্বল তারা। এর নিচে একটু বামেই প্রক্সিমা সেন্টরির অবস্থান। প্রক্সিমা মানেই নিকটতম, এটি আমাদের সূর্যের পর সবচেয়ে নিকটবর্তী তারা। তবে খালি চোখে একে দেখা অসম্ভব। জয়ের উপরে এবং তুলনামূলক বামের তারাগুলো নিয়ে হল 'শার্দূল মণ্ডল', ইংরেজিতে 'লুপাস'। লুপাস হলো নেকড়ে, সেন্টরাস হল অর্ধ মানব - অর্ধ ঘোড়া। ঘোড়ার শরীরের উপর মানুষের মাথা। সে যেন তার হাতে থাকা বল্লম দিয়ে নেকড়েটাকে বিদ্ধ করে আছে। যেন বলি দিচ্ছে, আরা[1]'র কাছে।

এরপর চোখ গেল বিশাল এক বিছার নিকট, বৃশ্চিক রাশি[2]। লুপাসের উপরে বামদিকে পরপর তিনটে তারা, প্রায় একই সরলরেখায়। আবার এই তিন তারার পেছনেই একটা লাল রঙের তারা, এর নিচে আরেকটি তারাসহ কিছু তারা নিয়ে একটা গুটানো লেজ কল্পনা করা যায়। আসলে এটা লেজ না, হুল, বিছার হুল। এ মণ্ডল এতোই সুন্দর এবং স্পষ্ট যে আপনাকে বিশেষ ভাবে চিনিয়ে দিতে হবে না, দেখলেই বুঝতে পারবেন। লাল তারাটি রাতের আকাশে উজ্জ্বলতার দিক থেকে সপ্তম। ইংরেজিতে এর নাম 'Antares' বাংলায় জ্যেষ্ঠা বা পারিজাত। বাংলার জ্যৈষ্ঠ মাসের নাম রাখা হয়েছে এই জ্যেষ্ঠা তারা থেকে।

উক্ত তিন তারার ডানে কিছু তারা দিয়ে একটা সামান্তরিক কল্পনা করা যায়, তা দিয়েই তৈরি তুলা রাশি। সামান্তরিকের নিচের রেখার শেষ বিন্দু একটা লাল তারা অন্যদিকের শেষ বিন্দু একটা নীল তারা, ইংরেজিতে এর নাম 'Zubenelgenubi', বাংলায় বিশাখা, এ তারার অনুসারে বাংলা সালের প্রথম মাসের নাম বৈশাখ।

আবার উক্ত তিন তারার বামে উপরে বেশ দূরত্বের কিছু তারা দিয়ে একটা ষড়ভুজ কল্পনা করা যেতে পারে, এর নাম 'Ophiuchus', বাংলায় স্বর্পধারী। তার বাম পাশেই রয়েছে স্বর্প মণ্ডল (Serpens), সেখানে খুবই কাছাকাছি ৩টি তারা দিয়ে ত্রিভুজ ভাবা যায়, এটা সাপের মাথা, পিছের তারা দিয়ে সাপের লেজ। তুলা রাশির উপরে এটি অবস্থিত।

পূর্বে তাকালে আগেপিছে দুটো তারা দেখা যায়। সামনেরটার উজ্জ্বলতা কম, পিছনেরটার বেশি। পিছনেরটার ডানপাশে একটা মোটামুটি উজ্জ্বলতার তারা, আরো একটু ডানে আরো অনুজ্জ্বল একটি। এই মোটামুটি সরলরেখার বেশ উপরে ও বেশ নিচে দুপাশে দুটি তারা। এই দুটি তারা দুটি ডানা নির্দেশ করে, ঈগল পাখির ডানা। এ তারাগুলো দিয়ে একটা ঈগল কল্পনা করা হয়, এটা 'Aquia' বা ঈগল মণ্ডল।

উত্তর-পূর্বে তাকালাম, সেদিকের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটি হল অভিজিৎ(Vega), আমাদের পরবর্তী ধ্রুবতারা[3]। এই তারার পাশেই চারটি তারা দিয়ে বেশ ছোট একটা সামান্তরিক কল্পনা করা যায়, এসব নিয়েই তৈরি Lyra বা বীণা মণ্ডল। সনাতন ধর্মের প্রায় সকলেরই দেবোর্ষি নারদকে জানার কথা। কোনো কোনো বর্ণনা

মতে তিনিই বীণা যন্ত্রের উদ্ভাবক। তার প্রিয় এই বীণাটিই যেন রাতের আকাশে আমরা দেখি।

অভিজিতের নিচে, উত্তর-পূর্বে পাশাপাশি ভালোই উজ্জ্বল দুটো তারা দেখা যায়। দুটোর মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বলটার নাম 'পুচ্ছ'(Deneb), এই দুই তারা থেকে একটা সরলরেখা টেনে কিছুদূর এগিয়ে গেলে এবং দ্বিতীয় তারাটির দুদিকে কিছু তারা দিয়ে দুটি পাখা কল্পনা করলে একটা বড় বক পাখির দেখা মেলে। এটি আমাদের Cygnus বা বক মণ্ডল।

বক মণ্ডলের বেশ পূর্বে এবং ঈগল মণ্ডলের হালকা বামে এবং উভয় মণ্ডলের বেশ নিচে অনেকটা তারাগুচ্ছের মতো কিছু তারা দেখা যায়। সব তারা প্রায় একই উজ্জ্বলতার, তবে বেশ অনুজ্জ্বল। মোটামুটি চার-পাঁচটি তারা। এ নিয়ে গঠিত হয় ডলফিন মণ্ডল। আসলে একে বাংলায় শ্রবিষ্ঠা বলে, তবে আমি ডলফিন বলবো, ইংরেজিতে ডেলফিনাস। দেখতে অনেকটা আমাদের দুই টাকার ম্যাচবক্সের ডলফিনটার মতো। শহর থেকে একে দেখা বেশ কষ্টের, ভাগ্যিস বিদ্যুৎ ছিলো না!

অভিজিতের উপরে, মোটামুটি মাথায় উপরে চারটা তারা দিয়ে একটা সামান্তরিক কল্পনা করলে ও আশেপাশের কিছু তারা দিয়ে গঠিত মহাবীর হারকিউলিস মণ্ডল। এটি খুব একটা উজ্জ্বল নয়। তবে এর ১২ শ্রমের ঘটনা বেশ মজার।

মাথায় উপরে সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটির নাম 'স্বাতী' (Arcturus)। এ তারার উত্তরে, ডানে দুপাশে দুটি তারা, আরো ডানে তিনটি অনুজ্জ্বল তারা, এই তিন তারা দিয়ে ত্রিভুজ ভাবা যায়। তবে, এসব তারাগুলো দিয়ে একটা ঘুড়ির কল্পনা করা সহজ। এটি বুটিস মণ্ডল।

বুটিস মণ্ডলকে পেলে মাথার উপরেই তবে তার থেকে একটু পূর্বে অর্ধবৃত্তাকারে কয়েকটা তারা বেশ সাজানো দেখা দেয়, আসলে দেখতে অনেকটা গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী বাঁশের বোনা কুলোর মতো। আকৃতি অনেকটা ইংরেজি অক্ষর D-এর মত। আমি কুলো দেখতে পেলেও জ্যোতির্বিদগণ এখানে রত্ন খচিত রাজমুকুট কল্পনা করেন। এর নাম করোনা, ভাইরাস না, বোরেলিস। করোনা মানে ইংরেজিতে Crown বা রাজমুকুট। আর বোরেলিস হলো উত্তর। এ মণ্ডলের বাংলা নাম, উত্তর কিরীট। তবে আমি একে কুলো মণ্ডল বলতে ভালোবাসি। অনেকটা একই দেখতে আকাশ পটে অন্য একটি মণ্ডলের নাম করোনা অস্ট্রেলিস, দক্ষিণ কিরীট, তবে আমার একে সার্থক কুলো মনে হয় না, ভাঙা কুলো।

চোখ গেল দক্ষিণ-পশ্চিমে। আমার প্রিয়তমা কন্যা রাশিতে। তার ইংরেজি নাম Virgo। তবে আজকের চাঁদ সেখানে অবস্থান করেছে। প্রিয়তমা যেন জানতো, আজ আমি আসবো। তাই এতদিন তাকে দেখতে না আসায় সে যেন রেগে আছে, তাই মনে হয় চাঁদের সাথে ষড়যন্ত্র করে আমাকে তার একটুখানি দেখিয়ে বাকিটুকু চাঁদের আলোয় ঢেকে শাস্তি দিচ্ছে। প্রিয়তমার প্রথম তারা স্পাইকা, বাংলায় চিত্রা, বাংলার চৈত্র মাসের নাম এই তারা হতে করা। আমি জানিনা প্রিয়তমার রাগ কবে ভাঙবে, অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত মনে পশ্চিমে তাকালাম।

পশ্চিমে দিগন্তের বেশ উপরে একটি তারা, এর ডানে নিচে দুদিকে দুটি মোট তিনটি তারা দিয়ে একটা ত্রিভুজ ভাবা যায়, আবার উক্ত দুটি তারা থেকে নিচে দুটি সরলরেখা টেনে দুটি তারা পাওয়া যায়। এই দুটির মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বলটার নাম মঘা(Regulus), রাতের আকাশের বিংশতম উজ্জ্বল তারা। এই দুই তারার বামে কিছু তারা দিয়ে বাসায় কাপড় রাখবার হ্যাঙ্গারের মাথার মতো কল্পনা করা যায়। আসলে এটা হ্যাঙ্গারের না, সিংহের মাথা। সব মিলে সিংহ রাশি। কল্পনা করা হয় এখানে একটা সিংহ শিকার ধরবার জন্যে ওত পেতে বসে আছে।

চোখ গেল উত্তর-পশ্চিমে। বেশ উজ্জ্বল ৭টি প্রায় সমান উজ্জ্বলতার তারা দেখা যায়। বুঝতে বেগ পেতে হয় না এরা সপ্তর্ষি মণ্ডলের তারা। ইংরেজিতে 'Ursa Major', বাংলায় আসলে বৃহৎ ভল্লুক বলা উচিত হলেও, সপ্তর্ষি নামে বেশ জনপ্রিয়। ছোটবেলায় গ্রামবাংলায় পরিবার পরিজনদের নিকটে কিংবা স্কুলের পাঠ্যবইতে এর কথা জানা যায়। ৭টি তারা ও এর নিচের কিছু তারা নিয়ে এই মণ্ডল গঠিত।

বাকি থাকে উত্তর দিক। ঠিক উত্তরে দিগন্তের বেশ উপরে আমাদের প্রিয় ধ্রুবতারা। এর উপরে সপ্তর্ষির সেই ৭তারার মতো ঠিক কম উজ্জ্বল কিছু তারা দিয়ে অনেকটা একই আকারের প্যাটার্ন কল্পনা করা যায়। এটি লঘু সপ্তর্ষি বা শিশুমার মণ্ডল, ইংরেজিতে উরসা মাইনর।

লঘু সপ্তর্ষির ধ্রুবতারার উপরে কিছু তারা দিয়ে উটের কুঁজের মতো কল্পনা করা যায়, এই কুঁজের ডানে (পূর্ব দিকে) প্রায় সমান উজ্জ্বলতার দুটি তারা যেন দুটি জ্বলজ্বল চোখ নির্দেশ করে। এটি ড্রাগন মণ্ডল।

যারা আষাঢ় মাসের আকাশ চিনেন তারা বলবেন আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মণ্ডল মিস করেছি, আসলেই করেছি, আকাশের এই অংশটি বেশ সম্পদশালী। দক্ষিণ-পূর্বে বৃশ্চিকের হুলের বামে বেশ কিছু তারা আছে, এদের সবটুকু নিয়ে ধনু রাশি(Sagittarius) গঠিত। এখানে একজন সেন্টর (ঘোড়ার শরীরের উপর মানুষের মাথা) হাতে তীর ধনু নিয়ে যেন বৃশ্চিককে হামলা করছে। তবে আমার এদিকে উঁচু দালান আর কিছু মেঘ থাকায় তাকে আজ ভালো করে দেখতে পারিনি। সে যাইহোক, এই মণ্ডলের দুটি তারার নাম Middle Maus ও Nunki বাংলায় যথাক্রমে পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া। এ দুটি তারা থেকে বাংলায় আষাঢ় মাসের নামকরণ।

আমার পর্যবেক্ষণ শেষ, বিদ্যুৎ এখনও আসেনি। ছাদের পিলারে দাঁড়িয়ে হেলান দিয়ে প্রিয়তমা কন্যা রাশির দিকে চেয়ে আছি। মোবাইলে গান বাজছে, Tal Bachman এর বিখ্যাত গান -

She's blood, flesh, and bone
No tucks or silicone
She's touch, smell, sight, taste, and sound

But somehow I can't believe
That anything should happen
I know where I belong
And nothing's gonna happen
Yeah, yeah

'Cause she's so high
High above me, she's so lovely
She's so high
Like Cleopatra, Joan of Arc, or Aphrodite
Doo, doo, doo, doo, doo
She's so high, high above me

First class and fancy free
She's high society
She's got the best of everything

What could a guy like me
Ever really offer?
She's perfect as she can be
Why should I even bother?

'Cause she's so high
High above me, she's so lovely
She's so high
Like Cleopatra, Joan of Arc, or Aphrodite
Doo, doo, doo, doo, doo
She's so high, high above me

She comes to speak to me
I freeze immediately
'Cause what she says sounds so unreal

'Cause somehow I can't believe
That anything should happen
I know where I belong
And nothing's gonna happen
Yeah, yeah, yeah, yeah

'Cause she's so high
High above me, she's so lovely
She's so high
Like Cleopatra, Joan of Arc, or Aphrodite, oh yeah
She's so high, high above me

শব্দ টীকা:

১. আরা - একটি তারামণ্ডল। পুরাণে এটি বলি দেবার জন্য বিশেষ পূজাবেদি।

২. রাশি - আমাদের সূর্য বছরে ১২ মাসে ১২টি নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থান করে। এই ১২টি মণ্ডলকে রাশি বলা হয়।

৩. অভিজিৎ নক্ষত্র - এখনকার দিনে তারা আর নক্ষত্র একই বিষয়, সমার্থক শব্দ। তবে অতীতে একটু আলাদা ছিল। নক্ষত্র বলতে আকাশের বেশ কিছু তারা নিয়ে একটি নক্ষত্র হতো আর, সেই নক্ষত্রের এক একটি জ্যোতিষ্ক-কে বলা হতো তারা তবে পরবর্তীতে নক্ষত্রকেও তারা বানিয়ে ফেলা হয়, এক্ষেত্রে উক্ত নক্ষত্রের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটিকে নক্ষত্রের নাম দিয়ে দেয়। আজকের অভিজিৎ ছিল এককালে অনেক তারা নিয়ে গঠিত নক্ষত্রের নাম, পরে সেই নক্ষত্রের উজ্জ্বল তারার নাম অভিজিৎ দিয়ে দেয়। যাহোক, ধ্রুবতারা চির ধ্রুব নয়। প্রায় ১২,০০০ বছর পর অভিজিৎ নক্ষত্র ধ্রুবতারা হবে।

তথ্য: জব্বার স্যারের 'তারা পরিচিতি'

Jurassic Park III (2001)

রিভিউয়ার: শুভ সালাউদ্দিন

ডাইনোসরদের দ্বীপে হারিয়ে যাওয়া একটা উদ্ধারের কাহিনী। মেইন প্লট এটুকুই। বাকি সময় ধরে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন আকার আকৃতির ভিন্ন ভিন্ন ডাইনোসরের তাড়া করার দৃশ্য।

ব্যক্তিগতভাবে মুভিটা আমার কাছে তেমন ভালো লাগেনি। রান টাইম দেড় ঘন্টার মতো যেখানে বেশিরভাগ সময়ই ডাইনোসর তাড়া করে, প্লট তেমন স্ট্রং না আর ভিজ্যুয়ালাইজেশনের যে খুব বেশি উন্নতি হয়েছে তাও না। তবে দেখতে অতটাও খারাপ লাগবে না।

মুভিগুলো একটা আরেকটার সাথে পুরোপুরি রিলেটেড না হলেও কিছু জিনিস পূর্বের সাথে রিলেট করা যায়। তাই পরের পর্বে যদি কারও কথা উল্লেখ করা হয়, তাহলে ধারণা করেই নেওয়া যায় আগের পর্বে কে বেঁচে গিয়েছে; এতে স্পয়লার হয়ে যায়। যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি সেরকম কিছু করে মজা নষ্ট না করার, তারপরও একজায়গায় করে ফেলেছি সে কারণে দুঃখিত তবে উপায় ছিল না। না বললে প্লট বোঝা যেত না। তবে এতে দেখার খুব বেশি ক্ষতি হবে না।

হোমো ইরেক্টাস

রঞ্জু খান

হাজার বছর আগের আমাদেরপূর্বপুরুষেরা কেমন ছিল তা জানার আগ্রহ সবারই থাকে, বিবর্তনের পথ ধরে সেই সব পূর্বপুরুষদের আমরা হয়তো পুরোপুরি জানতে পারব না, কিন্ত তাদের সম্পর্কে বিজ্ঞানের বদৌলতে অনেক কিছুই আমরা আবিষ্কার করতে পারি, যেমন ধরুন না হোমো ইরেক্টাসদের কথা, প্রায় ২ মিলিয়ন বছর আমাদের অনেক পূর্বপুরুষের মধ্যে একটি প্রজাতি ছিলেন তারা, আমাদের আজকের মস্তিষ্কের এবং শরীরের গঠন এবং আয়তন অনেকটাই আমরা পেয়েছি এই হোমো ইরেক্টাসদের কাছ থেকে।

হোমো ইরেক্টাস (ইংরেজি ভাষায়: Homo erectus, লাতিন ভাষায় যার অর্থ: "উন্নত মানব") হোমো প্রজাতির একটি বিলুপ্ত প্রজাতি যা আর্কায়িক হোমো স্যাপিয়েন্স-এর পূর্বপুরুষ যে আর্কায়িকরা আবার আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষ। খুব সম্ভবত আফ্রিকাতেই হোমো ইরেক্টাসরা বিবর্তন লাভ করেছিল, আনুমানিক ১৭ লক্ষ বছর পূর্বে এই প্রজাতির সদস্যরা আফ্রিকা , ইউরোপ, দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এ কারণে পৃথিবীর অনেক অঞ্চলে ইরেক্টাসদের ফসিল পাওয়া গেছে। কিছু স্থানে আবার সরাসরি জীবাশ্ম না পাওয়া গেলেও তাদের ব্যবহার্য বিভিন্ন সামগ্রী যেমন, পশুর ভাঙা হাড় এবং পাথরের উপকরণ পাওয়া গেছে।

হোমো ইরেক্টাসের প্রথম ফসিল পাওয়া যায় ১৮৯১ ও ১৮৯২ সালে ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপে ফরাসি বংশোদ্ভূত ওলন্দাজ সামরিক চিকিৎসক "ওজেন দুবোয়া" কর্তৃক। দুবোয়া আসলে মানুষের পূর্বপুরুষদের জীবাশ্ম আবিষ্কারের নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়েই ইন্দোনেশিয়া গিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম আবিষ্কৃত জীবাশ্ম ছিল একটি খুলির ঊর্ধ্বাংশ (স্কাল-ক্যাপ), যা সোলো নদীর তীরে অবস্থিত ত্রিনিল নামক স্থানে পাওয়া যায়। এ কারণে জীবাশ্মটির নাম Trinil 2। এর কয়েক বছর পর একই জায়গা থেকে একটি ফিমার খুঁজে পান। খুলি ও ফিমার থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা দুই পায়ে হাঁটত। তবে প্রথমদিকে তিনি নিশ্চিত হতে পারেননি এরা মানুষ কি না, তাই   নাম দিয়েছিলেন Pithecanthropus erectus.

আমাদের এই দাদার দাদার দাদার দাদা দাদার অনেক আগের দাদুরা কিন্তু কথা বলার জন্য আজকের মতো ভাষা মোটেই জানতেন না, কিন্তু নিজেদের মধ্যে কথা তো বলতে হবে, তাই তারা একধরনের সাংকেতিক ভাষার আদান প্রদান শিখেছিলেন, যাকে বলে প্রোটো ল্যাংগুয়েজ, অবশ্য ২ মিলিয়ন বছর আগের হোমো ইরেক্টাসরা আগুনকে সেইভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি যেভাবে হোমো স্যাপিয়েন্স বা নিয়ান্ডারথালেরা ৬০ হাজার বছর আগে করতে পেরেছিল, ভাষার ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে মানুষের ভাষার ব্যবহারের জন্য যে সব জিনের দরকার হয় যেমনমডার্ন হোমো স্যাপিয়েন্সদের ক্ষেত্রে সেই জিনের নাম FOXP2 জিন, এই জিন আমাদের ভাষার ব্যবহার এবং ভাষার উন্নয়নের জন্য দরকার হয়, সেটা হোমো ইরেক্টাসদের ছিল না, ফলে তারা শুধুই সংকেত ব্যবহার করতে জানত বলে বৈজ্ঞানিকেরা ধারণা করেন।

হোমো ইরেক্টাসরাই মূলত প্রাচীন প্রজাতির একটি যাদের আধুনিক মানুষের সাথে অনেক মিল ছিল, যেমন সোজা হয়ে হাঁটার সক্ষমতা , (bipedality) তার মধ্যে অন্যতম, হোমো ইরেক্টাসদের বেশিরভাগ ছিল যাযাবর প্রকৃতির, প্রথম আফ্রিকা ছেড়ে ইউরো-এশিয়ায় যাত্রা করে এই প্রজাতি। তারা হাতিয়ারব্যবহার করতে জানত এবং ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এরাই পাথর দিয়ে সুচারু হাতিয়ার তৈরি করে বলে বৈজ্ঞানিকরা দাবি করেন, আজ থেকে প্রায় ১.৭ মিলিয়ন বছর আগের ফসিল রেকর্ড থেকে যাচাই-বাছাই করে , ওরাহাতল সহ পাথরের কুঠার ব্যবহারের ব্যবহার করতে পারত।

হোমো ইরেক্টাসেরা আসলেই বৈচিত্র্যময় ছিল, এরা যে শুধু যাযাবর ছিল তা না , নিয়মিত স্থায়ী ভাবে বসবাসও করত এদের মধ্যে অনেকেই,এর কারণ এদের এই প্রজাতিটি অনেকটাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল পৃথিবীব্যাপী, যা কিনা কেনিয়ার লেক টুরকানা বেসিনের পাওয়া ২ মিলিয়ন বছর আগেরফসিলেরমাধ্যমে জানা যায়,প্লাইস্টোসিন যুগের শেষ পর্যন্ত হোমোইরেক্টাসদের জনসংখ্যা অব্যাহত ছিল।
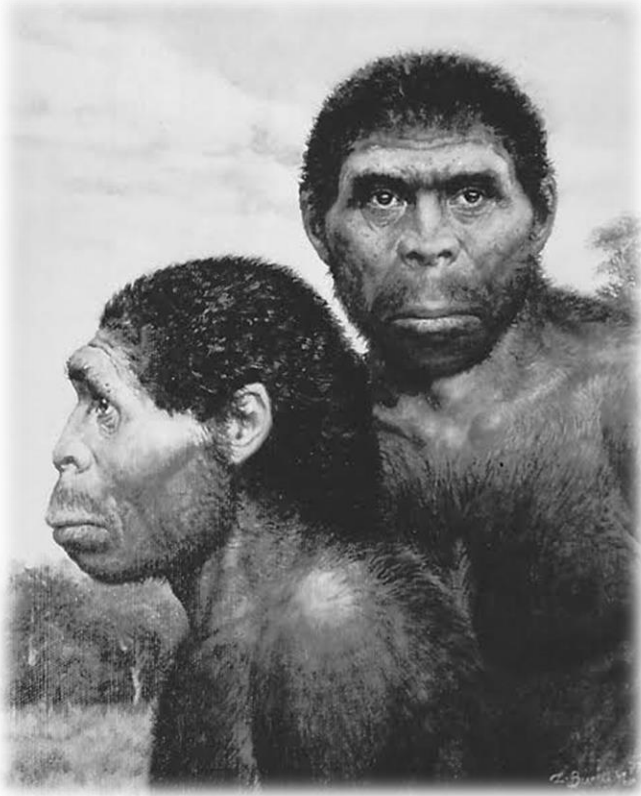
ইন্দোনেশিয়ার জাভায় এবং চায়নাতে এদের ফসিলের যথাক্রমে নাম করা হয় জাভাম্যান এবং পিকিংম্যান নামে, সম্প্রতি হোমিনিন গোত্রের ইরেক্টাসদের থাকার আরো কিছু প্রমাণ মিলেছে চায়নাতে, এসব ফসিলের বয়স আনুমানিক ২.৬ মিলিয়ন বছর, যারা কি না এশিয়ায় প্রায় ৪ মিলিয়ন বছর ধরে বসবাস করত।

আগেই বলেছি হোমো ইরেক্টাসরা দেখতে কেমন ছিল,তারাই প্রথম প্রজাতি যারা দেখতে আমাদের কাছাকাছি ছিল, লম্বা, এবং তাদের মগজ ও বড় ছিল তাদের আগের হোমিনিন প্রজাতি অস্ট্রালোপিথেকাস বা হোমো হ্যাবিলিসদের চাইতে, লম্বা পা তাদেরকে দাঁড়িয়ে হাঁটতে সাহায্য করেছিল, তাদের চেহারা আমাদের চাইতেও চাপা ছিল।

হোমো ইরেক্টাসদের আরেকটি গুণ ছিল, এরা ছিল্যা (scavenger), মানে অন্য প্রাণী শিকার করে খেয়ে ফেলে গেলে তারা সেই প্রাণীর অবশিষ্ট হাড়--গোড় থেকে bone marrow বের করে খাওয়া শিখেছিল, যেহেতু এরা পাথরের হাতিয়ার বানাতে জানত, সেই পাথরের সরু হাতিয়ার তৈরি করে এরা অন্য প্রাণীর ফেলে যাওয়া অংশ খেতেজানত, যেমন আজকের হায়েনারা করে। যদিও তারা মূলত মাংসাশী ছিল, তবে তৃণভোজী ছিল কি না তা নিয়েও অনেক হাইপোথিসিস আছে।

ইরেক্টাসরা বুদ্ধিমান ছিল তাদের আগের হোমিনিনদের থেকে, আগুন জ্বালানো, পাথর থেকে হাতিয়ার তৈরি এবং দলবদ্ধভাবে শিকার করাতাদেরকে আলাদা করেছিল তাদের পূর্ববর্তী প্রজাতি থেকে।

কিন্তু ভাষার ব্যবহারে তারা খুব সীমিত ছিল, হোমো ইরেক্টাসরা বিলুপ্ত হয়ে যায় আধুনিক হোমো স্যাপিয়ান্সরা আসার পর, তবে কোনোকোনো জীববিজ্ঞানের গবেষকদের মতে আজ থেকে প্রায় ৪০০০০ হাজার বছর আগেও ইরেক্টাসরা, হোমো স্যাপিয়ান্সদের সাথেই ছিল নিয়ান্ডারথালদের মতো, অর্থাৎ অনেকগুলো হোমিনিন প্রজাতি আজ থেকে ৫০,০০০ বছর আগেও পৃথিবীতে ঘুরে বেড়িয়েছেএকই সময়ে, এদের মধ্যে শুধু আমরাই টিকে আছি এবং নতুন ভাবে বিবর্তিত হয়েছি, আর বাকিরা বিলুপ্ত হয়ে গেছে পুরোপুরি।

তথ্যসূত্র
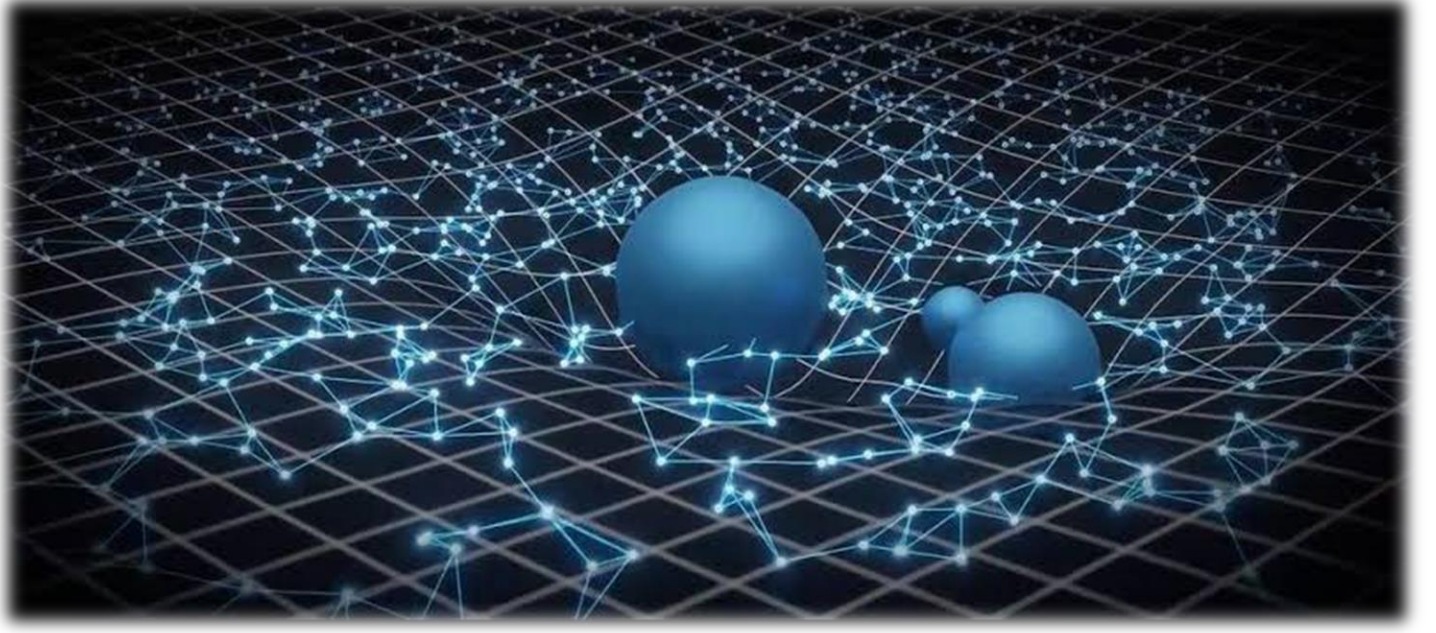
কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি

তানভীর রানা রাব্বি

স্বাগত কোয়ান্টাম গ্রাভিটি নামক এই আজাইরা জিনিস নিয়ে বকবক শোনার জন্য। কোয়ান্টাম, না না ধ্যানের কোয়ান্টাম না, কোয়ান্টাম মেকানিক্স বা কোয়ান্টাম বলবিদ্যা। কোয়ান্টাম মেকানিক্স আসলে একাধিক তত্ত্বকে একটিমাত্র তত্ত্বের মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা যেটা অনেকটাই সফল বলা যেতে পারে। শুরু হয়েছিলো ম্যাক্সওয়েলের ১৮৬৭ সালে তড়িৎক্ষেত্র এবং চৌম্বকক্ষেত্রকে একত্রে একটিমাত্র ক্ষেত্রতত্ত্ব তড়িৎচৌম্বক তত্ত্বে প্রকাশ করার মাধ্যমে। তো আজকে কথা হবে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একটি অপ্রমাণিত ফিল্ড, কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি নিয়ে।

মূল বিষয় আলোচনার আগে কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি (QG) কী সেটা সংক্ষেপে বলি। আসলে কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি হলো তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের একটি ক্ষেত্র যেখানে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের নীতি অনুসারে মাধ্যাকর্ষণ বর্ণনা করতে চাওয়া হয় যেখানে অন্যান্য কোয়ান্টাম প্রভাবগুলি উপেক্ষা করা যাবে না। যেমন: কাছের ছোট অ্যাস্ট্রোফিজিকাল বস্তু মহাকর্ষের প্রভাবে শক্তিশালী হবে। আচ্ছা যাই হোক, সেগুলো নিয়ে নিচে ধাপে ধাপে এগোচ্ছি।

কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি ফিল্ড এর ধারণা:

ম্যাক্সওয়েলের একীভূত করা তড়িৎচৌম্বক তত্ত্বের একটি সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত ইথারের ধারণাকে ভুল প্রমাণ করেছিল; ফলাফল হিসেবে আমরা পেয়েছিলাম বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। এই তত্ত্বে আইনস্টাইন স্থান ও কালের যে ধারণা দেন তার উপর ভিত্তি করে মিন্‌কোভস্কি এই দুটো বিষয়কে একত্র করে স্থান-কাল সম্মিলিতভাবে প্রকাশ করেন। সমতুল্যতার নীতির মাধ্যমে আইনস্টাইন দেখালেন, মহাকর্ষ ও ত্বরণ অভিন্ন।

মহাকর্ষ তত্ত্ব সম্পন্ন করার পর আইনস্টাইন চিন্তা করতে লাগলেন কীভাবে এই তত্ত্বকে তড়িৎচৌম্বক তত্ত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা যায়।

তাঁর সেই চেষ্টা সফলতার মুখ দেখেনি। আইনস্টাইনের মৃত্যুর পর পদার্থবিদগণ নতুন আরো দুটি বলের সন্ধান পান। ফলে মোট বলের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো চার-এ। বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনের অসমাপ্ত কাজকে সামনে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে কাজ শুরু করলেন। তবে এবার কাজ আরও জটিল হয়ে উঠলো। কারণ এখন মিলন ঘটাতে হবে দুটি নয়, চারটি বলের মধ্যে। সালাম, ওয়াইনবার্গ ও গ্ল্যাশো তড়িৎচৌম্বক বল ও দুর্বল কেন্দ্রীণ (কেন্দ্রীণ = নিউক্লীয়) বলকে একত্র করে দেখান যে, এগুলো আসলে একই বলের দুটো ভিন্ন রূপ । তাঁরা এই একীভূত বলের নাম দেন Electroweak Force. একীভূত এই বলের সাথে সবল কেন্দ্রীণ বলের একত্রীকরণও হয়তো সম্ভব। এই তিনটি বলকে যদি একত্র করা সম্ভব হয় তবেই আমরা পেয়ে যাব আরাধ্য সেই তত্ত্ব- মহান একীভূত তত্ত্ব। এই মহান একীভূত তত্ত্ব হতে পারে সর্বাত্মক তত্ত্বের জন্য এক বড় পথপ্রদর্শক। এই সর্বাত্মক তত্ত্বকেই আমরা চিনি কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি হিসেবে ।

গত শতাব্দীর সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী দুটি তত্ত্ব ছিল আপেক্ষিকতার তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম তত্ত্ব। কোয়ান্টাম তত্ত্ব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জগতের তত্ত্ব আর আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বৃহৎ জগতের তত্ত্ব (বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বটি অবশ্য ক্ষুদ্র জগতেও ব্যবহৃত হয়)। তারপরও বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্ব দুটিকে একটিমাত্র তত্ত্বের মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টারত ছিলেন (না, আমি স্ট্রিং তত্ত্বের কথা বলছি না)। তাদের সেই প্রচেষ্টারই একটি অংশ হিসেবে সফল তত্ত্ব কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডাইনামিক্স বা কোয়ান্টাম তড়িৎগতিবিদ্যার জন্ম। এতে সংযোগ ঘটানো হয়েছে তড়িৎচৌম্বক তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের মধ্যে। আবার বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব যেহেতু তড়িৎচৌম্বক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তাই অনেকে বলেন, মিলনটি হয়েছে আসলে কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের মাঝে। কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডাইনামিক্স হচ্ছে কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এর মাধ্যমে একটা বিষয় মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া গিয়েছিল যে, কোয়ান্টাম তত্ত্বকেও ক্ষেত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। যদি তাই হয় তবে মহাকর্ষকেও কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা সম্ভব কেননা আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্ব একটি ক্ষেত্রতত্ত্ব। এরই ধারাবাহিকতায় কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির গবেষণা আবার নতুন জীবন ফিরে পায়।

চারটি মৌলিক বল:

কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি সম্পর্কিত মূল আলোচনায় যাবার আগে চার প্রকার বল সম্পর্কে সামান্য ধারণা নেওয়া দরকার। তো চলুন শুরু করা যাক। প্রথমেই জানা যাক সবল কেন্দ্রীণ বল সম্পর্কে। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে এই বল কোন কিছুকে একটি জায়গায় ধরে রাখতে বেশ পারদর্শী। একটি পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে প্রোটন ও নিউট্রন। এর চারপাশে থাকে ইলেকট্রন। ইলেকট্রনের আধান ঋণাত্মক। নিউক্লিয়াসের আধান ধনাত্মক। প্রোটন ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট হলেও নিউট্রন আধানবিহীন অর্থাৎ আধান নিরপেক্ষ। কণা পদার্থবিদ্যায় প্রোটন এবং নিউট্রনই কিন্তু শেষ কথা নয় । এদেরও ক্ষুদ্রতম গাঠনিক উপাদান আছে যাদেরকে বলা হয় কোয়ার্ক।

এ সম্পর্কে পড়ে থাকলে হয়তো জানবেন যে,কোয়ার্কগুলো গ্লুওন (gluon) দ্বারা একত্রে আবদ্ধ থাকে । সংক্ষেপে বলতে হয়, এই গ্লুওন হচ্ছে সবল কেন্দ্রীণ বলের বাহক। তাহলে আমরা বলতে পারি, সবল কেন্দ্রীণ বলের কাজ হচ্ছে, গ্লুওন দ্বারা কোয়ার্ক তথা প্রোটন ও নিউট্রনগুলোকে কেন্দ্রের অভ্যন্তরে দৃঢ়ভাবে সংঘবদ্ধ করে রাখা। সবল কেন্দ্রীণ বল না থাকলে কী অবস্থা হতো তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না । কিছুই নেই!বুম!!

সবল কেন্দ্রীণ বলের বিপরীত বল হিসেবে আছে দুর্বল কেন্দ্রীণ বল। সুতরাং এর কাজও স্বাভাবিকভাবেই সবল কেন্দ্রীণ বলের বিপরীত হবে। অস্থায়ী অতি পারমাণবিক তেজস্ক্রিয় বিকিরণের জন্য এই বল দায়ী। সূর্যে যে ফিউশন বিক্রিয়া ঘটে তাও এই দুর্বল বলের কারণে। দুর্বল বল খুবই অল্প দূরত্বের মাঝে ক্রিয়াশীল থাকে (এর ক্রিয়াশীলতার সীমা প্রায় <১০-১৭ মিটার)। দুর্বল বলের জন্য বলবাহী কণারূপে আছে W ও Z কণা। এই কণাগুলোর ভর আছে এবং তা প্রোটনের চেয়ে প্রায় ১০০ গুণ ভারী। ১৯৬৮ সালে সালাম ও ওয়াইনবার্গ কর্তৃক প্রদত্ত electroweak বলের মাধ্যমে W ও Z কণার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় এবং পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে এর সন্ধান পাওয়া যায়। অনেক ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, তাই না?

উপরে আলোচিত বল দুটি তড়িৎচৌম্বক ও মহাকর্ষ বলের তুলনায় যথেষ্ট নতুন বলা চলে। অপরদিকে তড়িৎচৌম্বক বলের ধারণাটি ছিল আঠারো শতকে পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় অগ্রগতি। এই বলের বাহক হচ্ছে ফোটন যেগুলো আমাদের চোখে আলোকরশ্মিরূপে ধরা পড়ে। তড়িৎক্ষেত্র ও চৌম্বকক্ষেত্রের সম্মিলিত ক্রিয়ায় ফোটন নির্গত হয়।

সবশেষে আছে মহাকর্ষ বল। মহাকর্ষকে আমরা এখন স্থান-কালের বক্রতারূপেও দেখি। স্থান-কালের বক্রতারূপী মহাকর্ষ তত্ত্বটি একটি ক্ষেত্রতত্ত্ব হওয়ায় তড়িৎচৌম্বক তত্ত্বের ন্যায় এরও একটি বাহক কণা থাকা সম্ভব। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন গ্র্যাভিটন।

কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির গল্প:

১৯৩০ সালের পর থেকে বেশ কয়েকজন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ উপর্যুক্ত চার প্রকার বলকে সংঘবদ্ধ করার আশায় কাজ শুরু করেন। এদের মধ্যে স্বয়ং আইনস্টাইনও ছিলেন। আগেও একবার বলেছি, এই সংঘবদ্ধ তত্ত্ব তৈরিতে প্রধান বাধা ছিল মহাকর্ষ। গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে কোয়ান্টাম তড়িৎ গতিবিদ্যার সফলতা মহাকর্ষকে কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাথে একই সুতায় বাঁধতে বিজ্ঞানীদের অনুপ্রাণিত করে। ১৯২৯ সালে কোয়ান্টাম তড়িৎ গতিবিদ্যার উপর প্রকাশিত প্রথম গবেষণাপত্রে হাইজেনবার্গ ও পাউলী কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাথে মহাকর্ষকে একত্রীকরণ সম্ভব হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখন খুব ভালোভাবেই টের পাচ্ছেন যে, বিষয়টা যতটা সহজ বলে ভাবা হয়েছিল আসলে ততটা সহজ নয়। হাইজেনবার্গ ও পাউলী যে ভুলটি করেছিলেন তা হচ্ছে তাঁরা মহাকর্ষীয় তরঙ্গকে খুব দুর্বল বিবেচনা করেছিলেন। স্থির জ্যামিতিক কাঠামোতে এই দুর্বল তরঙ্গ খুব ক্ষুদ্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। বড় ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি হলে কাঠামো স্থির থাকে না। বিষয়টা আরেকটু পরিষ্কার করা দরকার, তাই না?

তো ধরুন, আপনি স্নিগ্ধ সকালে শান্ত পুকুরে একটি ঢিল ছুঁড়লেন। তাতে পুকুরের পানিতে যে মৃদুমন্দ আলোড়ন সৃষ্টি হলো তাকে আমার স্থির কাঠামোতে সৃষ্ট ঢেউ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। আবার জলোচ্ছ্বাসের কারণে বা সুনামিতে সৃষ্ট ঢেউকে মোটেও স্থির কাঠামোতে সৃষ্ট তরঙ্গ বলে মনে হয় না। বরং মনে হয় যেন সমস্ত জলস্তরটি একত্রে আলোড়িত হচ্ছে । স্থির বা অস্থির কাঠামোটি এখানে আন্দোলনের পশ্চাদ্ভূমি হিসেবে কাজ করছে। স্থির কাঠামোতে সৃষ্ট তরঙ্গকে বলা যায় পশ্চাদ্ভূমিনির্ভর তরঙ্গ আর সমগ্র কাঠামোটি যদি অস্থির হয় তবে সেক্ষেত্রে সৃষ্ট তরঙ্গটি হবে পশ্চাদ্ভূমিঅনির্ভর তরঙ্গ।

মহাবিশ্বে এমনও স্থান আছে যেখানকার মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায়। এসকল ক্ষেত্রে স্থানকে স্থির পশ্চাদ্পট কাঠামো হিসেবে বিবেচনা করা সম্ভব নয়। এছাড়াও ফ্রেম ড্র্যাগিং এর ঘটনাও স্থানের অস্থির কাঠামোকে নির্দেশ করে। পাউলী ও হাইজেনবার্গ তাঁদের গবেষণাপত্রে কাঠামোর এই অস্থিরতাকে একদমই আমলে নেননি। তাঁদের কল্পনায় ছিল পশ্চাদ্ভূমিনির্ভর একটি তত্ত্ব। কেননা তাঁদের প্রস্তাবিত কোয়ান্টাম তড়িৎ গতিবিদ্যাও ছিল পশ্চাদভূমিনির্ভর। আর দুর্বল মহাকর্ষীয় তরঙ্গে কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রয়োগ খুব জটিল কোনো বিষয় নয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি মহাকর্ষীয় তরঙ্গকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যাগতভাবে (যেমন গ্র্যাভিটন কণারূপে) দেখা সম্ভব (যেমনটা তড়িৎচৌম্বক তত্ত্বের ক্ষেত্রে ফোটন)।

পরবর্তীতে তাঁরা আরও একটি বড় সমস্যার সম্মুখীন হন কেননা মহাকর্ষীয় তরঙ্গের পারস্পরিক ক্রিয়া আছে। এমনকি শক্তি আছে এমন যে কোনো কিছুর সাথে এরা ক্রিয়াশীল থাকতে পারে এবং এরা নিজেরাও শক্তি বহন করে। তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গে এ ধরণের কোনো সমস্যা নেই। ফোটন যদিও তড়িৎ ও চৌম্বক আধানের সাথে পারস্পরিক ক্রিয়া করতে পারে তবুও তারা নিজেরা কখনই আধানপ্রাপ্ত হয় না। এ কারণে ফোটন কণা একে অপরের ভেতর দিয়ে অনায়াসে চলে যেতে পারে। যেহেতু মহাকর্ষীয় তরঙ্গ একে অপরের সাথে পরস্পর ক্রিয়াশীল থাকে তাই তাদের গতিকে স্থির পশ্চাদ্ভূমিতে ঘটছে বলে দাবি করাটা অমূলক। বরং তারা যখন অতিবাহিত হয় তখন পশ্চাদ্ভূমিকেও আন্দোলিত করে। সুতরাং কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির অবশ্যই পশ্চাদ্ভূমি অনির্ভর নীতি গ্রহণ করতে হবে।

এই বিষয়টির উপর প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রুশ পদার্থবিদ পেত্রোভিচ ব্রনস্টেইন, ১৯৩৬ সালের দিকে। গবেষণাপত্রটি লেখার এক বছর পরেই তিনি গ্রেফতার হন এবং ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফায়ারিং স্কোয়াডে তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। মৃত্যুর পর প্রতিভাবান এই বিজ্ঞানীর কাজগুলো একরকম হারিয়ে যায় বলা চলে।

এরপর আসে কোয়ান্টাম তড়িৎ গতিবিদ্যার সাফল্য। এই সফলতা বিজ্ঞানীদের মনে আবারও আশার সঞ্চার করে। এবার পদার্থবিদরা দুটো দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। কেউ অনুসরণ করলেন ব্রনস্টেইন এর

পশ্চাদ্ভূমিঅনির্ভর পথ, আবার কেউ অনুসরণ করলেন পাউলী, হাইজেনবার্গের পশ্চাদ্ভূমিনির্ভর পথ। যারা প্রথম পথটি অনুসরণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন পল ডিরাক, পিটার বার্গম্যান এর মতো বিজ্ঞানী। কিন্তু তাঁদের সফলতা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। আশির দশকের পূর্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা কোয়ান্টাম তড়িৎ গতিবিদ্যাকে সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে প্রয়োগ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। পশ্চাদ্ভূমিনির্ভর কোয়ান্টাম তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য কী হতে পারে তা কোয়ান্টাম তড়িৎ গতিবিদ্যার মাধ্যমে মোটামুটি ধারণা পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু পশ্চাদ্ভূমিঅনির্ভর কোয়ান্টাম তত্ত্বের স্বরূপ কী হতে পারে সেটা জানার কোনো উপায় ছিল না।

পাউলী ও হাইজেনবার্গের গ্র্যাভিটনের ধারণায় প্রথম আক্রমণ করেন রিচার্ড ফাইনম্যান। কোয়ান্টাম তড়িৎগতিবিদ্যার গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদান থাকায় তিনি নোবেল পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। ষাটের দশকের প্রথমদিকে তিনি কণাপদার্থবিজ্ঞানের গবেষণা থেকে সরে এসে মহাকর্ষকে কোয়ান্টাম তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রকাশ করার চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। কোয়ান্টাম তড়িৎগতিবিদ্যার আবিষ্কারক হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই তিনি তড়িৎগতিবিদ্যার উপর ভিত্তি করেই মহাকর্ষকে বোঝার চেষ্টা করেন। কিন্তু এবার তিনিও ব্যর্থ হলেন। ১৯৬২ সালে স্ত্রীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি স্পষ্টভাবে এই বিষয়ে তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি নিয়ে "The Theory of Gravitation" শীর্ষক একটি সম্মেলন থেকে ফিরে তিনি তাঁর স্ত্রীকে লিখলেন-

"I am not getting anything out of the meeting. I am learning nothing. Because there are no experiments, this field is not an active one, so few of the best men are doing work in it. The result is that there are hosts of dopes here, and it is not good for my blood pressure. Remind me not to come to any more gravity conferences!"

কোয়ান্টাম তত্ত্বের ওপর গ্র্যাভিটির প্রভাব:

পদার্থবিজ্ঞানীরা যখন দেখলেন এত কিছুর পরও কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি একরকম অধরাই থেকে যাচ্ছে তখন তাঁরা কোয়ান্টাম তত্ত্বে মহাকর্ষের প্রভাব কী হয় সেটা দেখার চেষ্টা করলেন। এজন্য যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে স্থান-কালে বিশেষ করে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র যেখানে শক্তিশালী সেখানে কোয়ান্টাম কণাগুলোর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা। শক্তিশালী মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের স্থান হতে পারে কৃষ্ণগহ্বর বা প্রসারমান মহাবিশ্ব। ষাটের দশকে এ বিষয়ে বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এর প্রথম সফলতা ছিলো একটি ভবিষ্যদ্বাণী যেখানে বলা হয়েছে, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র যদি অতি দ্রুত পরিবর্তিত হয় (কালে) তবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পারমাণবিক কণার সৃষ্টি হতে পারে। মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থা জানতে এই ধারণাটি কাজে লাগতে পারে।

প্রথমবারের মতো কৃষ্ণগহ্বরের অভ্যন্তরে পদার্থবিদ্যার একটি তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটান জ্যাকব বেকেনস্টেইন, ১৯৭৩ সালে। তাঁর ধারণামতে ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বরের এনট্রপি থাকা সম্ভব। এনট্রপি হচ্ছে বিশৃঙ্খলতার পরিমাপ। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রমতে, একটি বদ্ধ সিস্টেমের এনট্রপি কখনও কমে না। বাক্সভর্তি গ্যাস নিয়ে যদি ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বরে ফেলা হয় তবে মহাবিশ্বের মোট এনট্রপি কমছে বলে মনে হবে কেননা এই গ্যাসকে আর কখনই উদ্ধার করা সম্ভব নয় (কারণ ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বর থেকে কোনোকিছুই বের হতে পারে না)। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বেকেনস্টেইন বললেন, ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বরের নিজস্ব এনট্রপি থাকতে হবে যা গ্যাসসহ বাক্সটি ফেলার দরুন আরও বাড়বে। এতে মহাবিশ্বের মোট এনট্রপির পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকবে। তিনি হিসাব কষে দেখালেন, ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বরের এই এনট্রপির পরিমাণ হোল বা গহ্বরটির ইভেন্ট হরাইজন বা ঘটনা দিগন্তের ক্ষেত্রফলের সমানুপাতিক।

যেহেতু এনট্রপি হচ্ছে বিশৃঙ্খলতার পরিমাপ (অথবা বিক্ষিপ্ততা) এবং বিক্ষিপ্ত গতি তাপ উৎপন্ন করে সেহেতু কৃষ্ণগহ্বরেরও তাপমাত্রা থাকা উচিত। ১৯৭৪ সালে স্টিফেন হকিং দেখালেন, ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বরের তাপমাত্রা আছে যেটা এর ভরের ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বরের ভর বাড়লে এটি ক্রমেই শীতল হতে থাকবে। হকিং আরো বললেন, কৃষ্ণ গহ্বরের তাপমাত্রা থাকায় এটি কৃষ্ণ বস্তুর ন্যায় শক্তির বিকিরণ করবে। এভাবে কৃষ্ণগহ্বর শক্তিরূপী ভর হারাতে থাকবে। ফলে কৃষ্ণগহ্বর আরও বেশি পরিমাণে উত্তপ্ত হবে এবং অধিক শক্তি বিকিরণ করতে থাকবে। এভাবে এক সময় এটি প্ল্যাঙ্ক ভরে পৌঁছাবে এবং এমতাবস্থায় এর শেষ পরিণতি জানার জন্য মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রয়োজন হবে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বরে পতনের পর আপতিত সকল কিছুর

সকল তথ্য কি সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যাবে না কি উদ্ধার করা সম্ভব হবে। কেননা কৃষ্ণগহ্বরে চেয়ার, টেবিল, বাতি অথবা একটি ঘড়ি ইত্যাদি ফেললে পরবর্তীতে এর ফলস্বরূপ আমরা পাবো শুধু বিকিরণ; চেয়ার, টেবিল, বাতি অথবা ঘড়ি বলতে যা বুঝি তার কিছুই পাবো না। এটা আমাদের আলোচিত কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির জন্য এক বড় ধাঁধা। এই ধাঁধাটিকেই হকিং "Black Hole Information Paradox" নামে অভিহিত করেছেন। এই ভ্রম থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যও মহাকর্ষের কোয়ান্টাম সংযুক্তির প্রয়োজন।

সুপার সিমেট্রি বা অতিপ্রতিসাম্যতা:

কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির পরবর্তী প্রচেষ্টা ছিল সুপারসিমেট্রি বা অতিপ্রতিসাম্যতার ভিত্তিতে মহাকর্ষকে ব্যাখ্যা করা। ফলাফলস্বরূপ পাওয়া যায় সুপারগ্র্যাভিটি অতিমহাকর্ষ। সুপারসিমেট্রি বা অতিপ্রতিসাম্যতা ধারণাটির জন্ম হয় কণিকা ও বলের একত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা থেকে। সুপার সিমেট্রি বা অতি প্রতিসাম্যতার ভিত্তিতে ফার্মিওন এবং বোসনকে মিলিতরূপে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ফার্মিওন হচ্ছে পদার্থ সৃষ্টিকারী কণা (যেমন: ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন) এবং বোসন হচ্ছে বলবাহী কণা (যেমন: ফোটন, গ্লুওন)। কিন্তু অতিমহাকর্ষের গবেষণাও খুব বেশি দিন টিকতে পারেনি। এতে কেবল গাণিতিক জটিলতাই বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

স্ট্রিং থিওরি:

ষাটের দশকের শেষের দিকে কণা পদার্থবিদ্যার একটি সমস্যার দিকে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি চলে যায়। সবলভাবে ক্রিয়াশীল কণাগুলো (যেমন: প্রোটন ও নিউট্রন যেগুলো কোয়ার্ক দ্বারা সৃষ্ট) যখন একে অপরের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় তখন কী ঘটে?

এখানে জেনে রাখা ভালো যে, প্রোটন ও নিউট্রন ছাড়াও আরও বহু কণিকা আছে যেগুলো কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত। তবে এরা খুবই অস্থায়ী প্রকৃতির হয় এবং কেবলমাত্র পার্টিকেল এক্সেলারেটর বা ত্বরক যন্ত্রে প্রোটনের সাথে প্রোটনের সংঘর্ষ ঘটিয়ে এদের পাওয়া সম্ভব।

১৯৩০ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে এইসকল কণার সব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। এছাড়াও এই শ্রেণির কণাগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটলে কী হয় তাও বের করে ফেলা সম্ভব হয়েছিল। ১৯৬৮ সালে ইটালির গ্যাব্রিয়েল ভেনিজিয়ানো নামক এক তরুণ পদার্থবিদ এই তথ্য-উপাত্তগুলো বিশ্লেষণ করার সময় উপাত্তগুলোর মধ্যে একটি বিস্ময়কর মিল খুঁজে পান। এর উপর ভিত্তি করে তিনি একটি ফর্মুলা লেখেন যার মাধ্যমে বিভিন্ন কোণে বিক্ষিপ্ত কণার সম্ভাব্যতা যাচাই করা যায়। ১৯৭০ সালের দিকে কিছু পদার্থবিদ ভেনিজিয়ানোর সম্পূর্ণ কাজকে বাহ্যিক কিছু নকশার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। এনাদের মধ্যে শিকাগো ইউনিভার্সিটির নাম্বু, নীলস বোর ইনস্টিটিউট এর নিলসেন এবং স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির লিওনার্ড সাসকিন্ড এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই নকশা অনুসারে কণিকাগুলোকে বিন্দুবৎকণা আকারে না দেখে তন্তু আকারে দেখতে হবে এবং এই তন্তু হবে একমাত্রিক। এছাড়াও তন্তুগুলো রবার ব্যান্ডের ন্যায় সংকুচিত-প্রসারিত হতে পারে। তন্তুগুলো শক্তি গ্রহণ করে প্রসারিত এবং শক্তি মুক্ত করে সংকুচিত হয়। এমনকি রবার ব্যান্ডের ন্যায় এরা কম্পিতও হতে পারে। প্রোটন বিচূর্ণীকরণ পরীক্ষায় যে অসংখ্য সবল ক্রিয়াশীল কণার সন্ধান পাওয়া যায় তাদের প্রতিটিকে তন্তুর বিভিন্ন প্রকার কম্পনের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। মোটামুটি এই ছিলো তন্তুতত্ত্বের শুরুর কথা।

আসলে যে সমস্যার সমাধানকল্পে স্ট্রিং থিওরি বা দড়িতত্ত্বের জন্ম হয়েছিল পরবর্তীতে সেই সমস্যাটির সমাধান হয়েছিল কণাপদার্থবিদ্যার আদর্শ প্রতিরূপের মাধ্যমে। এই প্রতিরূপ অনুসারে সবল ক্রিয়াশীল কণাগুলো একটি বোসন (গ্লুওন) কণার বিনিময়ের মাধ্যমে স্থিতিশীল হয়। তবে এর অর্থ এই নয় যে, স্ট্রিং থিওরির প্রবক্তারা ভুল ছিলেন। বরং আদর্শ প্রতিরূপের মাধ্যমে মূল সমস্যার সমাধান হলেও স্ট্রিং থিওরির গবেষণা কিন্তু থেমে থাকেনি। অচিরেই বিজ্ঞানীরা (যারা স্ট্রিং থিওরি নিয়ে কাজ

করছিলেন) বুঝতে পারলেন যে, স্ট্রিং থিওরিকে সঠিক হবার জন্য একে অবশ্যই বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। আর সেটা তখনই হবে যখন তত্ত্বটি কিছু শর্ত পূরণ করবে। শর্তগুলো হচ্ছে- মহাবিশ্বকে পঁচিশ মাত্রার হতে হবে, ট্যাকিওনের অস্তিত্ব থাকতে হবে এবং এমন কণা থাকতে হবে যাকে কখনও স্থির অবস্থায় আনা যাবে না। তাছাড়া প্রকৃতিতে প্রাপ্ত অথবা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত অনেক কণিকা এই তত্ত্বে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এই তত্ত্বে ফার্মিওন শ্রেণির কোন কণাই ছিল না। এই সমস্যার সমাধানকল্পে এগিয়ে এলেন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ পিয়েরে রেমন্ড, অ্যান্দ্রি নেভিউ এবং জন

শোয়ার্জ। তাঁদের সংস্কারকৃত তত্ত্বে ট্যাকিওনের কোন অস্তিত্ব নেই এবং স্থানিক মাত্রা পঁচিশ থেকে কমে নয় মাত্রার (সময়ের মাত্রাসহ দশ মাত্রা) হয়েছে। এছাড়াও তাঁরা কিছু সমীকরণ বের করেছিলেন যার মাধ্যমে স্ট্রিং থিওরিটি বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। কিন্তু তখনও ভরহীন কণার শর্তটিকে কিছুতেই মেলানো যাচ্ছিল না। অবশেষে শার্ক, শোয়ার্জ এবং ইয়োনেয়ার গবেষণাকর্মের মাধ্যমে জানা গেল, ভরহীন কণাটি হচ্ছে গ্র্যাভিটন। এই সেই গ্র্যাভিটন যেটাকে অন্য তিনটি বলবাহী কণার সাথে একত্রীকরণের চেষ্টায় বছরের পর বছর বিজ্ঞানীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। স্ট্রিং থিওরি মতে, তন্তুর প্রান্তদ্বয় খোলা ও বদ্ধ- উভয় প্রকার হতে পারে। স্ট্রিং বা তন্তুর প্রান্তদ্বয় জোড়া লেগে ফাঁস গঠন করে। এই ফাঁসটির কম্পন গ্র্যাভিটনের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। আবার ফোটনের জন্য বরাদ্দ হচ্ছে খোলা অথবা আবদ্ধ তন্তুর কম্পন। তন্তুর খোলা প্রান্তদ্বয় আবার বিপরীতধর্মী আধান বহন করে। যেমন: তন্তুর এক প্রান্ত যদি ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণিকা ইলেকট্রনকে নির্দেশ করে তবে অপর প্রান্ত অবশ্যই এর বিপরীত কণা পজিট্রনকে নির্দেশ করবে। দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী তন্তুর ভরবিহীন কম্পন ফোটন কণার প্রতিনিধিত্ব করে যেটা কণা এবং প্রতিকণার মাঝে সৃষ্ট তড়িৎচৌম্বক বল বহন করে। ফলে দুই প্রান্ত খোলা তন্তু থেকে একইসাথে কণা ও বল পাওয়া সম্ভব।

বিজ্ঞানীরা চিন্তা করলেন, এভাবে স্ট্রিং থিওরিকে যদি আরও সংস্কার সাধন করা যায় তবে প্রমিত মডেলে বর্ণিত সকল প্রকার বল ও কণার অন্তর্ভুক্তি সম্ভব। আশির দশক থেকে এখন পর্যন্ত স্ট্রিং থিওরিতে আরও দুটো বিপ্লব সাধিত হয়েছে, (যার একটি

১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এবং অপরটি ১৯৯৫ সাল থেকে এখন পর্যন্ত) যে বিপ্লবের সাথে জড়িত ছিলেন পৃথিবীর খ্যাতনামা সব পদার্থবিদ। স্ট্রিং থিওরিরও পাঁচটি প্রকার আছে যেগুলোর মধ্যে পরবর্তীতে গাণিতিক সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেছে। এই সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিটি ভাগের একটি সাধারণ প্রকাশ থাকা অসম্ভব কিছু নয়। গভীর তাৎপর্যময় এই কাঠামোটিকে বলা হয় এম (M) তত্ত্ব। এই কাঠামোটিকে ঠিক মতো বুঝতে পারাটাই এখন তন্তুতত্ত্ববিদদের অন্যতম প্রধান একটি লক্ষ্য। স্ট্রিং থিওরিটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল এবং এখনও আছে। তত্ত্বটির সবচেয়ে বড় সমস্যাটা বোধ হয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের মাধ্যমে এর সত্যতা যাচাইয়ে অসুবিধা থাকা। তত্ত্বটি এমন কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করে যেগুলো যাচাই করে দেখা আমাদের সাধ্যের অতীত। তবে বর্তমান স্ট্রিংতত্ত্ববিদরা এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। স্ট্রিংতত্ত্বে বর্ণিত এতগুলো মাত্রা স্থানে কীভাবে জমাটবদ্ধ হয়ে থাকে সেটাও এক বিরাট ধাঁধা। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তত্ত্বটি এখনও পর্যন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ না। এর একটি সমস্যার সমাধান অপর একটি সমস্যার উদ্ভব ঘটায়। ফলে তাত্ত্বিক বিবেচনায় তত্ত্বটি ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। অনেক তরুণ প্রতিভাবান বিজ্ঞানী যেমন স্ট্রিং থিওরির গবেষণায় প্রবেশ করছেন তেমনি বহু প্রতিভাবান বিজ্ঞানী নিরাশ হয়ে গবেষণার পথ থেকে সরে এসেছেন। তারপরও বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বটিকেই কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির জন্য গ্রহণযোগ্য একমাত্র তত্ত্ব হিসেবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক কেননা তত্ত্বটি কিছুটা হলেও আশার আলো দেখাতে সক্ষম হয়েছে। তবে এটা ভাবা ঠিক হবে না যে, পৃথিবীর সকল পদার্থবিজ্ঞানী স্ট্রিং থিওরির পক্ষে । স্ট্রিং থিওরি বিরোধী বিজ্ঞানীদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। এদের মতে, কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির জন্য তন্তুতত্ত্বের ন্যায় মরীচিকার পেছনে না ঘুরে বরং অন্য পন্থায় চেষ্টা করা উচিত। এইসকল বিজ্ঞানীদের মতে, কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির তত্ত্ব অবশ্যই পশ্চাদ্ভূমি অনির্ভর হতে হবে এবং স্ট্রিং থিওরি এই প্রাথমিক শর্তটি পূরণেই ব্যর্থ। এইসকল বিজ্ঞানীর মতে, স্ট্রিং থিওরির সফলতার চেয়ে ব্যর্থতা বেশি। অপরদিকে স্ট্রিং থিওরিবাদীদের আশা এই ব্যর্থতার কবল থেকে অচিরেই মুক্ত হওয়া যাবে। শুধু একটু সময় দরকার। অনেকে আবার স্ট্রিং থিওরিকে আবার বিজ্ঞান মানতে নারাজ, কারণ স্ট্রিং থিওরি নাকি গ্যালিলিও প্রদত্ত আধুনিক বিজ্ঞানের নীতি মানে না।

কোয়ান্টাম জ্যামিতি:

(মহাকর্ষের আণুবীক্ষণিক অবস্থা)

কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির জন্য প্রস্তাবিত আরও একটি উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব হচ্ছে “Loop Quantum Gravity” বা সংক্ষেপে LQG. এই তত্ত্ব মহাকর্ষের কোয়ান্টাম বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করে। এই তত্ত্বানুসারে, ক্ষেত্রতত্ত্বসমূহকে (যেমন: তড়িৎচৌম্বক তত্ত্ব) সরাসরি এদের ক্ষেত্ররেখারূপে বর্ণনা করা হয়। LQG এর মূল ধারণাগুলো এসেছে আলেকজান্ডার পলিয়াকভ, কেনেথ উইলসন এবং হলগার নিলসেন এর মাথা থেকে। পদার্থের অনুপস্থিতিতে ক্ষেত্ররেখাসমূহ নিজেরা নিজেদের উপর জড়িয়ে ফাঁস (loop) তৈরি করে। এ কারণে তত্ত্বটির নামকরণ করা হয়েছে Loop Quantum Gravity. ১৯৮৬

সালে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী অভয় অ্যাশটেকার একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন যেখানে দেখানো হয়েছে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বকে গেজ ক্ষেত্রের আদলে প্রকাশ করা যায়। ফলে স্থান-কাল মেট্রিক তড়িৎক্ষেত্রের ন্যায় কিছু একটাতে রূপান্তরিত হয়। আমরা যখন একইরূপ ক্ষেত্ররেখাগুলোকে কোয়ান্টাম তত্ত্বে ব্যবহার করতে যাই তখন কোনো পশ্চাদ্ভূমি থাকে না কেননা ক্ষেত্ররেখাগুলোই তখন স্থানিক জ্যামিতি গ্রহণ করে। ফলে কোনোরূপ চিরায়ত জ্যামিতি আর অবশিষ্ট থাকে না। চিরায়ত জ্যামিতি বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে আমাদের স্বাভাবিক ধ্যানধারণায় সৃষ্ট স্থানিক জ্যামিতি। এই তত্ত্বানুসারে, ফাঁসগুলো একত্রে জালের ন্যায় গঠন তৈরি করে যাকে বলা হয় স্পিন নেটওয়ার্ক। এই স্পিন নেটওয়ার্ক ধীরে ধীরে স্পিন ফোম (Spin Foam) এ পরিণত হয়। আর এর দৈর্ঘ্য কখনই প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্যকে অতিক্রম করে না। অর্থাৎ স্থান নিজেই পারমাণবিক গঠনরূপে আবির্ভূত হয়। তবে তন্তুতত্ত্ব বা LQG সঠিক হোক বা না হোক, মানবজাতি এখন পর্যন্ত যে কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির জন্য পূর্ণাঙ্গ একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারেনি এ কথা সত্য।

তো পড়ে কী লাভ হলো! কিছুই না। কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি এখন পদার্থবিদদের কাছে পরশ পাথরের মতো আরাধ্য একটি বিষয় যার মাধ্যমে মহাবিশ্বের পরিপূর্ণ একটি মডেল প্রস্তুত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। আসলে নিউটন সাহেব হলেন যত নষ্টের মূল। তাঁকে এসব গ্র্যাভিটি নিয়ে কে ভাবতে বলেছে? জোক অ্যাসাইড, সবটুকু পড়ে এত দূর আসতে পারার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

তথ্যসূত্র:

BBC Walking With the Dinosaurs (1999)

রিভিউয়ার: সমুদ্র জিত সাহা

বিবিসি ওয়াকিং উইথ ডাইনোসরে ক্রমানুসারে ট্রায়াসিক, জুরাসিক ও ক্রেটাসিয়াস যুগের প্রাণীদের দেখানো হয়েছে। ফলে প্রাচীন পৃথিবীর টাইমলাইন সম্পর্কে ভালো ধারণা তৈরি হবে। ১৯৯৯ সাল বলে গ্রাফিক্স কোয়ালিটি অত ভালো না, অনেক সিনেই কৃত্রিম হাত চালিত ও রিমোট কন্ট্রোলড মডেল ব্যবহার করে যতটা সম্ভব রিয়ালিস্টিক দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে তাদের এই প্রচেষ্টা অনেকটাই সফল। তবে ১৯৯৯ সালে আমাদের ডাইনোসর বিষয়ক জ্ঞান আজকের চেয়ে অনেক কম ছিল, ফলাফল এখানে অনেক কিছুই ভুল/অশুদ্ধ দেখতে পারবেন। তারপরও,রেকমেন্ডেড থাকবে এই সিরিজটা। ক্লাসিকাল ওল্ড স্কুল ধাঁচের ভিডিও ও ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক পছন্দ হলে অবশ্যই এটা দেখে মজা পাবেন।

পালকওয়ালা ডাইনোসর

নাঈম হোসেন ফারুকী

পনেরো কোটি বছর আগে জুরাসিকের শেষ দিক থেকে পরে ক্রেটাসিয়াস পিরিয়ড পর্যন্ত বহু পালকওয়ালা ডাইনোসর দেখা যায়। দাঁত, নখ, থাবা আর পাখা মিলিয়ে এককেকটার চেহারা কিম্ভূতকিমাকার দানব টাইপ। মাংসাশী ডাইনোসরদের বলা হয় থেরোপড। দুই পায়ে দাঁড়ায় , সামনে ছোট দুইটা হাত, এগুলো হচ্ছে থেরোপড ডাইনোসর। টি রেক্স এই দলের। কিছু থেরোপডের পালক থাকত, সবার না। চলো কয়েকটা দেখে আসি।

১. আর্কিওপটেরিক্স: পনেরো কোটি বছর আগের দেড় ফুট লম্বা দানব , থাকত বনে জঙ্গলে। এর প্রায় আস্ত ফসিল পাওয়া গেছে, ফসিলে পালকের দাগ স্পষ্ট। চমৎকার দুইটা পাখা ছিল তার, পাখার নিচে লুকানো থাবা। অনেক বিজ্ঞানীরা মনে করেন এ উড়তে পারত, যদিও খুব বেশি ভালো না।
আর্কিওপটেরিক্সকে বলা হয় বর্তমানের বহু পাখির আদিপুরুষ। আর্কিও নামে প্রাচীন, টেরিক্স মানে ডানা। আর্কিওপটেরিক্স মানে প্রাচীন ডানা। পাখিরা কিন্তু মোটেও টি রেক্স থেকে আসে নি, এসেছে পালকওয়ালা থেরোপড থেকে।

২. সাইনোসরেপ্টেরিক্স: সাইনো মানে চীন, সর বলতে বুঝায় সরীসৃপদের। এ হচ্ছে চীন দেশের ডানাওয়ালা সরিসৃপ। তের কোটি বছর আগে চীনের বন জঙ্গলে শিকার করে বেড়াত তিন ফুট এই মনস্টার। মাইক্রোস্কোপের নিচের এদের ফসিলে উটপাখির মতো পালক ক্লিয়ার বোঝা যায়।

৩. কনফুসিয়র্নিস: অর্নিস মানে পাখি। এর নামের মানে কনফুসিয়াস পাখি। দার্শনিক কনফুসিয়াসের নামে নাম।
এর বাড়িও চায়নায়। কনফুসিয়র্নিসের কিন্তু অন্যদের মতো দাঁত ছিল না, পাখিদের মতো ঠোঁট ছিল। পেছনে লম্বা ঝলমলে একটা লেজ ছিল। কিন্তু তার পরও ডানার নিচে থাবা ছিল। পরীদের ডানার নিচে থাবা লুকানো থাকতেই পারে, সাবধান!

৪. ভেলোসির্যাপ্টর: জুরাসিক ওয়ার্ল্ড/ পার্ক দেখেছ কে কে? সেখানে ছোট ছোট, বুদ্ধিমান, বেশ হিংস্র কিছু ডাইনোসর ছিল, মনে আছে? সেগুলো ভেলোসির্যাপটর। ভেলোসিটি মানে বেগ, র‍্যাপ্টর মানে চোর। এর নামের মানে তাই দ্রুতগামী চোর।
কাহিনী হচ্ছে, ভেলোসির্যাপ্টরদের চেহারা মোটেও মুভির মতো ছিল না, দাঁতওয়ালা, পাখাওয়ালা, থাবাওয়ালা একটা চূড়ান্ত ভয়াবহ মাংসাশী ঈগল কল্পনা করলে যা হয়, এরা ছিল সেরকম। সাড়ে ছয় ফিট লম্বা শরীরটা ভর্তি ছিল হিংস্রতা। ছোট প্রাণিদের ধরে ছিড়ে ফেলতে পারত।

৫. থেরিজাইনোসরাস: এইবার ভাবো, ৩৬ ফুট লম্বা, ৩০ ইঞ্চি তলোয়ারের সমান নখওয়ালা, পাখা পালক আর দাঁতওয়ালা সুবিশাল দানব। কিন্তু দাঁতগুলো ছোট ছোট, গরুর দাঁতের মতো। এই হাট্টিমাটিম টিম গাছপালা খেতো, আর কেউ জ্বালাতে আসলে আড়াই ফুট লম্বা নখ দিয়ে কোপ দিত। আট কোটি বছর আগে জঙ্গলে এদের দেখা মিলত। থেরিজাইনোসরাস কথাটার অর্থ কাস্তে সরীসৃপ। কাস্তের মতো লম্বা নখের জন্য।

আজ এ পর্যন্তই। শেষ করার আগে একটা জিনিস ক্লিয়ার করা দরকার। বাদুরের মতো লম্বা ডানা মেলে প্লেনের মতো উড়ে বেড়াত যে পালকহীন দানবরা, সেগুলো ডাইনোসর না, টেরোসর। পাখিদের উদ্ভব হয়েছে পালকওয়ালা ডাইনোসর থেকে, টেরোসর না। তাদের গল্প আরেকদিন বলা যাবে।

ডাইনোর নামকরণ

নাঈম হোসেন ফারুকী

সরাস মানে হচ্ছে লিজার্ড, টিকটিকি টাইপ। কীভাবে জানি ডাইনোসরদের নামের সাথে এই কথাটা ঢুকেছে। চলো কয়েকটার নামের মানে দেখে আসি-

অ্যালোসরাস - অন্য রকম টিকটিকি
ব্রোন্টোসরাস - বজ্রপাতের টিকটিকি
ড্রায়োসরাস - গাছের টিকটিকি
এডমন্টোসরাস - হাঁসের মতো টিকটিকি
সুপারসরাস - সুপার টিকটিকি
স্পাইনোসরাস - কাঁটাওয়ালা টিকটিকি
টাইরানোসরাস রেক্স - অত্যাচারী টিকটিকি রাজ

র‍্যাপ্টর মানে হচ্ছে চোর। অনেক ডাইনোর নামের সাথে র‍্যাপ্টর কথাটা থাকে।
ইউর‍্যাপ্টর - ভোরের চোর
মেগার‍্যাপ্টর - বড় চোর
অভির‍্যাপ্টর - ডিম চোর
ভেলোসির‍্যাপ্টর - জোরে চলে যে চোর

লাস্টে ডোন মানে হচ্ছে দাঁত।
মেগালোডন - বড় দাঁত
ইগুয়ানোডন - ইগুয়ানার মতো দাঁত
ভালকানোডন - ভলক্যানো বা আগ্নেয়গিরির মতো দাঁত!!

মিমাস মানে মতো
অ্যাভিমিমাস - পাখির মতো
গ্যালিমিমাস - মুরগির মতো
সুচোমিমাস - কুমিরের মতো

থেরিয়াম মানে হচ্ছে বিস্ট। পশু। এই নামটা দেয় সাধারণত ম্যামালদের।
মেগাথেরিয়াম - বড় পশু
প্যারাসেরাথেরিয়াম - প্রায় শিংবিহীন পশু
ব্রোন্টোথেরিয়াম - বজ্রপাতের পশু!!

তাহলে আমরা কি বুঝলাম? সায়েন্টিফিক নাম শুনতে ভয়ানক লাগলেও আসলে মোটেও ভয়ানক কিছু না, একেবারেই সিলি জিনিস।

ডাইনোদের শেষ দিন

স্ক্রিপ্ট: পার্থিব রায়

অঙ্কন: প্রিয় তালুকদার
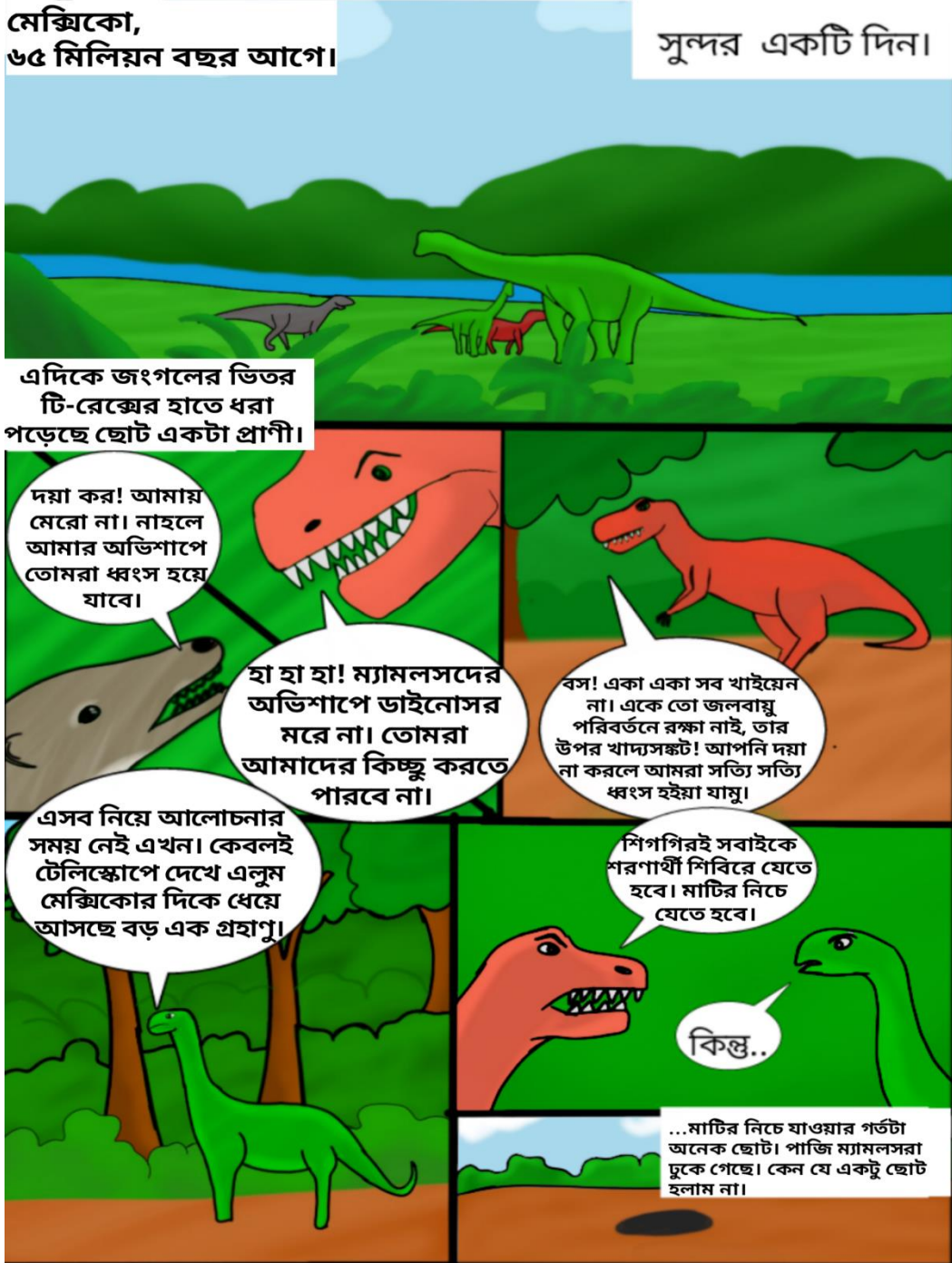
মেক্সিকোর দিকে ধেয়ে আসছে গ্রহাণুটি।
বুম
ডাইনোসর
চা কফি
কোয়ান্টাম মেকানিক্স
ঘুম ভেঙে গেছে পার্থর।
ডাইনোসর নিয়ে একটু বেশিই পড়াশোনা চলছে। K-pg(Cretaceous–Paleogene extinction event) নিয়ে শেষমেশ স্বপ্ন দেখলাম।
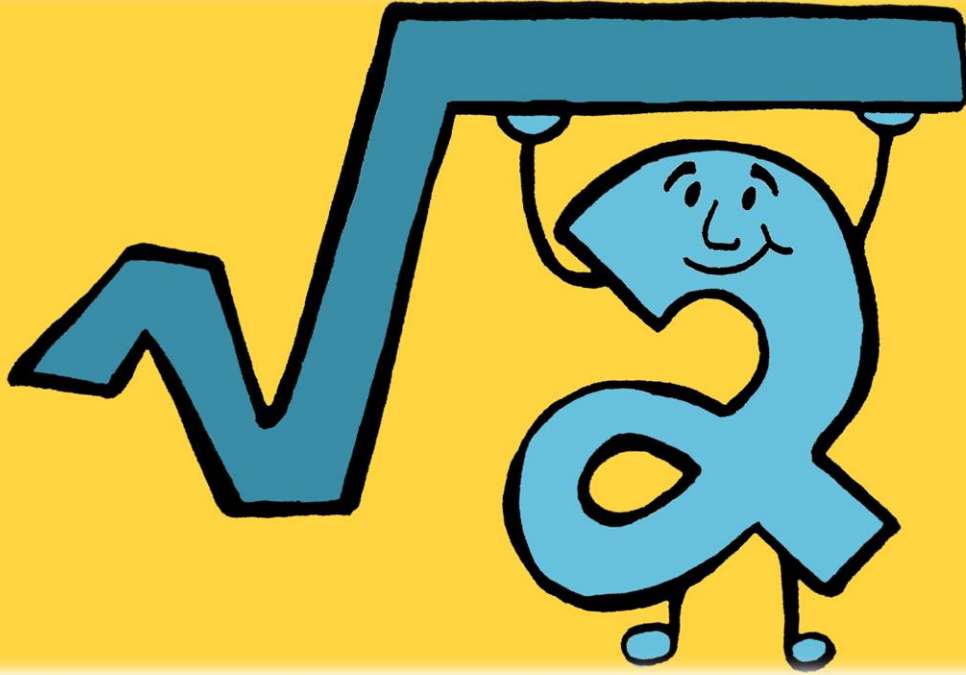
রুট সমাচার

স্বপ্নিল আচার্য্য

স্কয়ার রুট বীজগণিতের একটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট বিষয়। হরহামেশাই আমরা এটা ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা এটা যেভাবে ব্যবহার করি,অনেক ক্ষেত্রেই উত্তর ঠিক হলেও সঠিক প্রসেসটা আমরা জানি না। আমরা যে প্রায়ই 1=2 প্রমাণ করি, সেগুলোতে বেশিরভাগ সময়ই রুট এর অবৈধ ব্যবহার হয়। আজকে সেসব বৈধতা অবৈধতা নিয়ে কথা হবে। আরও কথা হবে, কখনো কখনো y আর x সমান দেখা গেলেও তারা অ্যাকচুয়ালি সমান হয় না- সেটা নিয়ে।

প্রথমে একটা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করা যাক। $\sqrt{25}$ এর মান কত? আমরা বেশিরভাগই হয়তো বলবো-প্লাস মাইনাস 5। কারণ, বর্গমূল হচ্ছে বর্গের উল্টা অপারেটর। যেহেতু $(+5)^2=25$ এবং $(-5)^2=25$ তাহলে $\sqrt{25}$ এর মান হওয়া উচিত প্লাস মাইনাস 5। কিন্তু, অ্যাকচুয়ালি $\sqrt{25}$. এর মান শুধু +5। কিন্তু কেন?

দ্বিতীয়ত, একটা নরমাল ইকুয়েশন সলভ করি। $x^2=25$ হলে, x=কত?

আমরা যারা বীজগণিত করেছি, তারা প্রায়ই এই টাইপ জিনিস পাই। এবং উত্তর হিসেবে আমরা বলি প্লাস মাইনাস 5 এবং এটাই কারেক্ট। কারণ,+5 এবং -5 দুটোরই বর্গ করলে 25 আসবে। কিন্তু আমরা যদি আগের ব্যাপারটা মেনে নিই, তাহলে মান শুধু +5 আসার কথা। কিন্তু এই সমীকরণের উত্তর আসলেই প্লাস মাইনাস 5। কারণ,কোনো সমীকরণের চলকের হাইয়েস্ট পাওয়ার যত, মূলও ঠিক ততগুলোই হবে।তাহলে,এই দুই ঘটনার সমস্যা কোথায়?

আমরা আগে অঙ্কটা করিঃ

$x^2=25$

$=>x^2=(5)^2$

$=>x=\pm5$

অনেকে সাইড নোট লেখি উভয়পক্ষে বর্গমূল করে। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম √25 এর মান +5। তাহলে এই সমীকরণ এর সমাধান -5 আসলো কীভাবে? একটা জিনিস মনে রাখা ভালো, কোনো একটা সমীকরণে চলকের হাইয়েস্ট পাওয়ার যত, ঐ সমীকরণের মূল ততটি হবে। তাহলে এই সমীকরণেরও মূল দুইটি থাকা উচিত। তাহলে -5 গেলো কোথায়? এখন দুটো বিষয়ই ক্লিয়ার করা যাক।

বীজগণিতে √ এই চিহ্নটার নাম প্রিন্সিপাল স্কয়ার রুট। এবং গণিতবিদরা এটাকে এভাবেই সংজ্ঞায়িত করেছেন যে, এটা শুধু ধনাত্মক মান দেবে। Fundamental Theorem of Algebra অনুযায়ী

$\sqrt{(x^2)}=|x|$ সুতরাং, √25 এর মান শুধু +5। কখনোই -5 নয়।

এখন পূর্বের ইকুয়েশনে ফিরে আসি।

$x^2=25$

$=>|x|=5$ উভয় পক্ষে বর্গমূল করে

এখন আমরা যদি মডুলাসের ধর্ম জানি তাহলে দেখব যে, মডুলাসের ভিতর ধনাত্মক বা ঋণাত্মক যেই সংখ্যাই দেই না কেন তা মডুলাস ধনাত্মক মান দেয়। তাহলে মডুলাসের ভেতর আমরা +x বা -x যাই দেই,মান আসবে 5। তাহলে, আমরা লিখতে পারি-

x=5 এবং -x=5 বা, x=-5। এখন আমরা -5 ও পেলাম। সুতরাং আমরা বলতে পারি, x^2=25 হলে, x=+5 অথবা -5। ক্লিয়ার?

এই জিনিসটা আরেকভাবে দেখা যাক:

$x^2=25$

$=>x^2=(\sqrt{25})^2$

$=>x^2-(\sqrt{25})^2=0$

$=>(x+\sqrt{25})(x-\sqrt{25})=0$

সুতরাং, $x-\sqrt{25}=0$ অথবা, $x+\sqrt{25}=0$

$x=\sqrt{25}$ অথবা, $x=-\sqrt{25}$

$=>x=5$ অথবা, $=>x=-5$
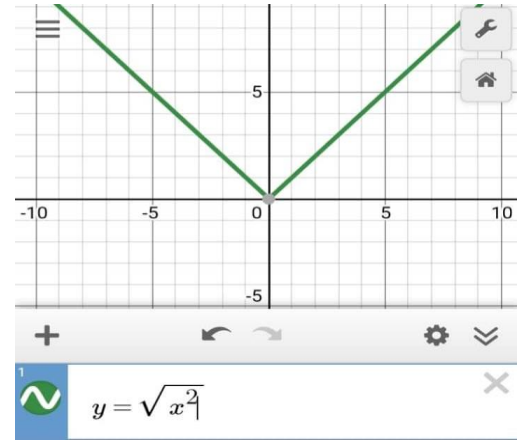
এভাবেও, আমরা x এর মান প্লাস মাইনাস 5 দুটোই পেলাম। দেখ, এখানে √25 এর মান কিন্তু আমি শুধু পজিটিভ 5 ই ব্যবহার করেছি। দুইটি ঘটনা এখন ক্লিয়ার? কিন্তু আমার কথায় বিশ্বাস করতে হবে কেন? এই জিনিসটা ছবিতেও খুব সুন্দরভাবে দেখা যায়। (সেজন্য) আগে পড়তে হবে x ও y এর ভালোবাসা।

প্রথমে আমরা একটি গ্রাফ আঁকবো। সমীকরণ হবে

y=x... (1)

গ্রাফটা হবে একটি মূলবিন্দুগামী সরলরেখা।
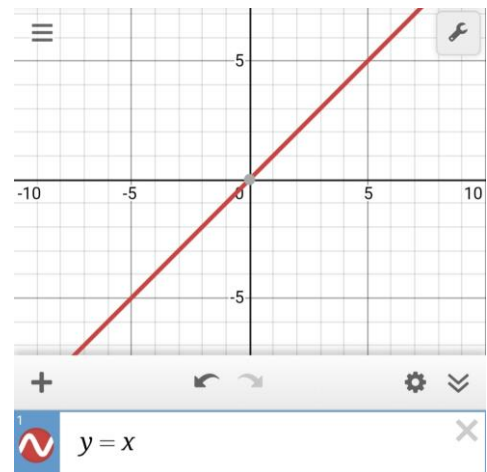
x এর মান আমরা যাই দেই না কেন y এর মান তাই পাব। প্রথম ছবিটা দেখ। ফাইন।

এবার আসি দ্বিতীয় গ্রাফে। সমীকরণ হচ্ছে-

$y=\sqrt{(x^2)}$ ...(2)

দেখি,

x=0, y=0

x=-1, y=1

x=-2, y=2

x=1, y=1

x=2, y=2

....

মানে আমরা x যা দেবো y তাই পাবো ও গ্রাফ হবে V আকৃতির এবং সরলরেখাগুলো অসীমের দিকে ছুটবে। দ্বিতীয় ছবিটা দেখো। তারমানে, y=x যেখানে ডোমেন ℝ এবং রেঞ্জ ℝ এবং $y=\sqrt{(x^2)}$ যেখানে ডোমেন ℝ কিন্তু রেঞ্জ ℝ+ এর গ্রাফ একইরকম না। তারমানে $\sqrt{(x^2)}\neq x$। কারণ, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে y এর নেগেটিভ মান আসে না। তারমানে $\sqrt{(x^2)}$ এর মান নেগেটিভ হতে পারে না। এখন ছবিটা দেখে বোঝা যাচ্ছে! রাইট?

চল, আরেকভাবে দেখি।

এবার আমরা আরেকটা গ্রাফ আঁকবো।সমীকরণ হচ্ছে

$y=|x|$... (3)

এখন,x=0, y=0

x=-1, y=1

x=-2, y=2

x=1, y=1

x=2, y=2

....
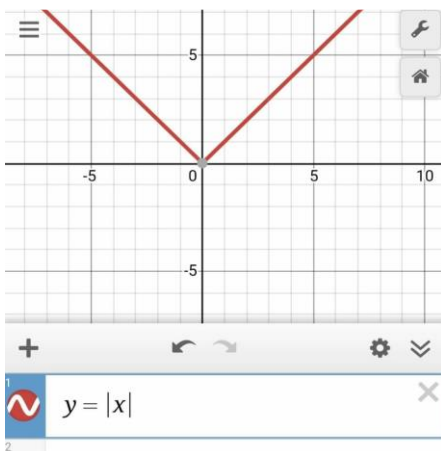
এগুলো গ্রাফে ইনপুট দিলে আমরা দ্বিতীয় গ্রাফের মতো সেইম একটা V আকৃতির গ্রাফ পাব। তৃতীয় ছবিটা দেখ। এখন, দ্বিতীয় আর তৃতীয় গ্রাফ যেহেতু একদম একই তাহলে,আমরা বলতে পারি $\sqrt{(x^2)}=|x|$

বুঝেছ? তারমানে, এই তিনটা ইকুয়েশন দিয়ে আমরা এতটুকু ক্লিয়ারলি বলতে পারি যে,

$\sqrt{(x^2)}=|x|$ এবং $\sqrt{(x^2)}\neq x$ তাহলে এতক্ষণ প্যাচালের পরে আমরা এই দুটো সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে-

১. রুট করলে আমরা সবসময় পজিটিভ ভ্যালু পাব।

২. এবং সমীকরণ থেকে আমরা পজিটিভ নেগেটিভ দুটোই পেয়েছি। সেটা কিন্তু বর্গমূল থেকে নয়। কীভাবে পেয়েছি সেই নিয়েই এতক্ষণ বললাম।

তারমানে আমরা সচরাচর যে বলি $\sqrt{(x^2)}=x$ তা কিন্তু ঠিক না। রাইট? এরকম আরো কিছু কেইসে ঘটতে পারে। সেগুলোও দেখা যাক।

ধরি,$y=(\sqrt{x})^2$...(4) এখন গ্রাফ আঁকব।

x=0, y=0

x=1, y=1

x=2, y=2

....
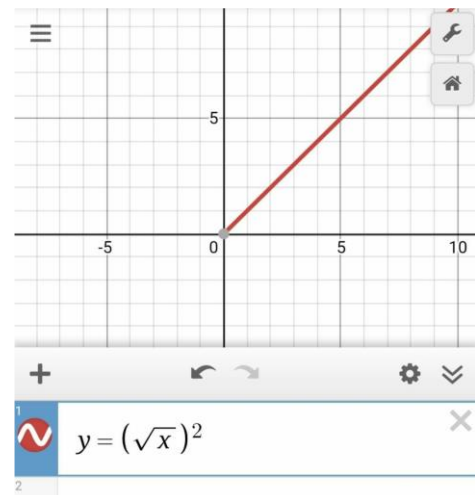
কিন্তু দেখ, বাস্তব সংখ্যার ক্ষেত্রে চিন্তা করলে, এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা নেগেটিভ ইনপুট দিতে পারব না। রুটের ভেতরে নেগেটিভ ইনপুট করলে বাস্তব সংখ্যার ফিল্ডে সেটা অবৈধ। তার মানে এর ডোমেন $\mathbb{R}+$ । তাহলে এই ফাংশনটার গ্রাফ হবে একটা সরলরেখা যেটা শুধু প্রথম চতুর্ভাগে অবস্থিত। চতুর্থ ছবিটা দেখ।

তাহলে, $y = (\sqrt{x})^2$ এর গ্রাফ কিন্তু মোটেও $y=x$ এর মতো না।তার মানে, $(\sqrt{x})^2 \neq x$

এরকমভাবে, যেকোনো জোড় পাওয়ারের জন্য এটা সত্য হবে। কিন্তু, যেকোনো বিজোড় পাওয়ারের জন্য উল্টোটা সত্য হবে। মানে, $(\sqrt[n]{x})^n = x$ হবে, যদি n বিজোড় হয়। এখানে ব্র্যাকেটের ভেতরের n দ্বারা n তম মূল বুঝানো হয়েছে। কেন এমন হয়? তা নিজেরা চিন্তা করে বের কর।

টাইটানিস ওয়াললারি

মিনহাজুল আবেদিন

টাইটানিস ওয়াললারি, প্যালিওসিন যুগের অন্যতম প্রিডেটর টাইপ ফ্লাইটলেস বার্ড। এই প্রিডেটর টাইপ বার্ডটি লম্বায় ২.৫মিটার ছিল, ভাবতে পারেন! এটি এতটাই হিংস্র যে এর সামনে স্যাবর টুথেড স্মিলোডোনরাও কিছুই না। হিংস্র কেনই-বা হবে না এরা? এরা যে সেই যুগে থেরোপড ডাইনোসরদের বংশধর ছিল।

প্যালিওসিন যুগ। খোলা মাঠের ঘাস প্রান্তর। কিছুক্ষণ আগেই এক হিংস্র টাইটানিসের হাতে শিকার হলো একটি স্যাবর টুথেড টাইগার। আপনি দূরে গাছের আড়াল থেকে দেখছেন। মাথা খারাপ? পালান এখনি, ধরতে পারলে কিন্তু খবর আছে!

ফ্যান বেশি স্পিডে চালালে বিদ্যুৎ বেশি খরচ হয় নাকি আস্তে চালালে বেশি খরচ হয়? কেন?

মো: আসিফ আবদুল্লাহ

"ফ্যানের জোর কমালে বিদ্যুৎ খরচ একই থাকে না কি বিদ্যুৎ খরচ কম হয়?"
এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় দুই রকম। কেউ বলবে বিদ্যুৎ খরচ একই থাকবে। আবার কেউ বলবে বিদ্যুৎ খরচ কমে যাবে। তারা দুজনেই মোটামুটিরকম সঠিক উত্তর দিয়েছে।

কি, কনফিউজড হয়ে যাচ্ছেন তাইতো? আসলে বিদ্যুৎ খরচ কমবে কি কমবে না সেটা নির্ভর করবে কী ধরণের রেগুলেটর ব্যবহার করছেন তার উপর। রেগুলেটর সাধারণত দুই প্রকার।

(১) ইলেকট্রিক্যাল রেগুলেটর ও

(২) ইলেকট্রনিক রেগুলেটর।

আপনি যদি ইলেকট্রিক্যাল রেগুলেটর ব্যবহার করেন তাহলে জোর কমালে বা বাড়ালে বিদ্যুৎ খরচ একই থাকবে। আবার আপনি যদি ইলেকট্রনিক রেগুলেটর ব্যবহার করেন তাহলে জোর কমালে বিদ্যুৎ খরচ কমে যাবে। জোর বাড়ালে বিদ্যুৎ বেশি খরচ হবে।

এবার চলুন জেনে নেওয়া যাক ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক রেগুলেটর কীভাবে চিনবেন।

ইলেকট্রিক্যাল রেগুলেটর: যে সকল বড় বড় রেগুলেটর আগে ব্যবহৃত হতো, সেগুলো সুইচ বোর্ডের অর্ধেকের বেশি জায়গা দখল করত এবং খুব গরম হতো। যদি খুলে দেখতে পারেন তাহলে দেখবেন একটি লোহার কোর এর গায়ে প্রচুর পরিমাণে তামার তার পেঁচিয়ে তৈরি করা।

ইলেকট্রনিক রেগুলেটর: এটা দেখতে অত্যন্ত ছোট সাইজের হয়। প্রায় একটা সুইচের সমান। সুইচবোর্ডে একটা সুইচের সমান জায়গা

দখল করে। খুব সামান্য গরম হয়। যদি খুলে দেখতে পারেন, তাহলে দেখবেন এটা একটি ভেরিয়েবল রেজিস্টর, একটা বা কয়েকটা ফিক্সড রেজিস্টর, ট্রায়াক ও ক্যাপাসিটর দিয়ে তৈরি ছোট্ট একটা সার্কিট।

এবার আসি এদের কার্যপ্রণালীতে।

ইলেকট্রিক্যাল রেগুলেটর:

ইলেকট্রিক্যাল রেগুলেটর তৈরি করা হয় মূলত আয়রন কোরের গায়ে তামার তার পেঁচিয়ে। বিদ্যুৎ এই তারের ভেতর দিয়ে অনেক দূরত্ব অতিক্রম করে প্রবাহিত হওয়ার সময় কিছু বিদ্যুৎ তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ফলে ফ্যান পূর্ণ শক্তি পায় না এবং ফ্যানের রোটেশন/গতি কমে যায়। এতে কিন্তু মূল বিদ্যুৎ খরচ একই থাকছে। অর্থাৎ ফ্যানের জোর কমলেও বিদ্যুৎ খরচ কমছে না। কারণ, রেগুলেটর কিছু বিদ্যুৎশক্তি তাপশক্তিতে অপচয় করে দিচ্ছে, ফলে ফ্যান কম বিদ্যুৎ পাচ্ছে এবং আস্তে ঘুরছে।

ইলেকট্রনিক রেগুলেটর:

ইলেকট্রনিক রেগুলেটর তৈরি হয় সাধারণত একটি ভেরিয়েবল রেজিস্টর, একটা বা কয়েকটা ফিক্সড রেজিস্টর, ট্রায়াক ও ক্যাপাসিটর দিয়ে। এখানে প্রধান ভূমিকা পালন করে ট্রায়াক। ট্রায়াক এর সাথে ফিক্সড রেজিস্টর, ক্যাপাসিটর ও একটা ভেরিয়েবল রেজিস্টর দিয়ে একটা থাইরিস্টর জাতীয় ইলেকট্রনিক সুইচিং ডিভাইস তৈরি করা হয়। এটা মূলত খুব দ্রুত সুইচিং অর্থাৎ সংযোগ অন-অফ করার মাধ্যমে, ফ্যানের গতি কমিয়ে দেয়। আপনার নির্ধারণ করা পরিমাণে বিদ্যুৎ সাপ্লাই করে এবং রেগুলেটর নিজে খুব সামান্য পরিমাণে বিদ্যুৎ অপচয় করে। তাতে করে ফ্যানের জোর কমালে বিদ্যুৎ খরচও কমে যায়।

মশা কামড় দিলে কামড়ের জায়গাটা ফুলে যায় কেন?

শেখ ফজলে রাব্বী

এটা হয় মূলত ইমিউন সিস্টেম এর রেসপন্স এর জন্য। আমাদের স্কিন রাপচার হলে সেখানে ইমিউন সিস্টেম নিজের থেকে একটা রেসপন্স ক্রিয়েট করে সেখানের কিছু চেইঞ্জ ঘটায় যেমনঃ ব্লাড ফ্লো বেড়ে যায় ফলে তাপমাত্রা বাড়ে, স্কিন লাল হয়ে যায় এবং ফুলে ফেঁপে ওঠে ।

মশার কামড়েও স্কিন রাপচার বা বিদীর্ণ হয়ে যায়। আর তাই উপরোক্ত ঘটনা ঘটে থাকে। আর এক্ষেত্রে সাধারণত ইমিউন রেসপন্স হিসেবে হিস্টামিন ক্ষরণ করে। ফলে ইচিং তথা চুলকাতে থাকে।

আর এসব থেকে বাঁচতে হলে মধু, এলোভেরার রস বা এন্টি হিস্টামিন টাইপ ওষুধ খেলে ফোলা বা চুলকানো কমে যায়

বিমানের রং সাদা হয় কেন?

বিমান সাদার পিছে অনেকগুলো কারণ আছে:

১. সূর্যের আলো বেশি রিফ্লেক্ট করে তাই তাপ কম শোষিত হয়। এতে বিমানের তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ কম থাকে,

২. বিভিন্ন আবহাওয়াজনিত কারণে রং ম্লান হয়ে যেতে পারে কিন্তু সাদা হয় না,

৩. কোনো ড্যামেজ হলে সহজে চোখে পড়ে,

৪. নীল আকাশে সাদা স্পষ্ট দেখা যায় তাই পাখির সাথে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনাও কম থাকে।

মানুষের মাথার চুল পাকে কেন? মানুষের মাথায় টাক পড়ে কেন?

আমাদের চুলের রয়েছে তিনটি স্তর। ওপরের স্তরটিকে বলা হয় কিউটিকল, মাঝের স্তরটি হল কর্টেক্স এবং একেবারে ভেতরের স্তরটিকে বলে মেডুলা। মাঝের স্তর বা কর্টেক্সে থাকে 'মেলানিন' নামে এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ, যার জন্য চুলের রং হয় কালো। এই মেলানিন কী পরিমাণে তৈরি হবে তা নির্ভর করে 'মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং' হরমোনের উপর। মাথার চামড়ার নিচে, চুলের গোড়ায় থাকা এক ধরণের বিশেষ কোষ থেকে এই হরমোন বেরিয়ে আসে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই কোষগুলো তাদের কাজ কমিয়ে দিতে

থাকে। কোষগুলো অকেজো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেলানিন তৈরিও বন্ধ হয়। আস্তে আস্তে চুলের রং তখন সাদা হতে শুরু করে। অল্প বয়সেও অবশ্য অনেকের চুলে পাক ধরে। বংশগত কারণে মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন কম বেরোলে এমনটা হতে পারে। আবার শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম যাদের বেশি করতে হয় অনেক সময় তাদের শরীরে অ্যাডরিনালিন ও কর্টিকোস্টেরয়েড নামে দুটো হরমোনের ক্ষরণ বেশি হয়। এর ফলে আবার মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন কম বেরোয়। মেলানিন কম তৈরি হয় এবং অসময়ে চুলে পাক ধরে।

মানুষের শরীরের অভ্যন্তরীণ এনজাইমসমূহের ক্রিয়ায় পুরুষের দেহের হরমোন টেস্টোস্টেরন পরিণত হয় ডাইহাইড্রোটেস্টোস্টেরনে। চর্মবিশেষজ্ঞ ও গবেষক কাটো মর্কের মতে, "এই ধরণের এনজাইমগুলো একজনের শরীরে কী পরিমাণে বিদ্যমান তার কারণ বংশগত। তবে এটি পিতার না কি মাতার জিন কিংবা উভয়েই নির্ধারণ করে কি না তা এখনও অজানা।" ডাইহাইড্রোটেস্টোস্টেরন এমন একটি হরমোন যা চুলের বৃদ্ধির স্বাভাবিক চক্রকে ব্যাহত ও ধীর করে এবং চুলগুলোকে খাটো ও পাতলা করে দেয়। চুলগুলোকে কৃশকায় বানানোর পাশাপাশি ঝরে যাওয়া চুলকে নতুন চুল দিয়ে প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়াকেও ব্যাহত করে এই হরমোনটি। বিজ্ঞানীরা মনে করেন হরমোনটি তৈরিকারী এনজাইমগুলো এশিয়ান পুরুষে কম তৈরি হয় বিধায় তাদের চুল পড়ার হারও ককেশিয়ান পুরুষদের থেকে কম। এছাড়াও টাক পড়ে যাওয়া অনেকাংশ নির্ভর করে মাথার ত্বকে কতগুলি রিসেপ্টর আছে তার ওপর। এই রিসেপ্টর যত বেশি হবে চুলও তত দ্রুত পড়বে। এমনকি পর্যাপ্ত পরিমাণে ডাইহাইড্রোটেস্টোস্টেরন এবং এটি তৈরিকারী এনজাইম থাকা সত্ত্বেও এগুলোর গ্রহীতা রিসেপ্টরের অপ্রতুলতা থাকলে মাথায় টাক পড়বে না।

বুড়িগঙ্গায় লঞ্চডুবির ১৩ ঘন্টা পর জলের নিচ থেকে বেঁচে ফিরে এসেছে একজন।

ক) জলের নিচে ১৩ ঘন্টা কীভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব?
খ) লোকটা এতক্ষণ জলের নিচে থেকেও মুখ শরীর সাদা হয়ে কুঁচকে যায়নি কেন?
গ) এই লঞ্চে এয়ার টাইট কোনো প্রকোষ্ঠ বা অক্সিজেন সিলিন্ডার না থাকলে লোকটা প্রয়োজনীয় অক্সিজেন কোথায় পেলো?

অনিক কুমার সাহা

৭-৮ বছর আগের একটা ঘটনা বলি। হ্যারিসন ওকেনে নামক একজন প্রায় ৬০ ঘণ্টা পর একটা ডুবন্ত জাহাজ থেকে বেঁচে ফিরেছিল। হ্যারিসন সেই টাগবুটের একজন বাবুর্চি ছিল। ১২ জন ক্রু নিয়ে নাইজেরিয়ার বন্দর থেকে জাহাজটি যাত্রা শুরু করেছিল। রাত ৪ টার দিকে সাগরের মাঝে এক প্রচণ্ড ঢেউয়ে টাগবুটটি উল্টে যায়, উল্টে যাওয়ার সময় হ্যারিসন ছিল টয়লেটে। সবগুলো ক্যাবিন অটোমেটিক লকড হয়ে যায়। হ্যারিসন আটকা পড়ে যায় টয়লেটে। সে ভাগ্যবান ছিল তাই সে টয়লেটে একটা এয়ার পকেট/এয়ার বাবল তৈরী হয় কিন্তু সেখানে বাতাসের পরিমাণ খুব সামান্যই ছিল। তারপর হ্যারিসন ইঞ্জিন রুমে যাওয়ার একটা পথ খুঁজে পায় এবং সেখানে গিয়ে আরেকটা এয়ার পকেট পেয়ে যায় এবং এটা মোটামুটি ৪-৫ ফুটের মত যেখানে হ্যারিসন নিজেকে ভালোভাবেই আটিয়ে নিতে পেরেছিল। ভাগ্যক্রমে সেখানে সে একটা ম্যাট্রেক্স পেয়ে যেটার উপর বসে সে নিজেকে প্রায় ৬০ ঘন্টা জলের উপর ভাসিয়ে রাখতে পেরেছিল। প্রায় ৬০ ঘন্টা পর একদল ডুবুরি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩০ মিটার (১০০ ফিট) নিচে গিয়ে ভাগ্যবান হ্যারিসনকে জীবিত উদ্ধার করে।
এই ঘটনা থেকে তো স্পষ্ট যে জলের নিচেও এয়ার পকেটের মাধ্যমে দীর্ঘ সময় মানুষ বেঁচে থাকতে পারে।
এবার আরও কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজি।

এয়ার পকেট কী?

এয়ার পকেটের বাংলা হলো বায়ুগহ্বর। আমরা যদি একটা খালি গ্লাসকে উপুড় করে জলে ডুবাই তাহলে খেয়াল করবো গ্লাসের ভেতরের অংশে জল প্রবেশ করবে না। এর কারণ আমরা যখন কোনো কিছু জলে ডুবাই তখন সেই বস্তুর যে পরিমাণ আয়তন জল অপসারিত করে সেই পরিমাণ অংশই ডুবে যায়। এখন গ্লাসের ভেতর ফাঁকা জায়গাটা কিন্তু আসলে ফাঁকা নয়, সেটা বায়ু দ্বারা পূর্ণ। এই

নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুও সমআয়তনের জলকে অপসারিত করে এতে করে জল গ্লাসের ভেতর প্রবেশ করে না। যেহেতু নৌযানগুলো এমনভাবে তৈরী করা হয় যাতে এর বিভিন্ন অংশ এয়ার টাইট থাকে তাই এগুলো উল্টে গেলে খুব সহজেই এর ভেতর এয়ার পকেট তৈরি হতে পারে। এটা পরীক্ষা করার জন্য একটা খালি বালতিতে মাথা ঢুকিয়ে ডুব দিয়ে দেখতে পারেন, স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী সময় ডুবে থাকতে পারবেন।

এয়ার পকেটে ঠিক কী পরিমাণ অক্সিজেন থাকতে পারে কিংবা একজন মানুষ সেখানে কত সময় বাঁচতে পারে?

আমরা জানি, বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ প্রায় ২৯% এবং একজন মানুষ প্রতিদিন মিনিমাম ৯০ কিউবিক মিটার বাতাস গ্রহণ করে। তবে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৯০ মিটার নিচে গেলেই প্রয়োজনীয় বাতাসের চাহিদা কমতে থাকে। হ্যারিসনের ক্ষেত্রে পদার্থবিদরা হিসেব করে দেখেছিল ৯০০ ফিট নিচে হ্যারিসনের জন্য প্রয়োজনীয় বাতাসের চাহিদা ছিল মাত্র ২ কিউবিট মিটার/ডে। অর্থাৎ এয়ার পকেটের আয়তন ৬ কিউবিট মিটার হলেও তার জন্য জলের নিচে ৬০ ঘণ্টা বেঁচে থাকা অসম্ভব ছিল না।

কিন্তু এয়ার পকেটে কি CO2 লেভেল বেড়ে যায়নি?

বাতাসে CO2 এর স্বাভাবিক পরিমাণ ০.৯%। এই পরিমাণ যখন ৫% ক্রস করে তখন সেটা জীবন নাশের কারণ হয়ে যায়। হ্যারিসনের এয়ার পকেটের সারফেসে জল ছিল আর আমরা জানি জল কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে। যেহেতু হ্যারিসন অন্ধকার এয়ার পকেটে আটকে ছিল সে হয়ত অসাবধানতাবশতও বারবার জলে হাত পা ছুড়েছে এতে করে সারফেস ওয়াটারের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে CO2 এর শোষণও বেড়ে গেছে। বিজ্ঞানীদের হিসেবে এয়ার পকেটের আয়তন যদি একটা U-haul Van এর সমান হয় তবে একজন মানুষের জন্য CO_2 লেভেল ৫% এ যেতে প্রায় ৮০ ঘণ্টা লেগে যাবে। সেই হিসেবে হ্যারিসনের জন্য ৬০ ঘণ্টা বেঁচে থাকা অসম্ভব ছিল না।

হাইপোথারমিয়া হতে পারত না?

হ্যাঁ, হ্যারিসনের জন্য হাইপোথারমিয়া হওয়ার চান্সও ছিল। সাধারণত শরীরের তাপমাত্রা ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটে নামলেই হাইপোথারমিয়া শুরু হয়ে যায়। জলের তাপমাত্রা যদি ৬০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে থাকে এবং মানুষের শরীর যদি জলে ডুবন্ত থাকে তবে মানুষটা মারা যাওয়ার জন্য দুই ঘণ্টা সময় লাগবে। এক্ষেত্রেও হ্যারিসন ভাগ্যবান ছিল কারণ সে নিজেকে একটা ম্যাট্রেক্সে ভাসিয়ে রেখেছিল।

এসব বিষয় বিশ্লেষণ করলে এটা তো স্পষ্ট যে ডুবে যাওয়া টাগবুটে সৃষ্ট এয়ারপকেটে হ্যারিসনের জন্য ৬০ ঘণ্টা বেঁচে থাকা অসম্ভব ছিল না।

এখন আসি বুড়িগঙ্গায় লঞ্চ ডুবিতে ৯৩ ঘণ্টা পর বেঁচে ফিরে আসা ব্যক্তির বিষয়ে।

ভিডিওতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ছোট লঞ্চটি বড় লঞ্চটির ধাক্কায় সরাসরি উল্টে ডুবে গেছে। এই লঞ্চে একটা এয়ার পকেটের তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং সেখানে আটকা পড়লে ৯৩ ঘণ্টা বেঁচে থাকাও সম্ভব। এটা সাজানো নাটক কি না সেই বিতর্কে আমি যাচ্ছি না তবে আমার বক্তব্য স্পষ্ট যে জলের নিচে দীর্ঘসময় বেঁচে থাকা অসম্ভব কিংবা অলৌকিক কিছু না। লঞ্চ থেকে বেঁচে ফেরা ব্যক্তিটি হ্যারিসনের মত ইঞ্জিনরুম থেকেই ফিরেছে।।

ও হ্যাঁ, হাইপোথারমিয়া না হলে মানুষটার মুখমণ্ডল কিংবা শরীর সাদা ফ্যাকাসে হওয়ার সম্ভাবনাও নেই।

ঋতু ও ঋতুতে দিনরাতে সময়ের পার্থক্য কেন হয়!

আমির

আমরা সবাই জানি দিনরাত কেন হয়।
কারণ পৃথিবী নিজ অক্ষে ঘুরে তাই।
তাহলে তো এদের মধ্যে সময়ের পার্থক্য থাকার কথা ছিল না। ১২ ঘন্টা দিন আর ১২ ঘন্টা রাত হওয়ার কথা ছিল। একদম ২য় ছবিটার মতো। এক্স্যাক্টলি তাই হতো যদি পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষ একদম খাড়া থাকতো। কিন্তু আসলে তা নেই। এটি প্রায় ২৩.৪° কোণে হেলানো।
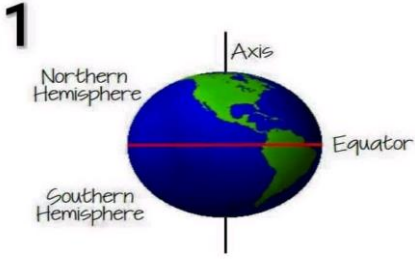
হেলানো থাকলেই বা সমস্যাটা কী? সমস্যাটা হচ্ছে পৃথিবী যদি হেলে না থাকত তাহলে ২য় ছবিটার মতো পৃথিবীর দুই গোলার্ধেই সমানভাবে সূর্যের আলো পৌঁছাতো। কোথাও আলো কম বা বেশি পড়ত না। সারাবছর একই রকম থাকত এবং একটু বোরিং লাগত।
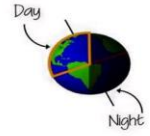
কিন্তু হেলে থাকার কারণে (৩য় ছবি) উত্তর গোলার্ধের অর্ধেকের বেশি অংশই আলোকিত, অর্থাৎ দিন। আর তুলনামুলক কম অন্ধকার, মানে রাত হয়। বুঝতে সমস্যা হতে পারে, বেশি জায়গায় আলো পড়লেই সেখানে দিনের দৈর্ঘ্য বাড়ে কিভাবে! আমরা জানি পৃথিবী ২৪ ঘন্টায় পুরো একটা ঘূর্ণন সম্পন্ন করে। তাহলে অর্ধেকের বেশি জায়গায় আলো মানে কী? সেই জায়গাটা ঘুরে পার হতে অবশ্যই ১২ ঘন্টার বেশি সময় লাগবে। মানে দিন বড়। বেশি জায়গায় আলো পড়ায় একদিকে যেমন দিন বড় হয়ে যাচ্ছে, তেমনি কম জায়গা অন্ধকার থাকায় সেখানে রাতও ছোট হয়ে যাচ্ছে।
ঠিক একই সময় দক্ষিণ গোলার্ধে খেয়াল করলে দেখবেন তার অর্ধেকের কম জায়গায় সূর্যের আলো পড়েছে এবং বেশি জায়গায়ই পড়েনি। তারমানে দক্ষিণ গোলার্ধে তখন দিনের চেয়ে রাত বড় হবে।

তাহলে এর বিপরীত ঘটনা কখন ঘটবে? মানে উত্তর গোলার্ধে রাত বড় হবে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দিন হবে?
ঠিক ছয় মাস পর। পৃথিবী যখন সূর্যের বিপরীত পাশে চলে যাবে তখন।
কেন হবে!
কারণ পৃথিবী যেদিকে হেলানো সেটাতো ফিক্সড। এর কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। কিন্তু পৃথিবী সূর্যের বিপরীত পাশে গেলে ঘটনাটা ৪র্থ ছবির মতো দাঁড়ায়।

আমরা বুঝতেই পারছি দুই গোলার্ধের জন্য দিনরাত ছোট বড় হওয়ার ভিন্ন ভিন্ন সময় থাকবে। হ্যাঁ, উত্তর গোলার্ধে যেমন ২৯ জুন সবচেয়ে বড় দিন এবং ২৯ ডিসেম্বর সবচেয়ে বড় রাত। ঠিক তেমনি দক্ষিণ গোলার্ধে ২৯ ডিসেম্বর সবচেয়ে বড় দিন এবং ২৯ জুন সবচেয়ে বড় রাত। তবে ইকুয়েটরের কাছে সময়ের খুব একটা পার্থক্য দেখা যায় না।

এবার আসি শীত ও গ্রীষ্ম কেন আসে?

কেপলার দেখিয়েছেন, পৃথিবী সূর্যকে বৃত্তাকার নয় বরং উপবৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করে। আর এসময় সূর্য যেকোনো একটা ফোকাসে থাকে। যার কারণে বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় পৃথিবী থেকে অনেক দূরে এবং তার ৬ মাস পর অনেক কাছে থাকে। যখন পৃথিবী সূর্য থেকে দূরে থাকে তখন পৃথিবীতে শীতকাল এবং যখন সূর্যের কাছে চলে আসে তখন গ্রীষ্মকাল হয়।

তাহলে তো সারা পৃথিবীতেই গ্রীষ্ম বা শীতকাল সব জায়গায় একসাথে হওয়ার কথা। কিন্তু ইউরোপে যখন শীতকাল, অস্ট্রেলিয়ায় তখন গ্রীষ্মকাল কেন হয়?

উম, আবারো পৃথিবীর বাজেভাবে অবস্থান করাকেই দোষারোপ করতে হচ্ছে। পৃথিবীর এত নাটকীয়তার সবচেয়ে বড় কারণ পৃথিবী হেলানো। যার কারণে উত্তর গোলার্ধে যখন সূর্য থেকে খাড়াভাবে আলো আসে তখন সেখানে দিনও বড় হয় এবং তাপ বেশি পাওয়া যায়। তাই সেখানে গ্রীষ্মকাল বিরাজ করে। ঠিক একই সময় দেখবেন দক্ষিণ গোলার্ধে সূর্যের আলো তীর্যকভাবে আসে। মানে দূর থেকে বেশি বাঁধা পেরিয়ে। এজন্য পৃথিবীর ঐ দিকটা সরাসরি সূর্যের দিকে মুখ করে থাকেনা। এজন্য আলো পৌঁছায়ও কম। তাই সেখানে ঠান্ডা হওয়ায় শীতকাল বিরাজ করে। ৬ মাস পর ঘটে ঠিক উল্টো ঘটনা।

দুই মেরুতে টানা ৬ মাস দিন এবং ৬ মাস রাত কেন হয় তার উত্তরও ইতিমধ্যে পেয়ে গেছেন আশা করি।

ধরুন, আপনি সরু কোনো সুড়ঙ্গ দিয়ে যাত্রা শুরু করেছেন। যেনতেন সুড়ঙ্গ না, সময় সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গের আদি প্রান্ত থেকে যাত্রা শুরু করে যত এগোবেন, কোটি কোটি বছরের প্রাণবৈচিত্র্য তত আপনার নজর কেড়ে নিবে।

আশা করি ব্যাঙাচির এই তৃতীয় সংখ্যা আপনাদের নিয়ে গেছে সেই সময় সুড়ঙ্গে। ম্যাগাজিনের প্রতিটা পৃষ্ঠা উল্টানোর সাথে সাথে আশা করি পরিচিত হয়েছেন প্রাচীন পৃথিবীতে রাজত্ব বিস্তার করা সেইসব প্রাণীর সাথে, হারিয়ে গেছেন তাদের সাম্রাজ্যে।

সাথে আরও উপভোগ করেছেন এই প্রাণবৈচিত্র্য সৃষ্টির রহস্য ব্যাখাকারী "বিবর্তন তত্ত্ব" নিয়ে লেখা।

পাঠকদের অসংখ্য ধন্যবাদ সময় নিয়ে এবারের “প্রাচীন পৃথিবী” ব্যাঙাচি পড়ার জন্য।

প্রজেশ দত্ত

সম্পাদক, ব্যাঙাচি

বাঁচতে হলে, ভাবতে হবে

ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করতে লগইন করুন:

https://bit.ly/bcb_science

মোজেসরাস

প্রজেশ দত্ত

১) https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mosasaurus
২) https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mosasaur
৩) https://www.britannica.com/animal/mosasaur
৪) https://www.fossilguy.com/gallery/vert/reptile/mosasaur/index.htm
৫) https://youtu.be/5mnb4PppvmE
৬) https://en.m.wikipedia.org/wiki/Megalodon
৭) https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cretaceous%E2%80%93Paleogene_extinction_event
৮) https://youtu.be/zxFHw0p50Xg

বিবর্তন

নাঈম হোসেন ফারুকী

1. https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/search/topics.php?topic_id=13
2. https://www.nature.com/subjects/evolution

ঘুমন্ত ইতিহাস

মো. এ আর মুবিন

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Argentinosaurus
https://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/argentinosaurus.html
https://www.bbcearth.com/walking-with-dinosaurs/modal/argentinosaurus/
https://www.livescience.com/34278-worlds-largest-dinosaur.html
https://www.amnh.org/explore/news-blogs/news-posts/fossil-titanosaur-egg-with-embryo-still-inside
https://dinopedia.fandom.com/wiki/Category:Sauropods
https://www.amnh.org/exhibitions/sauropods-worlds-largest-dinosaurs/outside-mamenchisaurus/sauropod-dinosaur-babies
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Sauropod_egg_Auca_Mahuevo_Museum_of_Anchient_Life.jpg
https://simple.m.wikipedia.org/wiki/Conifer
https://alchetron.com/Lycopodiopsida
https://hipwallpaper.com/ginkgo-wallpapers/

http://llife.com/Encyclopedia/PALMS_AND_CYCADS/Family/Cycadaceae/28863/Cycas_pectinata
https://www.alamy.com/stock-photo/bennettitales.html
https://www.nature.com/articles/s41598-017-16576-y
https://www.researchgate.net/figure/Locality-maps-showing-sites-that-have-produced-sauropod-dinosaurs-A-Map-of-China_fig1_338082825
https://ferrebeekeeper.wordpress.com/2020/04/28/52768-1998-or2/
https://www.thoughtco.com/the-cretaceous-tertiary-mass-extinction-3954637
https://svpow.com/2013/01/14/oblivious-sauropods-being-eaten/
http://onushilon.org/animal/dino/dinosaur.html
https://dinopedia.fandom.com
https://ucmp.berkeley.edu/silurian/silurian.php
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%83%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%B0_%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Evolution_of_fish
https://www.alamy.com/stock-photo/silurian-plant.html
https://www.alamy.com/stock-photo-palaeozoology-siluriandevonian-period-arthropod-merostoma-pterygotus-86106484.html
https://simple.m.wikipedia.org/wiki/Amniote
https://fossil.fandom.com/wiki/Temporal_fenestra
http://tolweb.org/Synapsida
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sauropsida
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sauria
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Archosauromorpha
https://www.sciencephoto.com/media/774839/view/triassic-jurassic-extinction-illustration
https://www.britannica.com/animal/ornithischian

শার্কের বিবর্তনীয় ইতিহাস

ইমতিয়াজ হোসেন সৈকত

www.thoughtco.com

www.bbc.com

www.sharksider.com

www.nhm.acca.uk

www.smithsonianmag.com

www.micronesianconservation.org

ম্যামথের প্রত্যাবর্তন

সাগ্নিক সিংহমহাপাত্র

https://cosmosmagazine.com/biology/what-is-de-extinction-and-how-do-you-do-it/amp/
https://reviverestore.org/projects/woolly-mammoth/
https://www.genengnews.com/insights/from-crispr-multiplexing-to-pleistocene-park-2/
https://www.cambridge.org/core/journals/mrs-bulletin/news/crispr-implications-for-materials-science
http://scholar.google.co.in/scholar_url?url=http://www.ask-force.org/web/Genomics/Charo-CRISPR-Critters-Cracks-20151117.pdf&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm3GmNiJJHybDx2qxyHGjcWBLLf1pA&nossl=1&oi=scholarr
https://medium.com/lotus-fruit/reviving-extinct-animals-using-crispr-38d0d43e4007
http://www.bbc.com/earth/story/20170221-reviving-woolly-mammoths-will-take-more-than-two-years
https://api.nationalgeographic.com/distribution/public/amp/news/2017/07/woolly-mammoths-extinction-cloning-genetics
https://www.ed.ac.uk/sustainability/what-we-do/climate-change/case-studies/climate-research/can-plants-prevent-permafrost-thaw

ফসিলের বয়স

স্বপ্নীল জয়ধর

১। https://en.wikipedia.org/wiki/Geologic_time_scale

২।http://www.prehistoricplanet.com/news/index.php?id=48

৩। http://science.howstuffworks.com/environmental/earth/geology/carbon-142.htm

৪। https://en.m.wikipedia.org/wiki/Radiocarbon_dating

৫। https://en.m.wikipedia.org/wiki/Carbon-14

টি-রেক্সের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

নূর-এ নাঈম শান্ত

1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tyrannosaurus
2. https://www.nationalgeographic.com/animals/prehistoric/tyrannosaurus-rex/
3. https://www.dailymotion.com/video/x6d590l
4. https://www.youtube.com/watch?v=3_RLz0whDv4
5. https://www.youtube.com/watch?v=cpipaUfcnmM
6. https://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/tyrannosaurus.html
7. https://www.mentalfloss.com/article/31503/it-true-t-rex-could-only-see-things-were-moving
8. https://www.britannica.com/animal/tyrannosaur

টার্ডিগ্রেড: দ্য গ্রেট এলিয়েন

মুস্তফা কামাল জাবেদ

১.https://www.nature.com/articles/s41598-017-05796-x

২.https://www.nature.com/articles/ncomms12808

৩.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0011224015300134

৪.https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(08)00805-1

দ্য বোরিং বিলিয়ন

শুভ সালাউদ্দিন

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Boring_Billion

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Canfield_ocean

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Great_Oxidation_Event

http://www.australasianscience.com.au/article/issue-may-2014/boring-billion.html

https://www.nature.com/articles/s41598-018-22695-x

https://www.wired.com/beyond-the-beyond/2017/04/great-oxidation-event/

সিলাকান্থ

সাগ্নিক সিংহমহাপাত্র

https://www.eastlondon.org.za/coelacanth.html
https://www.lindahall.org/marjorie-courtenay-latimer/
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/1930s-curator-discovered-living-fossil-well-sort-180967616/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Marjorie_Courtenay-Latimer
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Indonesian_coelacanth
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Coelacanth

মানুষের ইতিহাস

রঞ্জু খান

1- https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/homo-erectus-a-bigger-smarter-97879043/

2 – https://en.m.wikipedia.org/wiki/Control_of_fire_by_early_humans

3- https://www.google.com/amp/s/amp.theguardian.com/science/2018/feb/20/homo-erectus-may-have-been-a-sailor-and-able-to-speak

4- https://www.newscientist.com/article/mg21829124-200-stone-tools-helped-shape-human-hands/

5 -https://phys.org/news/2019-01-snapshot-mysterious-ancestor-homo-erectus.html

কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি

তানভীর রানা রাব্বি

http://www.scholarpedia.org/article/Quantum_gravity

https://archive.org/details/generalrelativit0000wald

Feynman Lectures on Gravitation

Quantum Field Theory in a Nutshell (2nd Edition) by Anthony Zee

Reality Is Not What It Seems (English Version) by Carlo Rovelli

https://scienceway.org/quantum-gravity-01/

https://web2.ph.utexas.edu/~coker2/index.files/quantumgravity.htm

https://youtu.be/CbPWYjnQIO8

https://abuhayat.me/%E0%A6%B2%E0%A7%81%E0%A6%AA-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%9F/

মানব ইতিহাস

শাওন গুপ্ত, প্রজেশ দত্ত

১। https://www.pbs.org/wgbh/evolution/extinction/massext/statement_03.html#:~:text=Of%20all%20species%20that%20have,of%20a%20sixth%20mass%20extinction.

২। https://www.newscientist.com/article/2203263-did-we-split-from-neanderthals-400000-years-earlier-than-we-thought/#:~:text=An%20analysis%20of%20fossil%20teeth,place%20around%20400%2C000%20years%20ago.

৩। https://www.theverge.com/2017/10/9/16448412/neanderthal-stone-age-human-genes-dna-schizophrenia-cholesterol-hair-skin-loneliness

৪।
https://www.dhakatribune.com/world/2020/07/06/dna-linked-to-covid-19-inherited-from-neanderthals-common-in-bangladeshis
৬। https://www.eva.mpg.de/genetics/former-department-groups/genomes.html
৭।
https://en.wikipedia.org/wiki/Neanderthal#:~:text=Neanderthals%20(%2Fni%CB%88%C3%A6,until%20about%2040%2C000%20years%20ago.

ভূ-তাত্ত্বিক সময় সারণি

আবু রায়হান

https://en.wikipedia.org/wiki/Geologic_time_scale

ICS প্রদত্ত টাইম স্কেলের লেটেস্ট পিডিএফ ফাইল:

https://web.archive.org/web/20140528015101/http://www.stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2014-02.pdf

https://missiongeographyindia.wordpress.com/2017/02/07/geological-time-scale-part-2/

"ফসিলের ভাষা ও অশুদ্ধ পাঠ"

লেখক: মনিফ শাহ চৌধুরী

1. https://fivethirtyeight.com/features/all-those-new-dinosaurs-may-not-be-new-or-dinosaurs/

2.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2614166/

3. Jack Horner (paleontologist)-
https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Horner_(paleontologist)

4. Hypacrosaurus- http://www.prehistoric-wildlife.com/species/h/hypacrosaurus.html

5. ফসিল যেভাবে ক্লাসিফাই করা হয়- https://www.fossils-facts-and-finds.com/fossil_identification.html